কার্ত্তিক—১৩৪৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য*

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি এচ্‌-ডি, ভাইস্‌-চ্যান্সেলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১। কুলগ্রন্থের পরিচয়

বিগত পঁচিশ বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ বসু বহু অনুসন্ধানপূর্ব্বক যে অসংখ্য কুলশাস্ত্র আবিষ্কার করেন এবং তৎসমুদয়ের সাহায্যে জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন; প্রথমতঃ তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কুলশাস্ত্র আলোচনার সূত্রপাত হয়। তৎকালে ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি আধুনিক বিচারমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষিত বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ প্রায় একবাক্যে কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ৺নগেন্দ্রনাথ বসু কুলশাস্ত্রকে ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া

* এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত পাঁচটি প্রবন্ধে এই বিষয়টি আলোচিত হইবে। এই প্রবন্ধগুলির পাদটীকায় নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে।

বসু ১ =৺নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথম অংশ। (গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ নাই। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে জানা যায়, ইহা ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল)।

বসু ২ =ঐ ব্রাহ্মণ কাণ্ডের দ্বিতীয় অংশ (১৩৩৫)।

বসু ৩ =ঐ দ্বিতীয় ভাগ, ব্রাহ্মণকাণ্ড, তৃতীয়াংশ হইতে পঞ্চমাংশ

বহুসংখ্যক সামাজিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এককালে এই বাদানুবাদ কিরূপ উগ্রভাব ধারণ ও ব্যক্তিগত বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এখনও আমাদের স্মৃতিপটে জাগরূক আছে। সেই সমুদয় বিরোধী দলের অনেকেই এখন লোকান্তরিত এবং যে কয়েকজন জীবিত আছেন তাঁহারাও রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত। বাঙ্গালী সাহিত্যিকের সেই গ্লানিকর দ্বন্দ্বের কাহিনীও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে। সুতরাং কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচারের সময় আসিয়াছে। কুলশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়কে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) এ দেশে যে কয়টি উচ্চজাতি—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি বিদ্যমান, সাধারণ ভাবে তাহাদের ও তাহাদের প্রধান প্রধান শাখার উৎপত্তি ও বিস্তৃতির ইতিহাস।

(২) উক্ত জাতি বা শাখাসমূহের মধ্যে কালক্রমে যে কারণে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের সৃষ্টি হয় এবং এই সমুদয় বিভাগের মধ্যে পরস্পর আহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় পরিচালনা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সমুদয় রীতিনীতি ও নিয়মপ্রণালীর উদ্ভব হয় তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস।

(৩) যথাসম্ভব উক্ত বিভাগসমূহের অন্তর্গত বিভিন্ন পরিবারের বংশাবলী ও তাহাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রচলিত আখ্যান বর্ণন। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র প্রথমটিই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। কারণ কুলশাস্ত্রের এই অংশেই প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন বাংলার হিন্দু রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। কুলশাস্ত্র ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না এবং বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তাহার মূল্য কি, একমাত্র এই অংশ আলোচনা করিলেই তাহা নির্ণয় করা যাইবে।

কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচারমূলক আলোচনায় যে একটি গুরুতর বাধা আছে প্রথমেই তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক।

কুলশাস্ত্র নামে পরিচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনন্ত। ঘটক উপাধিধারী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থানে ও কালে এই সমুদয় গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন এবং বংশানুক্রমে তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ এই সমুদয় গ্রন্থের রক্ষণাবেক্ষণ ও আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী লেখকগণ কেবল যে নূতন নাম ও বংশাবলী যোজনা করিয়াছেন তাহা নহে, অনেক স্থলে অজ্ঞতাবশত পুরাতন পুঁথি নকল করিতে ভুল করিয়াছেন; অথবা নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়া তাহা সংযোগ করিয়াছেন। তৎকালে সামাজিক মর্য্যাদা লাভ যেরূপ আকাঙ্ক্ষনীয় ছিল, সামাজিক গ্লানি ও অপবাদও সেইরূপ মর্ম্মপীড়াদায়ক ছিল। বস্তুত মুসলমান-যুগে বাঙ্গালী হিন্দুর সম্মুখে উচ্চতর কোন জাতীয় জীবনের আদর্শ বা উদ্দেশ্য না থাকায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও তৎসম্পর্কিত বিচারবিতর্কই জাতীয় জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক যে, ঘটকগণকে অর্থদ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে বশীভূত করিয়া ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষ নিজেদের আভিজাত্য-গৌরব বৃদ্ধি অথবা বিরুদ্ধ পক্ষের সামাজিক গ্লানি ঘটাইবার জন্য প্রাচীন কুলশাস্ত্রের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন অথবা নূতন কুলশাস্ত্র লিখিয়া পুরাতন কোন ঘটকের নামে চালাইয়াছেন। কুলশাস্ত্র গ্রন্থ সাধারণত ঘটকদিগের গৃহেই

বসু ৪, ৫ (চতুর্থও পঞ্চমাংশের পৃষ্ঠাঙ্ক পৃথক হওয়ায় উহা যথাক্রমে বসু—৪, বসু—৫ নামে উল্লিখিত হইবে)।
সং নিং =৺লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য কৃত সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সংস্করণ, ১৩১৫ (ইং ১৯০৯) [ইং ১৮৭৪ সালে প্রথম প্রকাশিত]।
গৌ—বা=৺মহিমাচন্দ্র মজুমদার কৃত গৌড়ে ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সংস্করণ (ইং ১৯০০), [১৮৮৯ সালে প্রথম প্রকাশিত]।
তত্ত্ব =শ্রীকালীপদভট্টাচার্য্য কৃত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলতত্ত্ব (ইং ১৯৩৪)।
আদিশূর=৺ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ (১৯৩৩)।
কুল =কুলতত্ত্বার্ণব, সর্ব্বানন্দ মিশ্র কৃত, মেদিনীপুর ব্রাহ্মণ সভা হইতে প্রকাশিত (১৯২৭)।
মো—মু =বল্লাল মোহমুদ্গর, শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত (১৩১২, ইং ১৯০৫)

থাকিত এবং লোকের মুখে মুখে আবৃত্তি হইত। সুতরাং এই সমুদয়ের পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল।

এমতস্থলে কোন্ কোন্ কুলশাস্ত্র গ্রন্থকে প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহাই প্রথম ও প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার কোন প্রকার সমাধান না হইলে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা সম্ভব নহে। দুঃখের বিষয় যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এই গুরুতর বিষয়টির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। শতাধিক বৎসর আগে এই কার্য্যটি যতদূর সহজসাধ্য ছিল, এখন আর তাহা নাই। কারণ বিগত একশত বৎসরের মধ্যে একদিকে প্রধানত ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর অধ্যবসায় ও যত্নে যেমন বহু লুপ্ত কুলশাস্ত্রের উদ্ধার হইয়াছে, তেমনি আবার নিয়মিত ভাবে কুলশাস্ত্র জাল করার রীতিও এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অভিযোগটি খুবই গুরুতর, সুতরাং ইহার সমর্থনকল্পে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগে বসু মহাশয় ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য করেন :—

"কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী টালা নিবাসী গোরালীয় রশিষ্ঠ ৺গুরুচরণ বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে এই জীর্ণ শীর্ণ তালপত্রে লিখিত ঈশ্বর বৈদিকের যে কুলপঞ্জী পাইয়াছি এইখানি দেখিলেই দ্বিশতাধিক বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হস্তলিপি বলিয়া সহজেই মনে হইবে। সামন্তসারের সমাজদার বংশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মতে ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জীই সর্ব্বপ্রাচীন।" (পৃঃ ৵০)

উক্ত গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় এই বৈদিক কুলপঞ্জী হইতে শ্যামল বর্ম্মার পরিচায়ক যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই :

"স্বর্ণরেখ নদীতটে কাশীপুরী নগরীতে মহারাজ ত্রিবিক্রম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মহিষী মালতীর গর্ভে বিজয়সেন নামক এক পুত্র জন্মে। রাজা বিজয়সেন তাঁহার পত্নী বিলোলার গর্ভে মল্লবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মা নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। শ্যামলবর্ম্মা গৌড়দেশের রাজা হন।"

রামদেব বিদ্যাভূষণের বৈদিক কুলমঞ্জরী দ্বারাও উক্ত বিবরণ সমর্থিত হয়।

তেইশ বৎসর পরে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ-কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ) গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লিখিত অংশ সম্বন্ধে বসু মহাশয় মন্তব্য করেন :

"অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত এই গ্রন্থের প্রথমাংশে..... বিজয় সেন ও শ্যামলবর্ম্মাকে একই বংশীয় বলা হইয়াছে; কিন্তু নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন দ্বারা তাহা ভ্রমাত্মক স্থির হইয়াছে। বাস্তবিক সামলবর্ম্মা বর্ম্মাবংশীয় জাতবর্ম্মার পুত্র হইতেছেন।" (পৃঃ [৩])

কিন্তু কিছুকাল পরেই ঈশ্বর বৈদিককৃত কুলপঞ্জীর নূতন এক পুঁথি বসু মহাশয়ের হস্তগত হইল। ইহাতে শ্যামল বর্ম্মার যে পরিচয় আছে তাহার সহিত তাম্রশাসনের কোন অসঙ্গতি নাই। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় পুঁথির পার্থক্য অতি গুরুতর। এ সম্বন্ধে ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: "তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকার দ্বিতীয় পুঁথিতে "কাশীপুর" স্থানে "দেশে কাশী", "স্বর্ণরেখা নদী" স্থানে "স্বর্ণরেখা পুরী", "বিজয়সেনকং" স্থানে "কর্ণসেনকং", "পত্নী তস্য বিলোলা" স্থানে "কন্যা তস্য বিলোলা", "স্ত্রিয়াং" স্থানে "শ্রিয়াং" পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তন সমেত দ্বিতীয় পুঁথিখানি বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কারের অল্পদিন পরেই বসুজ মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছিল। বেলাবো তাম্রশাসনে শ্যামল বর্ম্মার মাতামহ চেদিরাজ কর্ণদেবের নাম আছে, সুতরাং উক্ত তাম্রশাসন আবিষ্কারের পরে ঈশ্বর বৈদিক কৃত দ্বিতীয় পুঁথি আবিষ্কার হওয়ায় সন্দেহ হইতেছে যে কোন দুষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক কতকগুলি কুলশাস্ত্র রচনা করিয়া বারংবার বসুজ মহাশয়কে প্রতারিত করিয়াছে।" (বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৬০ পৃঃ)। নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই রাখালবাবুর উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। কারণ নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কারের ফলে যখন ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, ঈশ্বর বৈদিক কৃত কুলপঞ্জীর ন্যায় প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থোক্ত ঐতিহাসিক তথ্য সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তখনই নূতন পুঁথির আবিষ্কারের ফলে কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মনে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে যে, কুলশাস্ত্রের মহিমা ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্যই এই নূতন পুঁথি জাল করা হইয়াছে। পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টত

এই অভিযোগ আনয়ন করা সত্ত্বেও ৺বসু মহাশয় নবাবিষ্কৃত পুঁথিখানি জন সাধারণ্যে উপস্থিত করিয়া তাহার প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করিতে কোন প্রয়াস করেন নাই।

২। দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন তাহার প্রকৃত তারিখ পড়িতে পারা যায় নাই। তখন ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, কেশব সেনের পৌত্র দনৌজামাধবের নাম এডুমিশ্র, হরিমিশ্র, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, মহেশ্বর প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণের কোন কোন গ্রন্থে দনুজমর্কনরূপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পরে দনুজ-মর্দ্দনদেবের নূতন মুদ্রা আবিষ্কার হওয়ায় নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। সুতরাং তিনি ও দনৌজামাধব এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। এমতাবস্থায় যে সমুদয় কুলগ্রন্থে দনৌজামাধবের পাঠান্তর দনুজমর্দ্দন পাওয়া যায়, তাহা দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা আবিষ্কারের পরে রচিত এরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে।

৩। অস্পষ্ট একটি নবাবিষ্কৃত পাণ্ডু নগরের টাঁকশালে প্রস্তুত মুদ্রার তারিখ পড়িতে ভুল হওয়ায় পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে উক্ত মুদ্রায় উল্লিখিত মহেন্দ্রদেব দনুজ-মর্দ্দনদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই সংবাদ বাহির হইবার পরেই ময়মনসিংহ জিলার পুড্যা গ্রামে বটু ভট্ট রচিত "দেববংশ" নামক একখানি প্রাচীন কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, 'গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত, কিন্তু ইহার অক্ষর দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ন্যায়' (বাংলার ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৫৪)। এই গ্রন্থে দনুজমর্দ্দনদেব পাণ্ডু নগরের রাজা মহেন্দ্রদেবের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে নূতন কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কার হওয়ায় নিঃসংশয়ে জানিতে পারা গিয়াছে যে, মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনের পরবর্ত্তী। সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বটুভট্টের "দেববংশ" আধুনিক কালের রচিত, সুতরাং জাল পুঁথি এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

৪। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের বাড়ীতে একখানি কুলগ্রন্থের কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আদিশূরের সময় নিরূপণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি তাঁহাদের সহকারী পুস্তক রক্ষক শ্রীযুক্ত পুরন্দর কাব্যতীর্থকে ব্রাহ্মণডাঙ্গায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষার ফলে জানিতে পারা যায় যে, ৺বসু মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত অন্যান্য শ্লোকগুলি একখানি কুলগ্রন্থে আছে, কিন্তু আদিশূরের কালজ্ঞাপক শ্লোকটি উহাতে নাই; তাহার স্থানে অন্য একটি শ্লোক আছে। আদিশূর ও জয়ন্তের অভিন্নত্বজ্ঞাপক যে শ্লোকের পাঠান্তরের কথা ৺বসু মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও উক্ত ঘটকের গৃহস্থিত কোন কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। ৺বসু মহাশয়ের জীবিতকালে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ (মানসী, মাঘ ১৩২১) ও ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশিত করেন। বিষয়টির গুরুত্ববোধে ইহা আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতায় একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয় এবং ৺বসু মহাশয়কে বিশেষভাবে ইহাতে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ৺বসু মহাশয় এই সভায় যোগদান করেন নাই। ৺বসু মহাশয় ইহার পরেও প্রায় চব্বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন কথা বলেন নাই।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন তাঁহারা ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাংলার ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৩৩-১৩৮, ১৫২-১৬১) ও তৎ-সাময়িক মাসিকপত্র পাঠ করিতে পারেন। বাহুল্য ভয়ে আমরা এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু এই সমুদয় বিবেচনা করিলে সহজেই সন্দেহ জন্মে যে ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা কুলশাস্ত্রের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং সাম্প্রদায়িক কারণে বর্ত্তমান যুগে বহু কৃত্রিম কুল-শাস্ত্রের আমদানি হইতেছে।

এরূপ কৃত্রিমতার কথা ৺নগেন্দ্রনাথ বসু নিজেও ক্ষেত্রান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নিজে কুলশাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধাবান। সুতরাং তাঁহার নিজের উক্তি এ বিষয়ে মূল্যবান বিবেচনা করিয়া আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কায়স্থ জাতির উৎপত্তিসূচক প্রাচীন গ্রন্থোদ্ধৃত অনেক শাস্ত্রীয় বচন এবং অনেক তথাকথিত প্রাচীন সংহিতা ও তন্ত্রগ্রন্থ যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিককালে রচিত ইহা উক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের কয়েকটি মাত্র স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) "আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্ বিপ্রাঃ সদারকাঃ" ইত্যাদি কতকগুলি শ্লোক "অগ্নিপুরাণ" হইতে উদ্ধৃত বঙ্গজ কুলাচার্য্যকারিকার বচন বলিয়া শব্দকল্পদ্রুমে স্থান পাইয়াছিল। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র অগ্নিপুরাণের কোন পুঁথিতে ইহাদের সন্ধান পান নাই। এগুলি যে জাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (জাতিতত্ত্ব বারিধি, ৪০১ পৃষ্ঠায় রাজেন্দ্রলালের এই বিষয়ক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে)

(খ) "আচারনির্ণয় তন্ত্র" নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু বলেন উহা "কোন বিশেষ উদ্দেশে আধুনিক সময়ে রচিত হইয়াছে।" (বিশ্বকোষ, কায়স্থ শব্দ)।

(গ) ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, যমস্মৃতি, মহাকাল-সংহিতা, হারীত, আপস্তম্ব, মেরুতন্ত্র, ব্যোমসংহিতা, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া পরিচিত বহু শ্লোক যে আধুনিককালে রচিত এবং ঐ সমুদয় গ্রন্থে অজ্ঞাত, তাহা নগেনবাবু বিশ্বকোষ কায়স্থ শব্দে এবং কায়স্থের বর্ণনির্ণয় গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন।

(ঘ) "বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ" ইত্যাদি কায়স্থোৎপত্তি বিষয়ক কতকগুলি শ্লোক সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"পদ্মপুরাণীয় পাতাল খণ্ডের দোহাই দিয়া অনেকে এই বিবরণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদের কোন বন্ধু একখানি জাল পাতালখণ্ডের পুঁথি দেখাইয়া আমাদিগকেও প্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে বিশ্বকোষে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন পুনার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত পদ্মপুরাণ ও নানাস্থানের বারখানি পুঁথি অনুসন্ধান করিয়াও ঐ বচনগুলি বা বিবরণটির সন্ধান পাইলাম না।" (কায়স্থের বর্ণনির্ণয়—২৯ পৃঃ)। পরবর্ত্তীকালে উক্তগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে বসু মহাশয় এইমত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা যুক্তিসহ নহে।

যেখানে জাতির মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য সুপরিচিত পুরাণ ও সংহিতার নামে প্রক্ষিপ্ত বচন চালান এবং প্রাচীন তন্ত্র ও সংহিতার নামে নূতন গ্রন্থ রচনা সম্ভব হইয়াছে, সেখানে অনুরূপ উদ্দেশ্যে কুলশাস্ত্র যে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও আধুনিক যুগে রচিত হইবে তাহার বিচিত্রতা কি? সুতরাং এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে ৺বসু মহাশয় যে সমুদয় কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক কৃত্রিমতা আছে। ক্ষেত্রবিশেষে কৃত্রিমতার প্রকারভেদ আছে। হয় আগাগোড়া পুঁথি-খানাই হালের লেখা, নয় ত কয়েকটা পাতা অদল বদল, নয় ত প্রাচীন গ্রন্থের প্রতিলিপিতে নূতন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা হইতে পাবনা সাহিত্য সম্মিলনীতে গিয়াছিলাম। পথে ষ্টীমারে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পুরাতন পুঁথি (বিশেষত, কুলশাস্ত্র) প্রস্তুত করিবার প্রণালী আমার নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। লেখা কাগজের উপর কি র‍্যাসিড দিয়া মাসখানেক বালুর নীচে রাখিলে নূতন পুঁথি ঠিক কীটদষ্ট পুরাতন পুঁথির মত দেখায়। যেভাবে তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় এই সমুদয় বর্ণনা করিলেন তাহাতে আমার সন্দেহ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি নিজেই এই কার্য্য করিয়াছেন কি-না। বলিলেন, অর্থাভাবে তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য করিতে হইয়াছে। কে তাঁহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল তাহাও বলিলেন।

সুতরাং একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে সমুদয় কুলশাস্ত্র অজ্ঞাত ছিল এবং যাহা এক্ষণে ৺বসু মহাশয়ের সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে, তাহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এমতস্থলে কেবলমাত্র এই সমুদয় পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। ৺বসু মহাশয় অসীম অধ্যবসায় ও অক্লান্ত শ্রম সহকারে বহু কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি না থাকায় এবং তাঁহার পুঁথিসংগ্রহকারীদের সততা ও সত্যনিষ্ঠার অভাবে এই বিপুল গ্রন্থরাজি বাংলার ইতিহাসের বিশেষ কোন কাজে লাগিল না ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে কোন কুলগ্রন্থ জাল হয় নাই একথা বলিতেছি না। বরং ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্যে এরূপ কৃত্রিমতা যে খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ব্যাপক ও

বিধিবদ্ধভাবে এবং কোন বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য সমর্থনের জন্য কুলগ্রন্থ জাল করা হইয়াছে; এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই। সুতরাং যে সমুদয় প্রাচীন কুলগ্রন্থের বহুল প্রচলন ছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যাহার পুঁথি আবিষ্কৃত ও পরিচিত হইবার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, প্রধানত সেই সমুদয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা বিচার করিতে হইবে।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বের গ্রন্থমাত্রই যে অকৃত্রিম তাহাও নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়েও ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর নিজের উক্তিই উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"পুরাণের দোহাই দিয়া কতশত বচন রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তাই নাই। কমলাকর ভট্টের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ ও রাজা রাধাকান্ত দেবের সময় পর্য্যন্ত ঐ সকল শ্লোকের প্রাদুর্ভাব। তৎপর যজ্ঞোপবীতপ্রার্থী কতিপয় কায়স্থের আগ্রহেও দেশীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় দুই-একটি শ্লোক গড়িয়াছেন ও উপবীতপ্রিয় কায়স্থগণের মনোরঞ্জনে অগ্রসর হইয়াছেন। সে সকল কথার উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন।" (কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ১৮ পৃঃ)।

'পুরাণ', 'যজ্ঞোপবীতপ্রার্থী (উপবীতপ্রিয়). কায়স্থ' ও 'রাধাকান্ত দেব' ইহার পরিবর্ত্তে যথাক্রমে 'কুলশাস্ত্র', 'ব্যক্তিগত বা সামাজিক মর্য্যাদাপ্রার্থীগণ' ও '৺নগেন্দ্রনাথ বসু' এই তিনটি শব্দ বসাইলেও উল্লিখিত মন্তব্য তুল্যরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণীয়। বর্ত্তমান কালে কুলগ্রন্থ জালের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি—আরও অনেক দেওয়া যায়। "চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ধ্রুবানন্দকৃত গৌড়বংশাবলী" অথবা গৌড়কায়স্থ বংশাবলী (বিশ্বকোষ, ৪।৩৪১) নামে একখানি কুলগ্রন্থ হইতে নগেন্দ্রবাবু তাঁহার জাতীয় ইতিহাসে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু পাতালখণ্ডের "বিচিত্রো জগতাং হেতুঃ" প্রভৃতি যে সমুদয় জাল শ্লোক দ্বারা নগেনবাবু প্রতারিত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এই কুলগ্রন্থের প্রারম্ভেই সেই সমুদয় শ্লোক "পাদ্মে পাতালখণ্ডে" এই দোহাই দিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি যে (নগেনবাবুর ভাষায়) "কোন বিশেষ উদ্দেশে আধুনিক সময়ে রচিত হইয়াছে" তাহার অন্যান্য অনেক প্রমাণ আছে।

আধুনিক যুগে লিখিত যে সমুদয় গ্রন্থে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা আছে তন্মধ্যে লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য কৃত সম্বন্ধনির্ণয়ই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইং ১৮৭৪ সালে ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়। গ্রন্থমধ্যে তিনি কুলগ্রন্থগুলির কোন প্রকার বিবরণ দেন নাই, কিন্তু তাঁহার উক্তির পোষকতার জন্য অনেক কুলগ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহিমচন্দ্র মজুমদার রচিত 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ঘটকদিগের নিকট যে "কুলগ্রন্থসকল সচরাচর দৃষ্ট হয়" গ্রন্থকার তাহার নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন ঃ

রাঢ়ীয়

১। ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত মহাবংশাবলী
২। মিশ্রাচার্য্যকৃত মিশ্রগ্রন্থ
৩। ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা
৪। ফুলিয়া কুলবর্ণন
৫। বাচস্পতি মিশ্র ঘটককৃত কুলরাম
৬। রামহরি তর্কালঙ্কার কৃত মেলমালা

এতদ্ব্যতীত কুলার্ণব, সাগরপ্রকাশ, কুলচন্দ্রিকা, কুলদীপিকা প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে।

বারেন্দ্র

১। কুলপঞ্জিকা
২। গাঞিমালা
৩। ভাদুড়ি কুলব্যাখ্যা
৪। কুলীনগণের বংশাবলী
৫। শ্রোত্রিয়গণের বংশাবলী
৬। ঢাকুর অর্থাৎ করণাদির গ্রন্থ
৭। নিগূঢ় গ্রন্থ

এতদ্ব্যতীত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রভৃতির ঐতিহাসিক রচনায় এবং শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক কুলগ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার গ্রন্থাবলীতে অনেক নূতন কুলগ্রন্থের উল্লেখ

করিয়াছেন। কিন্তু যে কারণে এগুলি বিশ্বাসযোগ্য ও অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান যুগে যে সমুদয় নূতন কুলগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাও ঠিক ঐ একই কারণে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত অকৃত্রিম ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ঠিক কুলগ্রন্থের শ্রেণীভুক্ত না হইলেও কয়েকখানি গ্রন্থে কুলশাস্ত্রোক্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আনন্দ ভট্টকৃত বল্লালচরিত বোধ হয় এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে তাঁহার কোন সভাসদ্ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত নামক গ্রন্থে অনেক কুলগ্রন্থোক্ত বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১৮৫২ অব্দে বার্লিন নগরে মূল ও ইংরেজী অনুবাদসহ মুদ্রিত হয়। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপের রাজবাটীর দেওয়ান শ্রীকার্ত্তিকেয় রায় কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত আকারে বাঙ্গালা ভাষাতে ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত মুদ্রিত হইয়াছে। (১ক)

কুলগ্রন্থগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাচীন ও প্রামাণিক, ঐতিহাসিক উপাদানহিসাবে তাহাদের ব্যবহার করা বিষয়েও একটি গুরুতর বাধা আছে। যে সমুদয় প্রাচীন লেখক এইগুলির উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা আলোচ্য পুঁথির কোনরূপ বিবরণ দেন নাই। যে সমুদয় পুঁথির উপর তাঁহারা নির্ভর করিয়াছেন তাহা কোথায় কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং বর্ত্তমানে কোথায় রক্ষিত, পুঁথির লেখার আনুমানিক প্রাচীনতা, ভাষা ও বর্ণশুদ্ধি, পৃষ্ঠা, পংক্তি প্রভৃতি যে সমুদয় বিবরণ থাকিলে কোন পুঁথির সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় এবং একই নামে প্রচলিত অন্য পুঁথি উহার সহিত অভিন্ন কি-না তাহার নির্ণয় সম্ভব হয় সে সমুদয় বিবরণ প্রায় কেহই দেন নাই। ফলে অনেক কুলগ্রন্থের আর সন্ধান পাওয়া যায় না এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরিচিত কোন কুলগ্রন্থ ও বর্ত্তমানকালে ঐ নামে প্রচলিত কুলগ্রন্থের সহিত সাদৃশ্য ও বিভিন্নতার পরিমাণ নিরূপণ করা যায় না। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সুপরিচিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও কুলগ্রন্থের অংশবিশেষের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দিয়াছি। সুতরাং প্রাচীন কুলগ্রন্থের নামের দোহাই দিলেই তাহার কোন উক্তি প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করা সঙ্গত নহে। এই সমুদয় উক্তি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মূল পুঁথিখানি পরীক্ষা করা আবশ্যক এবং ঐ গ্রন্থের অন্যান্য পুঁথিতে ঐরূপ উক্তি আছে কি-না তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

এডুমিশ্রের কারিকা ও হরিমিশ্রের কারিকা নামক দুইখানি প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত কুলগ্রন্থের বিবরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

এডুমিশ্রের কারিকা

৺নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন যে, এডুমিশ্র মহারাজ কেশব সেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু হুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠী কথা অনুসারে এডুমিশ্র (লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক) রোষাকরের পৌত্র ও দনুজমাধু রাজার সমসাময়িক অথবা পরবর্ত্তী এবং হরিমিশ্রের মতে এই দনুজমাধু অথবা দনৌজামাধব সেনবংশ ধ্বংসের পর রাজা হন। (প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্। দনৌজা মাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥) (৩)। গোষ্ঠী কথার এই অংশ ৺লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার সম্বন্ধ নির্ণয়ের উপসংহারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৪) ৺বসু মহাশয় এই মতখণ্ডনের কোন প্রয়াস পান নাই। তবে অন্যত্র এডুমিশ্রের কারিকা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে যবনহস্তে পরাজিত কেশব সেন স্বীয় রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া কুলপণ্ডিত এডুমিশ্র সহ অন্য রাজার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এইরূপ উক্তি আছে। (৫) এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

এডুমিশ্র কুলাচার্য্যদের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন। তাঁহার

(১ক) গৌ—বা
(২) বসু ১ (১২৫)

(৩) সং—নিং (৭১১)। দনৌজামাধব যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষভাবে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা পরে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি কেশব সেনের সমসাময়িক হইতে পারেন না।

(৪) "এডুমিশ্র গিরিসুত, রোষাকর পৌত্র",
"এডুমিশ্র সুবিজ্ঞ লেখে সমাজকথা।
তার সময় যা ছিল সমাজপ্রথা॥
তিনি বলেন দনুজমাধু যদা রাজা।
কামরূপ আদি কাশী পর্য্যন্ত যে প্রজা॥" সং নিং (৭১৩)

(৫) বসু—১ (১৫৬—৭)। কুলতত্ত্বার্ণব মতে এই রাজার নাম দনৌজামাধব (৬৯ পৃঃ)।

কারিকার কোন কোন অংশ সম্বন্ধনির্ণয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এই গ্রন্থের কোন পরিচয় নাই। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে এডুমিশ্রের "কারিকা মধ্যে অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ এবং মধ্যে মধ্যে আধুনিক কুলাচার্য্যের লিখিত বিবরণাদি প্রক্ষিপ্ত থাকায় তাঁহার কারিকা হইতে তৎসাময়িক মৌলিকাংশ নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা অতীব কঠিন। (৬) বসু মহাশয় যাহাকে অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য বলিয়াছেন তাহার কোন কোন ঘটনা বল্লাল সেনের সময়কার অর্থাৎ এডুমিশ্রের জীবিতকালে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। প্রায় সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে যদি কাহারও উক্তি অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য হয় তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় গ্রন্থখানি কৃত্রিম, নয় ত গ্রন্থকার বিচারশক্তিহীন। সর্ব্ব প্রাচীন কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য কুলশাস্ত্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইতে পারে।

বসু মহাশয় এডুমিশ্রের কারিকার যে অসম্পূর্ণ পুঁথি পাইয়াছেন তাহার কোন বিশিষ্ট পরিচয় দেন নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় এডুমিশ্রের কারিকার কোন পুঁথি দেখিয়াছেন কি-না সন্দেহ; সম্ভবত অন্য কোন গ্রন্থে উদ্ধৃত এডুমিশ্রের কারিকার বচন তিনি স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন। এডুমিশ্রের কারিকার কোন পুঁথি সন্ধান করিয়া পাই নাই।

হরিমিশ্রের কারিকা

হরিমিশ্র নামে দুইজন কুলাচার্য্য ছিলেন। নুলো পঞ্চানন (ষোড়শ শতাব্দী) ইঁহাদের দুই জনেরই পরিচয় দিয়াছেন। নুলো পঞ্চাননের নিম্নলিখিত ও অন্যান্য বচনগুলি সম্বন্ধনির্ণয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। (৭) বন্দ্যবংশীয় হরিমিশ্র কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দের বৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং বল্লাল পূজিত মহেশ্বর বন্দ্যোর প্রপৌত্র। সুতরাং তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশশতকে বর্ত্তমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

পঞ্চানন মুখোবংশীয় হরিমিশ্রের যে বংশ পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় তিনি বল্লালের নিকট কৌলীন্যপ্রাপ্ত উৎসাহ নামক ব্রাহ্মণের অধস্তন অষ্টম পুরুষ। সুতরাং তিনি সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। ধ্রুবানন্দের মহাবংশে ইনি অষ্টষষ্টিতম সমীকরণে উল্লিখিত হইয়াছেন। ধ্রুবানন্দের মতে একষষ্টিতম সমীকরণ সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হয় এবং অষ্টসপ্ততিতম সমীকরণ হয় তাহার এক-পুরুষ পরে। সুতরাং এই হিসাবেও মুখোবংশীয় হরিমিশ্রের সময় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে।

নুলো পঞ্চানন গোষ্ঠীকথায় লিখিয়াছেন—

"পঞ্চাননে বলে কিবা দিব পরিচয়
এডু হরি জানে কুলকথা সমুদয়।"

এই শ্লোকেও হরি উল্লিখিত মুখোবংশীয় হরিমিশ্র।

হরিমিশ্র নামক এই দুই কুলাচার্য্য যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে আদৃত হইতেন। উক্ত গোষ্ঠীকথায় পঞ্চানন লিখিয়াছেন:

"বন্দ্য হরিমিশ্র বাক্য পূর্ব্বদেশে ধৃত।
মুখমিশ্র হরি গাথা গঙ্গাতীরে গীত॥"

৺নগেন্দ্রনাথ বসু যে হরিমিশ্র কারিকাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক কুলগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কোন্ হরিমিশ্রের রচিত সে সম্বন্ধে স্পষ্টত কিছুই বলেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী যে সমুদয় লেখকেরা হরিমিশ্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাঁহারাও এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায় বন্দ্যহরিমিশ্রকৃত 'বংশাবলী' এবং মুখহরিমিশ্রকৃত 'সারাবলী' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। (৭ক) ইহার কোন্‌টি ৺বসু মহাশয় উল্লিখিত 'হরিমিশ্রের কারিকা' তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে হরিমিশ্র "খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ দনৌজামাধবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।" (৮) কিন্তু তিনি ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ দেন নাই।

হরিমিশ্রের কারিকা সম্বন্ধে ৺বসু মহাশয় বলেন যে, এডুমিশ্রের কারিকা ইহা অপেক্ষা প্রাচীন হইলেও "সৌভাগ্যক্রমে হরিমিশ্রের কারিকায় আধুনিক কুলাচার্য্যের হস্তক্ষেপের কোন নিদর্শন না থাকায় এই কারিকাখানি সর্ব্বপ্রাচীন ও মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম। (৯)

৺বসু মহাশয় হরিমিশ্রের কারিকা ও এডুমিশ্রের কারিকার পুঁথি পাইয়াছেন এবং এ দুইখানিই অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক কুলগ্রন্থ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ৺বসু মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আধুনিক কোন লেখক এই দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সাধারণের নিকট এই দুইখানি গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া ৺বসু মহাশয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েকটি ঘটনায় তাঁহার সংগৃহীত কুলগ্রন্থের অকৃত্রিমত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। তথাপি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও প্রকাশ্য সংবাদপত্রে আন্দোলন সত্ত্বেও ৺বসুমহাশয় তৎসংগৃহীত এই দুইখানি গ্রন্থ কাহারও সমক্ষে উপস্থিত করেন নাই এবং ইহাদের বিশিষ্ট কোন বিবরণও প্রকাশ করেন নাই।

কয়েকমাস পূর্ব্বে বসু মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত কুল-গ্রন্থগুলি বিক্রয় করিবেন শুনিয়া আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে উহা ক্রয় করার উদ্দেশ্যে আমাদের পুঁথিরক্ষক শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিকাতায় পাঠাই ও বসু মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত কুলগ্রন্থগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে উপদেশ দেই। উক্ত তালিকায় হরিমিশ্র বা এডুমিশ্রের কারিকার নাম নাই। ঐ দুইখানি গ্রন্থ বসু মহাশয়ের গ্রন্থাগারে নাই—কোথায় আছে তাহারও কোন সন্ধান মিলিল না। ইহার কিছুদিন পরে বসু মহাশয়ের মৃত্যু হয়। মরণকাল পর্য্যন্ত যক্ষের ধনের ন্যায় এই গ্রন্থ দুইখানি বসু মহাশয় কি কারণে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু সমুদয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বসু মহাশয় সংগৃহীত এই দুইখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বতই সন্দেহ জন্মে। এই সন্দেহের সমর্থন কল্পে বলা যাইতে পারে যে, দনৌজামাধব সম্বন্ধে হরিমিশ্রের যে বচন ব্রাহ্মণ-কাণ্ডের প্রথমভাগে (১৫৬ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত বিশ্বকোষে (৪।৩৪৩) উল্লিখিত হরিমিশ্রের কারিকার উক্তির সামঞ্জস্য করা কঠিন। যদি বাস্তবিকই এই গ্রন্থ দুইখানি অকৃত্রিম হয় তবে বসু মহাশয়ের আচরণে তাহা কোন দিন বঙ্গদেশের ইতিহাসের উপকরণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিল না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

হরিমিশ্র ও এডুমিশ্রের কারিকার কোন বিশুদ্ধ পুঁথি না পাওয়া পর্য্যন্ত এই দুইখানি কুলগ্রন্থকে প্রাচীন ও প্রামাণিকরূপে ব্যবহার করা যায় না।

এই দুইখানি গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন কোন কুলগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মহিমাচন্দ্র মজুমদার 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "বল্লাল সেন কর্ত্তৃক শ্রেণীবিভাগ এবং ঘটকনিয়োগ হইবার পূর্ব্বে রাঢ়দেশগামী শ্রীহর্ষতনয় শ্রীনিবাস গৌড়ে পঞ্চব্রাহ্মণ আগমন বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লেখেন।" (১০) কিন্তু এই গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

কুলতত্ত্বার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে রাজা বল্লাল সেন ১১০৩ শকে ক্ষিতীশাদি পঞ্চব্রাহ্মণের কুলবর্ণনা করিয়া একখানি কুলগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই কুলগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কুলতত্ত্বার্ণবে বল্লাল সেনের রচিত বলিয়া যে বংশাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে অন্য সমর্থক প্রমাণ অভাবে তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। (১১)

মহেশকৃত নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা অনুসারে মহেশ লক্ষ্মণ-সেনের সমসাময়িক। (১২) কিন্তু ইহা সত্য কি-না এবং সত্য হইলেও এই দুই মহেশ অভিন্ন কি-না এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার একখানি পুঁথি আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থে আদিশূরের কোন উল্লেখ নাই।

বস্তুত যে সকল কুলগ্রন্থ সচরাচর প্রচলিত এবং যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া কুলশাস্ত্র আলোচিত হয় তাহাদের কোন খানিই খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ব্বে রচিত নহে।

---

(৬) বসু—১ (১২৫)

(৭) সং নিং (৭১২, ৭২৬—৭)

(৭ক) বন্দ্যবংশ—(৩৬ পৃঃ)

(৮) বসু ১ (১২৫)

(৯) বসু ১ (১২৬)

(১০) গৌ বা, উপক্রমণিকা (পৃঃ ।০)

(১১) কুল(২৪৩—৩০২ শ্লোক)। শব্দকল্পদ্রুমধৃত রাঢ়ীয় ঘটকারিকায় এবং রামজীবন কৃত কুলপঞ্জিকায় বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কুলশাস্ত্র-নিরূপণের উল্লেখ আছে (সং নিং ১২৭ পৃঃ, ২১৯ পৃঃ)।

(১২) সং নিং (৭১০)

উপসংহারে কয়েকখানি কুলগ্রন্থের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। এইগুলিতে প্রধানত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বংশপরিচয় আছে। বৈদিক প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণশ্রেণীর ও ব্রাহ্মণেতর জাতির বংশপরিচায়ক কুলগ্রন্থ তত্তৎপ্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

১। ধ্রুবানন্দমিশ্রকৃত মহাবংশাবলী

মহাবংশাবলী সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত। ১৩২৩ সনে 'মহাবংশ বা মিশ্রগ্রন্থ' নামে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ৺বসু মহাশয়ের মতে "মহাবংশ রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলপরিচায়ক গ্রন্থ।" ইহাতে আদিশূরের এবং কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু বল্লাল সেনের সভায় যাঁহারা কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশপরিচয় ও প্রত্যেকের আদানপ্রদানের বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থ 'মিশ্রগ্রন্থ' নামেও পরিচিত। (১৩) ৺বসুমহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত 'কুলকারিকা' অনুসারে "দেবীবর ১৪০২ শকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে মেল প্রচার করেন এবং ১৪০৭ শকে ধ্রুবানন্দ মহাবংশ রচনা করেন।" (১৪)

ধ্রুবানন্দের পুত্র সর্ব্বানন্দকৃত কুলতত্ত্বার্ণবের (২নং দেখ) উপসংহার ভাগ হইতে জানা যায় যে, দেবীবরের পর ১৪০৭শকে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) ধ্রুবানন্দ কুলাচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং মেলী কুলীনদিগের মেল ব্যতিক্রম দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে তিনি মেলকারিকা রচনা করেন। (১৫)

৺বসুমহাশয় লিখিয়াছেন, "মহাবংশের একষষ্টিতম সমীকরণ-কারিকায় ধ্রুবানন্দ লিখিয়াছেন যে, ১৩৭৭ শকে অর্থাৎ ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে পূতি শোভাকরের মৃত্যু হয়।" ইহা ঠিক নহে। কারণ ৺বসুমহাশয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠায় "সপ্তসপ্ততীতে শাকে পূতিশোভাকরে মৃতে" মাত্র এই শ্লোকটি আছে। ইহাতে অনুল্লিখিত শতাব্দীর সাতাত্তর বর্ষের উল্লেখ আছে, ১৩৭৭-এর উল্লেখ নাই। অবশ্য বংশীবদন বিদ্যারত্নের কারিকা ও সর্ব্বানন্দের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য করিতে গেলে ইহাকে ১৩৭৭ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। ধ্রুবানন্দ অষ্টসপ্ততিতম সমীকরণে শোভাকরের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের কুলপরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পুত্রগণের উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ধ্রুবানন্দ শকাব্দের পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

৺লালমোহন বিদ্যানিধি বলেন—"ধ্রুবানন্দ হরিমিশ্রের পৌত্র ও বিষ্ণুমিশ্রের পুত্র। ইঁহার প্রপিতামহ দুর্ব্বলী ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ প্রসিদ্ধ মহেশ্বর বন্দ্যো, যিনি মহারাজাধিরাজ বল্লালের নিকট বন্দ্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হয়েন।"(১৬) কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় ভট্টনারায়ণবংশের যে তালিকা দিয়াছেন(১৭) এবং ৺নগেন্দ্রনাথ বসু 'মহাবংশের' উপক্রমণিকায় ধ্রুবানন্দের গ্রন্থ অনুযায়ী যে বংশাবলী দিয়াছেন, তদনুসারে তিনি বল্লাল পূজিত মহেশ্বর বন্দ্যোর সপ্তম অধস্তন পুরুষ। সাত পুরুষে তিনশত বৎসরের অধিক ব্যবধান কল্পনা করা কঠিন। সুতরাং এই বংশাবলীও গ্রহণযোগ্য নহে। এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই দেখা যাইবে যে, প্রামাণিক গ্রন্থোক্ত প্রাচীন বংশাবলীও সর্ব্বত্র সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে।

সর্ব্বানন্দমিশ্রকৃত কুলতত্ত্বার্ণব

এই গ্রন্থখানি ১৯২৭ সনে মেদিনীপুর ব্রাহ্মণ-সভা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বানন্দমিশ্র ধ্রুবানন্দমিশ্রের পুত্র। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন যে বহু কুলগ্রন্থের সারসঙ্কলন পূর্ব্বক তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। অন্যত্র তাহা আলোচিত হইবে। এ পর্য্যন্ত প্রাচীন বা বর্ত্তমান কোন লেখক এই গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে এমন অনেক উক্তি আছে যাহা

(১৩) ৺বসু সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা (পৃঃ [২])। মহিমাচন্দ্র মজুমদার মিশ্রাচার্য্যকৃত মিশ্রগ্রন্থ নামে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন (গৌ বা, উপক্রমণিকা, পৃঃ ।/০)।

(১৪) ভূমিকা (পৃঃ ১—২)

(১৫) কুল (৬৬৩—৫ শ্লোক)

(১৬) সং নিং (৭২৫)

(১৭) সং নিং (৪৩১)

আর কোন কুলগ্রন্থে নাই। ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর অনেক নূতন মতবাদ (যে সম্বন্ধে তিনি কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দেন নাই) এই গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত হয়। কিন্তু ৺বসুমহাশয় এই গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই।

বাচস্পতিমিশ্রকৃত কুলরাম

এই কুল গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্র দেবীবরের পরবর্ত্তী অর্থাৎ ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বলিবেন মেলবন্ধন হইবার পর কুলরাম রচিত হয়।...হরিমিশ্রের প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে বাচস্পতি মিশ্র কুলরাম প্রকাশ করেন।"(১৮) প্রবাদ আছে যে, বাচস্পতি মিশ্র বৃদ্ধ ধ্রুবানন্দের নিকট কুলশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।(১৯)

বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ এই নামে প্রচলিত। ইহাদের গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই, গ্রন্থেরও কোন নাম নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিয়াছেন, "বারেন্দ্রকুল পঞ্জিকার ঐতিহাসিক অংশ 'আদিশূর রাজার ব্যাখ্যা' নামে পরিচিত। লালোর নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুকুটমণির, মাঝগ্রামের শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সার্ব্বভৌমের এবং রামপুর বোয়ালিয়ার শ্রীযুক্ত মৃত্যুগোপাল রায় মহাশয় সংগৃহীত পুঠিয়ানিবাসী ৺মহেশচন্দ্র শিরোমণির ঘরের পুস্তক মধ্যে পাঁচ প্রকার 'আদিশূর রাজার ব্যাখ্যার' পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে দুইখানিতে বল্লাল সেন আদিশূরের দৌহিত্রবংশোদ্ভব বলিয়া কথিত।"(২০)

৺লালমোহন বিদ্যানিধি, ৺মহিমাচন্দ্র মজুমদার ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা হইতে আদিশূর সম্বন্ধে যে বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা আদিশূরের প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। শেষোক্ত দুইজন বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা হইতে আদিশূরের সময়জ্ঞাপক যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন যে "যে যে কুলজ্ঞগণের সহিত আলাপ করিয়াছি তাঁহারা এই সকল বচনের কোনটির বিষয়ই অবগত নহেন।"(২১) ৺নগেন্দ্রনাথ বসুও বলেন—"বারেন্দ্র কুলাচার্য্যের নিকট হইতে এখন যে সকল কুলীনবংশাবলী পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সমস্তই আধুনিক।"(২১ক) এই সমুদয় হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে 'বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা' নামে পরিচিত কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করা সমীচীন নহে।

হুলো পঞ্চাননকৃত গোষ্ঠীকথা

পঞ্চানন দেবীবর ও ধ্রুবানন্দের সমসাময়িক, কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা কনিষ্ঠ। সুতরাং তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার হস্তে শক্তির অল্পতা ছিল বলিয়াই প্রথম বয়সে হুলো বলিয়া উপহসিত হইতেন, কিন্তু শেষকালে উহাই তাঁহার গৌরবান্বিত উপাধি হইয়াছিল। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইঁহার গ্রন্থাদি হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।(২২)

হুলো পঞ্চানন, এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র ও ধ্রুবানন্দের কুলগ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটি বচন পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬। দেবীবরের মেলপর্য্যায় গণনা
৭। ধনঞ্জয় কৃত কুলপ্রদীপ
৮। কুলার্ণব
৯। রামানন্দ শর্ম্মকৃত কুলদীপিকা
১০। কুলচন্দ্রিকা
১১। সাগরপ্রকাশ

সাত হইতে এগার সংখ্যক গ্রন্থের বিশিষ্ট কোন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সুতরাং ইহাদের রচনাকাল ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না। তবে হুলো পঞ্চানন কৃত কুলার্ণব, ধনঞ্জয় কৃত কুলপ্রদীপ ও

(১৮) বসু ১ (১২৮—৯)

(১৯) লালমোহন মুখোপাধ্যায়—বন্দ্যবংশ (পৃঃ ৩৬)।

(২০) গৌড়রাজমালা (পৃঃ ৫৮)

(২১) গৌড়রাজমালা (পৃঃ ৫৮)

(২১ক) বিশ্বকোষ, চতুর্থ ভাগ (৩১১ পৃঃ)

(২২) সং নিং (৬৭৫, ৬৯০, ৬৯৫, ৭০০, ৭০৮, ৭১২—৭২৬—৭৩২, ৭৩৪—৭৩৯)

কুলদীপিকা—এই সমুদয় গ্রন্থোক্ত শ্লোক ৺লালমোহন বিদ্যানিধি 'সম্বন্ধনির্ণয়ে' উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুলচন্দ্রিকা ও সাগরপ্রকাশ এই দুই গ্রন্থোক্ত শ্লোক ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' ১ম ভাগে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে কোন বিবরণ নাই। গৌড়ে ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থেও কুলার্ণব, সাগরপ্রকাশ, কুলচন্দ্রিক, কুলদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম আছে, কিন্তু কোন বিবরণ নাই। ৺উমেশচন্দ্র গুপ্তের মতে কুলার্ণবের প্রণেতা ধনঞ্জয় (২৩) ও কুলচন্দ্রিকার প্রণেতা বৈদ্য দুর্জ্জয় দাস (২৪)। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ পাই নাই।

এই বিস্তৃত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, যে সমুদয় কুলগ্রন্থ সাধারণ্যে পরিচিত তাহার কোনখানিই খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল—এরূপ মনে করিবার কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ নাই। হরিমিশ্রের কারিকা ও এডুমিশ্রের কারিকা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও বর্ত্তমানে তাহাদের কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই—যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার উপরেও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। প্রাচীন আরও অনেক কুলগ্রন্থ হয় ত ছিল, কিন্তু তাহা আর এখন পাওয়া যায় না।

বৈদ্যকুলপঞ্জিকার মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত মাত্র দুইখানি গ্রন্থ আছে—রামকান্ত দাস প্রণীত কবিকণ্ঠহার ও ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা। সৌভাগ্যক্রমে দুইখানি গ্রন্থেরই রচনাকাল গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমখানি ১৫৭৫ শকে অর্থাৎ ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রণীত (পঞ্চসপ্ততিথৌ শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা)। দ্বিতীয় খানির রচনাকাল ১৫৯৭ শকাব্দ অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৭৫ অব্দ। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত কোন বৈদ্যকুলপঞ্জিকার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহার পূর্ব্বে কোন কায়স্থ কুলপঞ্জিকা রচিত হইয়াছিল এরূপ প্রমাণও পাই নাই।

সুতরাং যে সমুদয় কুলগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা প্রাচীন হিন্দুযুগের সামাজিক ইতিহাস রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহার সমস্তই হিন্দু রাজত্বের অবসানের তিন-চারি শত বৎসর পরে রচিত। এই সুদীর্ঘ ব্যবধান ও জাতীয় জীবনের অবসাদ ও অবনতির ফলে প্রাচীন ঐতিহাসিক ধারার সহিত বাঙ্গালী জীবন কিরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল সংস্কৃত রাজাবলী নামক গ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল (২৫)। এই গ্রন্থে বাংলার রাজগণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অথচ ইতিহাসে সুপরিচিত সম্রাট শশাঙ্ক, ধর্ম্মপাল, দেবপাল, মহীপাল প্রভৃতি কাহারও নাম নাই এবং বিজয় সেন, বল্লাল সেন দিল্লীতে রাজত্ব করিতেন—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থোক্ত অনেক শ্লোক দেবীবর ঘটকের বচন বলিয়া পরিচিত। সুতরাং এই গ্রন্থখানিতে কুলশাস্ত্র-গুলি রচনার কালে (পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতে) প্রচলিত জনশ্রুতি স্থান পাইয়াছে—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যে সময় প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান এতদূর বিকৃত ও ভ্রান্ত ছিল, সে সময় প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে যে লোকের মনে সঠিক ধারণা ছিল, বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত তাহা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং বিগত তিন-চারি শত বৎসরে রচিত কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন হিন্দুযুগের সামাজিক বা রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে কোন তথ্য নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। এগুলির মধ্যে যে কোন সত্য নাই এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু ইহার কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং স্বতন্ত্র ও বিশ্বস্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে ইহাদের কোন উক্তিই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ইহা সত্ত্বেও যে পাঁচটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে কুলশাস্ত্রে বর্ণিত সমাজবিধির ও সামাজিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার প্রধান কারণ তিনটি। প্রথমতঃ, সাধারণের মনে কুলশাস্ত্রের প্রতি যে আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে তাহা কি পরিমাণ যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত নিরপেক্ষ বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা। ইহাতে অনেক ভ্রান্ত মত নিরাকৃত হইয়া ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হইবে এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত অনেক সামাজিক রীতিনীতির অসারতা প্রতিপন্ন হইয়া তাহাদের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইবে। দ্বিতীয়তঃ, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে প্রাচীন হিন্দুযুগের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার যথার্থ বিবরণ পাওয়া যাইবে। এই ধারণা প্রাচীন হিন্দুযুগের দিক দিয়া সত্য না হইলেও পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী যুগের বাংলার সৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। তৃতীয়তঃ, বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের নব নব তথ্য ক্রমশই আবিষ্কৃত হইতেছে। পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচলিত জনশ্রুতির সহিত সম্যক্ পরিচয় থাকিলে এই নবাবিষ্কৃত তথ্যের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ কোন কোন স্থলে সহজসাধ্য হইবে এবং ইহার সাহায্যে উক্ত জনশ্রুতির কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিয়া প্রাচীন ইতিহাস গঠনে অধিকতর অগ্রসর হওয়া যাইবে।

এই সমুদয় উদ্দেশ্য লইয়াই কুলশাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করিয়া বাংলার ইতিহাস প্রণয়নে তাহার উপর নির্ভর করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা কখনও বিস্তারিত ভাবে কুলশাস্ত্রের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন নাই। সুতরাং অনেকের মনে এমন বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাঁহারা যথোচিত বিচার না করিয়াই কুলশাস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছেন। এইরূপ মত অনেকেই প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। জনসাধারণের এই প্রকার সন্দেহ দূর করাও আমার কুলশাস্ত্র আলোচনার আর একটি উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান এবং পরবর্ত্তী চারিটি প্রবন্ধে আমি যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আশা করি নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে বর্ত্তমান কালে যে সমুদয় কুলগ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহা প্রাচীন হিন্দু যুগের প্রকৃত রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাসের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করা যায় না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কুলগ্রন্থগুলি অধিকাংশই অপ্রকাশিত ও সুদুর্লভ। সুতরাং অনেক স্থলেই অন্য আধুনিক গ্রন্থের বিবরণের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। এমতস্থলে এই প্রবন্ধগুলিতে অনেক ভুলভ্রান্তি নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। যে কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সমুদয় ভুলভ্রান্তির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন অথবা নূতন তথ্যের সন্ধান দিবেন তিনিই আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। সমুদয় কুলগ্রন্থগুলি স্বয়ং যথোচিত পরীক্ষা ও আলোচনা করিবার সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও আমি এই প্রবন্ধগুলি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কারণ ইহাতে বিতর্ক ও আলোচনা দ্বারা প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের সহায়তা হইবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কুলগ্রন্থগুলি রক্ষিত আছে এবং অনেক স্থলেই যাহা আমার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য তাহা অন্যের পক্ষে সুলভ। সুতরাং একটু আয়াস স্বীকার করিলেই অনেকে নূতন কুলগ্রন্থের সন্ধান অথবা এই সমুদয় প্রবন্ধে আলোচিত কুলগ্রন্থের সম্বন্ধে কোন নূতন অথবা ভিন্ন বিবরণ আমাকে জানাইতে পারেন। কুলশাস্ত্রের আলোচনা ও অধ্যয়ন পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে এইরূপে দশের সাহায্য প্রয়োজন। এই দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও এই প্রবন্ধগুলি রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

(২৩) মো মু (পৃঃ ২৯)।

(২৪) ঐ (৩১ পৃঃ)। কিন্তু ১৭০ পৃষ্ঠায় তিনি জয়বিশ্বাস কৃত কুলচন্দ্রিকার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(২৫) এই গ্রন্থখানি এখনও অপ্রকাশিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় আমি ইহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

প্রহিবিশন্

(হাফিজ্)

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

সুরা যদিও আনন্দ দেয় বটে এবং
বায়ুতে নিস্থত হয় গোলাপের বাস,
শ্রান্ত বীণার মত—
পূর্ণমাত্রায় সুরাপান কোরো না বন্ধু,
কারণ প্রহরী রয়েছে সজাগ।

ওরা মদ্যশালার দ্বার দিয়েছে রুদ্ধ ক'রে,
হা ভগবান!
দুঃখ কোরো না বন্ধু,
ওদের উন্মুক্ত কর্‌তেই হ'বে—
ঐ প্রতারণা এবং আত্মপ্রবঞ্চনা-গৃহের দ্বার!

মোহ-মুক্তি

নাটক

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রমণ মিত্রের বহির্বাটী
সময়—সকাল

ভাইপো শ্রীপতি মিত্র-মশার সহিত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছেন

(পদচারণ)

শিরোমণি-মশার কাছে থেকে আহত মনে বাড়ী ফিরে, সামনেই ভাইপো শ্রীপতিকে দেখে—

রমণ। 'হরের্ণামৈব কেবলম্', 'হরের্ণামৈব কেবলম্' —একি, সকালে তুমি আবার এখানে কেনো! যাদের মিথ্যা না কোয়ে পেট চলে না, সকালে তাদের সঙ্গে কথা কোয়ে দিনটা নষ্ট করতে চাই না···

শ্রীপতি। কখন আসি বলুন কাকাবাবু! গিয়েই তো কাছারি ছুটতে হবে, ফিরতে রাত আটটা। মিথ্যে কোয়ে পেট্ চালাবার মত' কেস্ পেলেও এখন আসতুম না, তাও যে পাচ্ছি না কাকাবাবু। দু'মাসের ভাড়া পড়ে গিয়েছে, আমাকে দয়া করুন—পশ্চিম দিকের দুখানা ঘর আর বাইরের একখানা—বাবা যা ব্যবহার করতেন—ছেড়ে দিলে আমি তাগাদা আর দুর্ভাবনা থেকে বাঁচি। সেগুলো তো আপনার ব্যবহারে আসছে না।

রমণ। এই যে, উকীল হয়ে বেশ কথা কইতে শিখেছ। ব্যবহারে না থাকলেই বুঝি অপরকে বিলিয়ে দেওয়াই বিধি!

শ্রীপতি। অন্যকে কেনো দেবেন—ভাইপো তো আর অপর নয়—

রমণ। তোমার বাবাই তো অপর কোরে গেছেন।

শ্রীপতি। বাবাকে এর মধ্যে টানছেন কেনো কাকা। আমি উত্তরাধিকারসূত্রে যেটুকু পাই তার বেশী তো চাচ্ছি না।

রমণ। তাহ'লে তাঁর দেনাটাও উত্তরাধিকারসূত্রে তোমায় বর্ত্তেছে—স্বীকার করো তো? তার কি করছো?

শ্রীপতি। (আশ্চর্য্য হ'য়ে) বাবার দেনা! এ কথা তো এই শুনছি। তিনি দেনা করবেন কেনো? না মেয়ের বিয়ে না··

রমণ। তোমার জ্ঞান হ'য়েছে, সে সব কথা শুনলে লজ্জা পাবে, অসুখী হবে, তাই কোনো দিন প্রকাশ করিনি। না বলেই ভুল করেছি! যাও—আর বলি ও না—

শ্রীপতি। যে এখন রাস্তার লোক, তার আর লজ্জা সরম কি? দেনাটা কেনো, কতো, কার কাছে আমার যে জানা দরকার—

রমণ। আমি যেটা চাপতে চাচ্ছি, সেটা যাতে প্রকাশ হয় তার চেষ্টা করবে বই-কি! বাপ লেখাপড়া শিখিয়ে গিয়েছেন—সার্থক হওয়া চাই তো,—বাপের সম্মান, বংশের সুনাম, হানি করা চাই তো?

শ্রীপতি। আমার জানা আবশ্যক বলেই জানতে চাচ্ছি—

রমণ। (বিরক্তভাবে)—শুনবে! তোমার বাবা আপিসের ক্যাস্ ভেঙেছিলেন! কেউ সে কথা জানে কি, না আমি কা'কেও তা জানতে দিয়েছি! সাহেব পুলিসে দিতে প্রস্তুত। আমি সেই দেড় হাজার টাকা পুরো কোরে দিয়ে—সাহেবকে ঠাণ্ডা করি। বাবা বাড়ী এসে তোমার খুড়িমাকে আভরণ শূন্য দেখে—শয্যা নিলেন। তার পর আর ওঠেন নি। শেষ সময় বলে' গেলেন—"আমার অংশের বাড়ী ঘর, জমি সব তোমার রইলো।" বললুম—"করছেন কি—ও কি বলছেন?—শ্রীপতি"··· বললেন—"তার জন্যে চিন্তা রেখ না, শ্বশুর বড়-লোক, তাঁর সঙ্গে আমার" এই পর্য্যন্ত বলে' তাঁর কথা বন্ধ হ'য়ে যায়। সেখানে একা আমিই ছিলুম না। শুনলে! এইবার বাপের নাম জাহির করবার চেষ্টা পাও—ছেলের কাজ করো—

শ্রীপতি। আমি অভাবে পড়েই আপনার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি। ছ'মাস আগেও বলেছিলেন—"অতো ব্যস্ত হয়ো না, বাড়িটা মেরামত করবার ইচ্ছা রয়েছে; সম্ভ্রান্ত লোকেরা মধ্যে মধ্যে এসে থাকেন। এখন তুমি এলে বাড়ির কাজে হাত দেওয়ার অসুবিধে হবে—সবুর করো"

রমণ। বংশের দুর্নাম প্রকাশ করতে চাইনি—তাই বলেছিলুম—

শ্রীপতি। যদি তাই হয়, আপনি এতো করেছেন, ঘর দু'খানা ভাইপোকে দানই করুন না। আমার যে বড় অভাব··

রমণ। (বিকৃত কণ্ঠে) "যদি তাই হয়" মানে কি? আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছো না বুঝি—বেইমান! এখানে আর মুখ দেখাতে এসো না! ভেবেছিলুম···নাঃ আর নয়। জেনে বুঝে শত্রু ঢোকাতে···

শ্রীপতি। (আহত প্রাণে) জেনে বুঝে বাড়িতে শত্রু কেউ ঢোকায় না কাকাবাবু, শত্রু আপনিই এসে ঢোকে···

রমণ। (রাগে কাঁপতে কাঁপতে)—বেরও এখান থেকে—দূর হও রাস্কেল্! বেইমানের মুখ দেখতে চাই না।

বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। পত্নী তাড়াতাড়ি উপরের জানলা থেকে সরে গেলেন

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীপতি ধীরে ধীরে চিন্তাকুল, অন্যমনস্ক ও হতাশভাবে রাস্তায় পা বাড়ালে।

চন্দ্র চৌধুরী মশাই রমণ মিত্রের কাছে আসছিলেন, শ্রীপতিকে অন্যমনস্ক দেখে—

চন্দ্রবাবু। একি! তোমাকে এমন দেখছি কেনো?

শ্রীপতি। (চমকে ফিরে চন্দ্রবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে) —কাকাবাবুর কাছে গিয়েছিলুম জ্যাঠামশাই—

চন্দ্রবাবু। ডেকেছিলেন বুঝি—দেখা হোলো?

শ্রীপতি। ডাকবেন কি—আমাকে এড়াতেই চান্। দেখা হ'লে বিরক্তই হন্! কি করবো জ্যাঠামশাই—বড় কষ্টে পড়েছি। দু'মাসের বাসা-ভাড়া ৬০৲ টাকা চেপেছে। তাই আমার অংশের ঘর দু'খানা আর বাইরের একখানা চাইতে গিয়েছিলুম। ছ'মাস পূর্ব্বে বলেছিলেন—"বাড়িটে আগে মেরামত করি।" কিন্তু আজ যা শোনালেন, সে যে ভয়ঙ্কর কথা! বাবা নাকি আপিসের ক্যাস্ ভেঙে···

চন্দ্রবাবু। কে—চণ্ডী? নারায়ণ, নারায়ণ! এমন কথা মুখে আনতে কেউ পারে না। তার মত মানুষ কি আর দেখতে পাবো! কি শুনতে কি শুনেছ···

শ্রীপতি। না জ্যাঠামশাই—আমি ঠিকই শুনেছি। কাকাবাবু নাকি দেড় হাজার টাকা দিয়ে—তাঁকে বাঁচান। তাই তিনি তাঁর অংশ—কাকাবাবুকে দিয়ে গেছেন—

চন্দ্রবাবু। (সহাস্যে)—তোমার কাকাবাবুকে চেন না শ্রীপতি—গাঁয়ের অনেকেই চেনেন না! এখন তাঁর জপের সময়—এ-তো আমাদের জপ্ নয়! তাই ও-সব বৈষয়িক কথা শুনে বিরক্ত হয়ে থাকবেন।—(চিন্তিত-ভাবে ইতস্তত কোরে)—তোমায় বলি—আরো কারণ আছে বাবা, তার কিছু কিছু আভাস আমি পেয়েছি; স্পষ্ট ব'লতে পারেন না তো। ধর্ম্মপ্রাণ লোক, আপন বাড়ির ছেলেপুলের স্বভাব চরিত্র—নির্ম্মল দেখতেই চান। পাপ-কথা যে আর উচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে পারেন না—নইলে নিজেই বলতেন। তাই বিরক্ত দেখে থাকবে···

শ্রীপতি। (আশ্চর্য্য হয়ে) আমি যে কিছু বুঝতে পারলুম না জ্যাঠামশাই! আপনিও কি তাহ'লে···

চন্দ্রবাবু। (স্নেহের হাসি টেনে) আরে পাগল—তাঁর মত উচ্চ অবস্থার লোকের কথায় কি আমাদের প্রতিবাদ চলে!

শ্রীপতি। আপনার মত' সরল উদার প্রকৃতির লোক তো আমার নজরে পড়ে না···

চন্দ্রবাবু। (ব্যস্তভাবে) ও সব কথা থাক শ্রীপতি। তা যাই হোক্, ব্রজ লাহিড়ীর বাড়ির ঝি কদমের সঙ্গে তুমি কথা কও, সম্পর্ক রাখো, তাতে যে তোমার কাকাবাবুর মর্য্যাদার কতটা হানি করা হয় ও হ'তে পারে, সেটা কি তুমি বুঝতে পার না? কলকেতার সব বড় বড় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকেরা যাঁর পায়ে মাথা ঠ্যাকায়, তাঁর সেই মাথা হেঁট করা হয় যে তাতে! তুমি যে তাঁর বংশের ছেলে—

শ্রীপতি। কদম সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু শুনিনি জ্যাঠামশাই, জানবার দরকারও মনে করিনি। আমি এই নতুন ওকালতী আরম্ভ করেছি; আমার কাছে যাঁরা আসেন,

প্রায়ই সব অপরিচিত। কদম ব্রজবাবুর বিধবা পত্নীকে দেখা শোনার জন্যে তাঁর সাহায্যের জন্যে আছে—এইমাত্র শুনেছি। আমরা ব্রজবাবুর একপ্রকার বন্ধুই ছিলাম—নিকট প্রতিবাসীও। তাই তাঁর কিছু জানবার দরকার হ'লে—কদমকে পাঠান, সে আসে। তাতে এমন কি···

চন্দ্রবাবু। তোমার কাকাবাবুর মুখেই শুনেছি—কদমের স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল না—

শ্রীপতি। অনেকের বাড়িতেই তো ঝি আছে—কে কি ছিল সে খবর কয়জন রাখেন জ্যাঠামশাই? আর কাকাই বা এসব—

চন্দ্রবাবু। তোমরা আজকালের ছেলে—বুঝবে না শ্রীপতি। ওঁর এখন যে অবস্থা—ওঁর অগোচর কিছু আছে কি! সব যে ওঁর এখন নখদর্পণে! গ্রামের শুভ চিন্তার ভার যে ওঁর উপর আপনিই গিয়ে পড়েছে! যাক্—তুমি বাবা কদমের কোনো সংশ্রব রেখ না। দেখ্‌বে সব ঠিক্ হয়ে যাবে। বাড়ী-ঘর তো ওঁর এখন বন্ধন—তুচ্ছ কথা! কোন্ দিন কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে পড়বেন কেউ জানতেও পারবে না। আমরা পালা কোরে—চোখে চোখে রেখেছি—

শ্রীপতি। আপনার মত জ্ঞানী লোকের (ক্ষমা করবেন) এ কাজটি কি ভালো হচ্ছে জ্যাঠামশাই! টেনে রেখে ওঁর অনিষ্ট করাই কি আমাদের উচিত? শুনেছি—বংশের একজন তাঁর কৃপা পেলে—উপর নীচের সাত পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়—

চন্দ্রবাবু। কথা ঠিক্ বটে! কিন্তু আমরা ঘোর সংসারী, স্বার্থপর, তাই নিজেদের মঙ্গলের জন্যই ওঁকে রাখা। যাক্—সে অনেক কথা। তুমি কিন্তু বাবা—যা বললুম তা শুনো—ভালো হবে। ওসব স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশায় ভদ্র সন্তানদের—বুঝলে···অপযশ আছে—

শ্রীপতি। (একটু স্তম্ভিত থেকে) আজ কি কুক্ষণেই বেরিয়েছিলুম! কাকাবাবু শোনালেন—বাবা আপিসের ক্যাস্ ভেঙে ছিলেন! আপনিও আমার চরিত্রের উপর—

চন্দ্রবাবু। না—না—আমি কেনো তোমার কাকাবাবুর কাছে—

শ্রীপতি। হ্যাঁ—তাই হেলো—এবং আপনি তা—

চন্দ্রবাবু। আহা—ওকথা ভাবচো কেনো? তাঁর বাক্য অগ্রাহ্য—

শ্রীপতি। করা যখন যায় না, তখন তাই তো হোলো জ্যাঠামশাই—

চন্দ্রবাবু। না—না, আমি বলছি—কাজ কি দুশ্চরিত্রার সঙ্গে কথা কোয়ে! গুরুজন যা চান্ না—বুঝলে—

হাঁপাতে হাঁপাতে কদমের দ্রুত প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। (বেশ সহজভাবে) এই যে—এস বা।

কদম। বাবা! (পদানতভাবে প্রণাম) মা, ছেলে-মেয়েরা সব ভালো আছেন বাবা? এমন ফুরসৎ পাই না যে গিয়ে দেখে আসি। (শ্রীপতির প্রতি) বাবা—বাবা! এত ছোটাতেও পারেন—

চন্দ্রবাবু। বউমা কেমন আছেন কদম?

কদম। সে আর কি শুনবেন বাবা! শরীরের উপর মানুষের এমন অযত্ন—কখনো দেখিনি। খেতে হয় তাই তিন-পোর বেলায় এক-মুঠো ভাতে-ভাত ফোটান্। কিছু বললে—তাঁর চোখে জল গড়িয়ে আসে—

চন্দ্রবাবু। (ব্যস্তভাবে) থাক্ কদম থাক্! (দীর্ঘ-নিশ্বাসের সহিত) নারায়ণ!—শ্রীপতিকে খুঁজছিলে?

শ্রীপতি। না—আমাকে খোঁজবার কোনো দরকার নেই; আমার দ্বারা কিছু হবে না—

কদম। (আশ্চর্য্য হয়ে) আমি মরছি ছুটোছুটি কোরে, আমারি ভুল হয়েছে! দাদাবাবু উকীল মানুষ—শুধু হাতে কাজ করতে ওঁদের আইন্ যে মাথার দিব্যি দেয়!

চন্দ্রবাবু। (সহাস্যে) বেশ বলেছ কদম—ঠিক কথা বলেছ—

শ্রীপতি। না জ্যাঠামশাই, আপনিই ওকে বারণ কোরে দিন। আমার কাছে আসবার কোনো দরকার নেই। তাতে আমার অনিষ্ট আছে—

চন্দ্রবাবু। ওকি শ্রীপতি! ও এলো হাসতে হাসতে—তাকে অমন রূঢ় কথায়—

কদম। (সহসা অভাবনীয় আঘাতে, সবিস্ময়ে) না বাবা, দাদাবাবু ঠিকই করেছেন। ভগবান যাদের দুর্দ্দশায় ফেলেছেন, তাদের সাহায্য করা মানুষের উচিত কি!

কদমের চক্ষু জলে ভেসে গেল

চন্দ্রবাবু। (কথা খুঁজে না পেয়ে) কি কাজ ছিলো কদম? অতো ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলে—

কদম। (চোক মুছতে মুছতে সামলে) নিজের বুদ্ধির দোষে বড় কষ্ট পেয়েছি বাবা—অবস্থার কথা মনে থাকে না! আগেকার অভ্যাস যায় না—আপনাদের পায়ে পায়ে ঘুরি, দুটো মিষ্টি কথা পেলে বর্ত্তে যাই। আপনারাও ভালবাসেন—'দূর ছাই' করেন না, তাই আবদারও বেড়ে গিয়েছে। নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ে না। দুটো মিষ্টি কথা আর বামুন-বাড়ির দু'মুঠো অন্ন ছাড়া আর তো কিছুই চাই না বাবা! বউদি সে দুই-ই আমাকে দেন—নিজের বোনের মতো দেখেন। যতটুকু পারি তাঁর কাজ করবার চেষ্টা পাই। অনেক দেখলুম, অমন মেয়ে দেখিনি বাবা। তাঁর যে এ-দশা ঘটেছে, সেটা ভগবানের পরীক্ষা বলেই মনে হয়। (মুখে হাসি এনে) কি সব বলে' চলেছি—মনের ঠিক্ নেই! হ্যাঁ—উকীল দাদা আজ আমাকে শুধু চেতিয়ে দেন্ নি, শিউরে দিয়েছেন! আমি তাঁর কাছে দরকারে এলে—তাঁর অনিষ্ট আছে! সর্ব্বনাশ!

চন্দ্রবাবু। না, না, কদম—ও কি সত্যই তা মনে করে!

শ্রীপতি। (দৃঢ়ভাবে) হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, আমি আজ থেকে সত্যই তা করি—

চন্দ্রবাবু। সত্য হলেও, এমন রূঢ় কথা কদমের মুখের উপর তুমি বলো কি কোরে?

কদম। আপনারা দয়া কোরে ভালোবাসায় দিন্ দিন্ আমার স্পর্দ্ধা সত্যিই বেড়ে যাচ্ছিলো। ভাবিনি যে আমি ঝি-চাকর বই আর কিছুই নই! দাদাবাবু, আমার উপকারই করলেন—

চন্দ্রবাবু। না না, তোমাকে কোনোদিন কেউ—ঝি-চাকর ভাবে নি—ভাবতে পারে না। তোমাকে আমি মেয়ের মতো দেখি। যাক্ ও-সব কথা। শ্রীপতির মনটা আজ নানা কারণে ক্ষুব্ধ অশান্ত রয়েছে। ও-কথা তুমি ভেব না কদম—হ্যাঁ কি কাজ ছিল বললে না?

কদম। (চোখ মুছে) সে কাজ আমার মিটে গিয়েছে বাবা, আর দরকার হবে না। বউদির ব্রত আছে, এক খান ধুতির দরকার—তাই···। এখন আমিই তা কিনে নিতে পারবো। আমার আবার লজ্জা সরম কি! কথাটা ভুলে গিয়েই তো—

চন্দ্রবাবু। (সে কথায় কান না দিয়ে)—টাকা এনেছো—দাও। (কদমের অনিচ্ছা দেখে)—না, আমি কোনো কথা শুনব না—দাও···(হাত পাতলেন)

কদমের জিদ্ রইল না; চন্দ্রবাবুর হাতে দুটি টাকা দিতে হোলো

শ্রীপতি। দিন্—আপনি কোথায় যাবেন! আমার রাস্তাই ওই—

কদম চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল

চন্দ্রবাবু। নাও—আমি তোমাকেই দিতুম—

শ্রীপতির হাতে টাকা দিলেন

দেরি হয়ে' গেল'—প্রভুর দেখা পেলে হয়। জপে না বসে' পড়েন—

দ্রুত রমণ মিত্রের বাড়ির দিকে চললেন

শ্রীপতি। (অবাক হয়ে' তাঁর দিকে চেয়ে) আশ্চর্য্য লোক! ডুবতে আর বিলম্ব নেই দেখছি। একেবারে গ্রহের গ্রাসে গিয়ে পড়েছেন! জমিদার বংশে এমন সাদাসিদে আত্মভোলা উদার লোক, কোথা থেকে এসে যে জন্মেছিলেন—ভেবে পাই না। ধর্ম্মের আবরণে কাকাবাবু ওঁকে মন্ত্রমুগ্ধ কোরে রেখেছেন! ভগবান ওঁকে রক্ষা করুন।

এখন আমিই বা করি কি (চিন্তা)—নন্দকে জানানো তো দরকার! সে কি বলে শুনি—তার পর···

চলে গেলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—ব্রজ লাহিড়ীর বাড়ী
সময়—বৈকাল
উপস্থিত—বাড়ীর দ্বার বন্ধ

বহির্দ্বারে চন্দ্র চৌধুরী মশাই

চন্দ্রবাবু। কদম, কদম! বাড়ী আছো কি?

কদম। কে গা?

চন্দ্রবাবু। আমি গো—একবার দোরটা খোলো—

কদম। তুমি কে গা—কি দরকার?

বলিতে বলিতে ভিতর হইতে দ্বারোদ্ঘাটন। চৌধুরী মশাইকে দেখিয়া সলজ্জে মাথার কাপড় টানা

কদম। চৌধুরী মশাই আপনি! মাপ করবেন, আমি বুঝতে পারিনি—

পদধূলি গ্রহণ

চন্দ্রবাবু। তুমি তো ঠিকই করেছ কদম। বাড়িতে তো পুরুষ কেউ নেই—ডাকলেই তো যাকে তাকে দোর খুলে দিতে পার না। তোমাকে অবলম্বন করেই বউমা রয়েছেন—সাবধান হওয়াই তো উচিত—

কদম। বউদিকে কিছু বলবেন কি? তিনি এই দোরের পাশেই আছেন—

চন্দ্রবাবু। না—বিশেষ কিছু নয় মা; এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলুম, একবার খবরটা নেবার জন্যেই ডাকলুম। নেওয়া তো দুবেলাই উচিত—পেরে উঠিনা মা—মনে সর্ব্বদাই থাকে। বলাই তো আছে—যখনি কিছু দরকার পড়বে বা কিছু বলবার থাকবে—আমাকে জানাতে সঙ্কোচ কোরো না। ব্রজ চলে' গেছে—আমার আপন ভাই গিয়েছে। ভগবান যা ভালো বুঝেছেন—করেছেন! তার উপর তো মানুষের কোনো হাত নেই মা। এখন মানুষে যেটুকু পারে, তা যেন করতে পারি। যাক্—দিন তো কাটাতেই হবে মা, সেটা শ্রীহরির নাম, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সেবা, এই সব নিয়েই থাকবার চেষ্টা কোরো। পরকালটাই মা হিঁদুর প্রধান লক্ষ্যের জিনিষ। গ্রামে কিছুই ছিল না, এখন শ্রীভক্তিভূষণের কৃপায় তার উপায়ও দিন দিন হচ্ছে···

কদম। আজ আবার একখানা ছাপানো কাগজ দিয়ে গেলো—সিদ্ধি-সভায় সংকীর্ত্তন, আরো কি সব আছে। সেখানে কি মেয়েরাও যেতে পারবে বাবা! কই কাগজ বিলি করতে তো কখনো দেখিনি···

চন্দ্রবাবু। শ্রীহরির কৃপায় দিন দিন উন্নতিই দেখবে। ওই সম্বন্ধেই তো বলে' যাবো ভেবেছিলুম। মেয়েরা থাকেন বই কি। আমাদের বড় ভাগ্য যে শ্রীভক্তিভূষণকে পেয়েছি! উনি যে ভিতরে ভিতরে এতটা বেড়ে গেছেন—কেউ বুঝতে পারিনি মা। হঠাৎ কাল যে ভাব তাঁর দেখলুম···

কদম। কার কথা বলছেন বাবা?

চন্দ্রবাবু। (বাধা দিয়ে) মন দিয়ে শোনো—আপনিই বুঝবে। তারপর শুনলুম—বউমার ওই বাগান বাড়ি বিক্রির চেষ্টায় ক'দিন—কোথায় ভদ্রেশ্বর, বরাকর, কোথায় কোতোলপুর অনবরত ঘুরেছেন। বলেন—ভার নেওয়ার চেয়ে বড় দায়িত্ব আর নেই—কথা দেওয়া কি-না—শব্দ যে ব্রহ্ম! ফেরবার সময়—কলকেতায় এক ব্যারিষ্টার শিষ্যের বাড়ী রাত কাটান। কলকেতায় যে ওঁর এত সব বড় বড় শিষ্য আছেন, সে কথা কোনোদিন মুখে আনেননি। কি ত্যাগ, কি আত্মগোপন!

কদম হাত জোড় কোরে মাথায় ঠেকালে

চন্দ্রবাবু। তারপর শোনো—সেই ব্যারিষ্টারের স্ত্রী আর মেয়ে কীর্ত্তন গান করেন। শ্রীভক্তিভূষণ—ভাব চাপতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন—

কদম। ওমা কি হবে গো।

চন্দ্রবাবু। বড়লোক ভয় পেয়ে ডাক্তার ডাকেন। সেই অবস্থায় প্রভু নানা আশ্চর্য্য কথা ক'ন্। সবই যেন কোনো অদৃশ্য পুরুষের সঙ্গে কথা—"আমায় কেনো এ ভার দিলে—আমি তাদের কি বলবো—কে বিশ্বাস করবে—সবাই যে মর্ত্তের ময়লা মাখা···"

কদম। গা যে শিউরে ওঠে গো!

চন্দ্রবাবু। শিউরোবারই কথা যে! তখনো তাঁর সংজ্ঞা নেই। ডাক্তার ভয় পেয়ে বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় কবিরাজ ও আরো প্রবীণদের আনান। তাঁরা দেখেই তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বলেন—"এ যে সমাধি—তোমরা কি এঁকে চিনতে না! এটা যে এখন ওঁর সমাধি ভঙ্গের অবস্থা। এমনটা হবার পূর্ব্বে ভগবৎপ্রসঙ্গ কিছু হয়েছিল কি?" শুনে সবাই অবাক্।

কদম। হবে না—ব্যাপারখানা কি!

চন্দ্রবাবু। ডাক্তার-কবিরাজকে ভিজিট্ দিতে যাওয়ায়, তাঁরা বলেন—"যা পেয়েছি তা এ জন্মের জন্যে যথেষ্ট। এ রোগের ভিজিট্ মহাপুরুষের পায়ের ধূলো—ভাগ্যে তা মিলেছে।—সেই সব ব্যারিষ্টার, ডাক্তারেরাই তো—এই সভার ব্যয় আর নোটিস্ ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ সব কথা কি চাপা থাকে মা—

কদম। (বউয়ের প্রতি) এখন বুঝলে—আমাদের মিত্তির মশাই—ভক্তিভূষণ···

চন্দ্রবাবু। 'শ্রী' বলতে হয়—শ্রীভক্তিভূষণ। তুমি ঠিকই বুঝেছ কদম। কিন্তু এখানকার লোক এখনো ধারণা করতে পারেনি—দোষ নেই—যেরূপ গোপন সাধনা, আমরাই ধরতে পারি নি! যাক্—যার ভাগ্যে আছে

এইবার দিন কিনে নেবে। যেও, বউমাকেও নিয়ে যেও—তাঁর মনটা শান্তি পাবে।

কদম। শুনেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—যাব না আর!

চন্দ্রবাবু। যাবে বই কি, যেও যেও—

কদম। (বিষণ্ণ মুখে) পাপ যে ছাড়ে না বাবা। কবে আবার আপনাকে পাবো—তাই··

চন্দ্রবাবু। কেনো? কিছু বলবার থাকে—বল না।

কদম। সংসারে জড়িয়ে থাকলে—চাই তো সবই। ওই পাপ বাগান-বাড়িটার কথা···

চন্দ্রবাবু। প্রভু সবে এই ফিরেছেন, একবার মাত্র দেখা। উদাস হয়েই রয়েছেন—বড় আঘাত পেয়েছেন—

কদম। (উৎকণ্ঠার সহিত)—আহা—পড়ে' গিছলেন নাকি? ও অবস্থায় আর একা—

চন্দ্রবাবু। (একটু হাসি টেনে) না রে পাগ্‌লি। ও অবস্থায় যে তিনিই আগ্‌লে বেড়ান—সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তা নয়। বললেন—"চন্দোর, বিষয়ের কথা আর আমাকে শুনিও না—বিষ—বিষ, কান দুটো জ্বোলে যায়!—বউয়ের বাড়ির ভার আমার উপর পড়েছে কেনো—তা জানো? জানলে আমিই কি ওতে মাথা পাততুম!—ওটা রাধারাণীর পরীক্ষা চন্দোর—আর এই অধমের অগ্নিপরীক্ষা! শুনে আশ্চর্য্য হয়ো না—জগতে আশ্চর্য্য কিছু নেই চন্দোর—কিছু নেই। মানুষে সব পারে! যেখানে যাই শুনি—"ওটা না কি ভূতের বাড়ী!" কেউ টেঁকতে পারে না—ব্রজরও তাই সয় নি। তাই নিতে কেউ সাহস পায় না। আজ মনে হয়, জানি না কেনো—বাবা আমাকে ও জমিতে যেতে বারণ করতেন। অন্য কারণও থাকতে পারে। আমার মনে হয়—এ সব মন্দ লোকের কাজ—শিরোমণির পুকুর-সংলগ্ন কি না—বুঝতে পারছো? কিন্তু আমিও দেখবো—কে কি করতে পারে! রাধারাণীকে দিন রাত জানাচ্ছি—আমি ও-বাড়ী শোধন কোরে দেখিয়ে দেবো! যখন ভারই পড়েছে—কারো দুরভিসন্ধি খাটবে না।" এর বেশী আর ভাংলেন না—

কদম। (চিন্তামাখা মুখে) তবে কি হবে বাবা!

চন্দ্রবাবু। উনি যখন হাতে নিয়েছেন, জেদ্‌ও পড়েছে,—তখন তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। যার তার হাতে পড়ে নি কদম্। এখনো আত্ম-প্রকাশ করেন নি—তাই! বউমা যেন উতলা না হন্। উনি যেমন যেমন বলেন—কোরে যাওয়া চাই। না হয় দু দিন দেরিই হ'বে—বুঝলে?—

কদম। বউদি বলছেন—আপনি ছাড়া ওঁর আর কেউ নেই—

চন্দ্রবাবু। আমাকে কিছু বলতে হবে না মা। আমি ওর উপায়—ওঁকে দিয়েই করাবো। (এক পা এগিয়ে, নিম্ন কণ্ঠে) কারুকে বোলো না কদম—রাধারাণী ওঁর হাত-ধরা, এ আমি বিশেষ জানি।—আচ্ছা মা, এখন আমি চললুম।

কদম। বউদি প্রণাম করছেন।

চন্দ্রবাবু। ধর্ম্মে মতি হোক্—শান্তি পান্—

চলে গেলেন

অপর্ণা। (বেরিয়ে এসে, বিমর্ষ মুখে)—এ সব কি শুনছি কদম!

কদম। ভেব না—ও সব ভক্তদের লীলা আস্বাদন···

অপর্ণা। লীলা কি বল্!

কদম। ওই ভূতের কথা গো! সত্যি তো আর ছিল না···

অপর্ণা। (ক্ষোভে-দুঃখে) কিছু খোঁজ খবর না নিয়ে, সাত্ তাড়াতাড়ি বাড়ী কোরে—আমার একি দশা কোরে গেলেন! (চোখে আঁচল দিলেন)—মিত্তির মশাই নিজেই তো বললেন—ওঁর বাপও ওঁকে ওদিকে যেতে মানা করতেন।

কদম। আমার বিশ্বাস হয় না।

অপর্ণা। সাধু দেবতার কথায় বিশ্বাস হয় না কি বল্! তোর তবে বিশ্বাস হয় কা'কে?

কদম। কাকেও হয় না।

অপর্ণা। ওমা—অমন কথা বলিস নি কদম! কা'কেও বিশ্বাস না কোরে কি মানুষ থাকতে পারে? করতেই হয়। তা—এখন সে কিছু বুঝতে পারলুম না···

কদম। নাই বা বুঝলে? ওতে বোঝবার আর বড় কিছু দেখতে পাচ্ছি না। চৌধুরী মশাই—সাধুবাক্যই শুনিয়ে গেছেন।—বাকিটা সভায় গিয়ে শুনে আসবার নেমন্তন্ন কোরে গেলেন।

অপর্ণা। আগে থেকে মনটাকে অতো ময়লা কোরে রাখিস নি কদম। যাঁকে সকলে ভক্তি করছেন··

কদম। (হাসি টেনে)—আর বলতে হবে না গো। এই ময়লা কাচ্‌তে চললুম। বাপ্‌রে—তোমার যে একটু ময়লা সয় না!

আনলা থেকে কাপড় গামছা নিয়ে বেরিয়ে গেলো

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মধু মোদকের দোকান
সময়—বেলা ১০টা
উপস্থিত—মধু মোদক

হারান ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ

হারু। আজ তোমার সুপ্রভাত মধু। তাতে আজ একাদশী তিথৌ—ফলং রাশি রাশি—

মধু দোকান ছেড়ে উঠে এসে মেরুদণ্ড বক্র করে প্রণাম

আশীর্ব্বাদ করি, এখন তোমার প্রভাতগুলো সব সুপ্রভাত হয়ে দেখা দিক্। ব্রহ্মা বাক্য—দেবেও তাই, নিশ্চিন্ত থাকো···

মধু। আপনার শ্রীমুখে ফুল চন্নন পড়ুক্। এক ঘর কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কুলিয়ে-উঠতে পারচি না দেব্‌তা—

হারু। কোনো চিন্তা নেই—ব্রহ্ম বাক্য, দেখে নিও। সন্দেহ রেখ না মধু। তোমার ছেলেপুলে কয়টিই বা!

মধু। সে কি ঠাকুর মশাই! এর চেয়ে বেশি হলে যে দেশে মন্বন্তর হবে! এখন সেটা বাড়িতেই ভোগ করছি!

হারু। ওকি বলতে আছে মধু, মা-ষষ্ঠীর কৃপা। কতগুলি শুনি?

মধু। গণ্ডা হিসেবেই বলতে হয়—পউনে তিন পুরবে এই বোশেকে। আহা মাগী আর বাঁচে না দেব্‌তা—তার শরীল আর বয়না ঠাকুর। কতো করে, তার কতো সাধের ঘর বানালুম—দু'দিন পা-মেলে, শুতে পেলে না;—আঁতুড়েই তার কাট্‌ছে! (দীর্ঘনিশ্বাস) গঙ্গা পিসি বলে,—"ওকে দু'বচর ওর বাপের বাড়ী থাক্‌তে দাও!" শুনলেন জ্ঞেতের কথা? দেবতা-বামুনে বিশ্বেস থাকলে আর ও-কথা কয়! সবই তো তাঁদের ইচ্ছেয়—তাঁদের কৃপায় হয়।

হারু। ও-সব নাস্তিকদের কথায় কান দিও না—কান দিও না।

মধু। বলুন তো দেব্‌তা! (চিন্তিত ভাবে) কিন্তু এদিকে যে আওলাদ্ অণ্ডন্তি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে·····

হারু। না না, ও কথা মুখে এনো না, দ্বিধা রেখ না, যে আসে সে ভাগ্য সঙ্গে করে' আসে। ওদিকে যেমন বিশ্বাস রেখেছো—এদিকেও রেখো। দেখলে না, আমার ভূতোও ভূমিষ্ঠ হল, সিদ্ধি সভাও উত্তিষ্ঠ হ'ল—আবার ঘেঁচিও জন্মেছে প্রভুও পেকে উঠেছেন। এতদিন ভেতরে ভেতরে সব গোপনই ছিলো···

মধু। কার কথা বলছেন?

হারু। গ্রামে আর প্রভু-পদবাচ্য কে আছে? যাঁকে মিত্তির মশাই বলতে গো—সিদ্ধি সভার মাথা-মস্তক—মুণ্ড্ হে—মুণ্ড—

মধু। তাঁর এমন কি হল ঠাকুর—পিষ্টক্? আহা ভেতরে ভেতরে পেকে উঠেছে—কেউ নজর করেনি? আমারও বাকি সাড়ে পাঁচ টাকা, যায় যাক্‌গে তিনি বেঁচে উঠুন। নন্দবাবু ডাক্তার হোলো—আহা দেখে যান·····

হারু। কি পাগলের মতো বোক্‌চো? কণ্ঠে রাখো আর এত বড় ভীষণ খবরটা রাখ না। প্রভু সিদ্ধি সভা নিয়েই মেতে থাকেন—সবাই এই-ই জানতো! কাউকে ধরা দেন নি। ভেতরে মহা সমুদ্রের ঢেউ খেলছিলো—চাপাচাপি হ'লে, ওপ্‌চাবেই, কে রুক্‌বে? আগে আগে ভর্ হোতো বটে—সেটা যে সমাধির গোড়া-পত্তন তা কি করে বুঝবো। ও বস্তু সেই কুম্ভকর্ণাদির পর আর তো কেউ দেখেনি। কিন্তু কলকেতা রাজধানী বটে, ইস্পিতে সব বুঝে নেয়। একদিন মাত্র ছিলেন, ধরে' ফেলেছে! সে তো তোমার হাবাতে অভিরামপুর নয়! তারা গুণের আদর জানে। কাগজ ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সিদ্ধি সভায় জাঁকালো উৎসব। তুমি কাগজ পাওনি?

মধু। (অপরাধীর মত) তরফ্‌দার মশাই কি একখানা দিয়েছিলেন—তখন তেল মাখচি। মেয়েটা তাতে সন্দেশ মুড়ে কাকে দিয়ে ফেলেছে·····

হারু। আ-হতভাগ্য।—যাক্ প্রভু কিন্তু তোমাকে ভোলেন নি। বললেন্—"মধুকে বলে এসো, বৃহস্পতিবার সে যেন—সন্দেশ সওয়া পনের' সের, আর বাতাসা সওয়া পনের' সের বৈকালেই সিদ্ধি সভায় দিয়ে যায়।" কই

পেল্লাদের নাম করলেন না তো! যাক্, চন্দোর বাবু হাজার হোক্ বিজ্ঞ সমজদার লোক, প্রভুর সমাধি-অংশ কিছু কিছু দেখে ফেলেছেন আর চাপতে পারছেন না—এইবার সকল ভাগ্যবানেই দেখবে। এ সুযোগ খুইও না মধু, যেও, ভাগ্যে থাকে·····

মধু। একি ছাড়তে পারি ঠাকুর, ভাগ্যে আপনি দয়া করে' পায়ের ধূলো দিলেন—তাই না শুনতে পেলুম। আর ও-সব কতো কতো বললেন?

হারু। (সহাস্যে) তুমি তন্ময় হয়ে গেছ দেখছি—হবারই কথা। হ্যাঁ, সন্দেশ সওয়া পনেরো সের, আর বাতাসা সওয়া পনেরো সের। এখন ফি হপ্তা বাড়তেই যাবে। লোক এই ভেঙ্গে পড়ে দেখো না।

মধু। আপনি আমার অবস্থা সবই জানেন তো, কিছু

হারু। আহা, তোমাকে বলতে হবে কেনো, আমি আর কি না জানি। তবে এটা এই বোধন, আজ আর ও-কথা মুখে এনো না। লিখে রাখো, লেখার কড়ি বাঘে খায় না, জান তো।

মধু। আজ্ঞে, আমায় যে বাঘেও ছাড়েনি দেবতা। যাক্ গে—আচ্ছা, সৈরব কি দেখতে পারে না দেবতা? (নিম্নকণ্ঠে) পোড়া কপালীর ওই ওটা আছে কি না··· গর্ভ যে—

হারু। থাকলেই বা—তাতে কি হয়েছে? বারো মেসে জিনিষে পাপ নেই—কেনো পারবে না? হুঁঃ, কলিতে কার ভাগ্যে এ সৌভাগ্য ঘটে! তোমায় কি বোঝাবো—শাস্ত্র যে দেখনি। আরে শকুন্তলাও যে ওই নিয়ে রাজসভা পর্য্যন্ত দেখেছিলো। এ পারবে না? কত দিন হোলো?

মধু। এই তিন কব্‌লাচ্ছে।

হারু। বেশ পারবে; খুব পারবে, ও-তো কিছুই নয়, ডাক্তার রায় বোলেন—পঞ্চমে গর্ভ—ও এখন গর্ভাঙ্ক মাত্র। সাহিত্যিকরা দৃশ্য বলেন। তবে ভক্তি থাকা চাই।

মধু। তা খুব আছে ঠাকুর। কিছুতেই অভক্তি নেই—ষষ্ঠীতলা মনসাতলা, ইস্তোক আমার পাদোদক, পাঁকুই ধরিয়ে দিলে! আহা কবে মরবে, সমাধিটে দেখে রাখুক। আর তো কিছুই হ'ল না।

দীর্ঘনিশ্বাস

হারু। ভক্তি থাকলেই হোলো।—তবে আর চিন্তা কি? সন্দেশ আর বাতাসার সঙ্গে সৌরবকেও নিয়ে যেও। আমি আছি, শাস্ত্র তো আমার কাছে হে, ভয় কি? এখন চল্‌লুম—মনে থাকবে তো—কাল বৈকালে।

মধু। আজ্ঞে তা কি আর ভুলি—

প্রণাম

হারু ভট্‌চাযের প্রস্থান

ক্রমশঃ

রাগিণীর পথে

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা

অস্তরাঙা পশ্চিমের কুহেলি-আলোয়
কোথা হতে ভেসে আসে বলাকার হিয়া!
দিগন্ত আঁধারে হারা—নিশার নিলয়,
তবু একি শুভ্ররাগ উঠিল ছন্দিয়া!

এখনো কাঁপেনি নীল পাখার ঝঙ্কারে,
উৎসারিয়া ওঠে নাই স্বপ্নভোলা গান ঃ
সন্ধ্যার অঞ্চলসুপ্ত হীরকের তারে
শিহরে···শিহরে তবু হংস-অভিযান!

ওই বুঝি ছিন্ন হ'ল নীহার-গুণ্ঠন—
সারি সারি স্ফটিকের প্রসূন-আরতি
জপিতেছে ঊর্ধ্বমুখে অকূল গগন।
অনুসরি' সেই শ্বেত-দীপালি-প্রণতি
তমসা যে ভেসে গেল ছন্দময় স্রোতে···
সুর যথা ছুটে যায় রাগিণীর পথে!

বঙ্কিম সাহিত্যে প্রেম

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায় বাহাদুর

আমি যে বিষয়টি নির্ব্বাচন করেছি সে-টা সকলের পক্ষে উপযোগী হবে কি না সে সন্দেহ যে আমার মনে নেই, তা নয়। তবুও আমি প্রেমের কথা লিখ্‌বো বলে' সংকল্প করেছি। তার কারণ এ নয় যে আমি গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় পরাঙ্মুখ, কারণ এই যে যদি কোথাও থাকে তবে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগীদের কাছে প্রেমের কিছু মূল্য থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। আমাদের জগৎ এত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে যে মূল্যের বাজারে আগুন লেগে গেছে। যাঁরা 'জগৎ' নামটি উদ্‌ভাবন করেছিলেন, তাঁদের মস্তিষ্কের তারিফ করতে হয়। 'গতিশীল' বলেই তাঁরা আমাদের এই অচলপ্রতিষ্ঠ পৃথিবীর নাম দিয়েছিলেন জগৎ। এখনকার দিনে পৃথিবী যেন অস্থির হয়ে উঠেছে, চারিদিকেই 'মূল্য' টলমল করে উঠ্‌ছে। এই ক্ষিপ্ত জগতে বাস করে' মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় আমাদের মস্তিষ্ক স্থির আছে ত? 'প্রেমের' মূল্য আগে যা ছিল, এখন যে আর তা নেই, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। পাতিব্রত্য, সতীত্ব, লজ্জাশীলতা, কৌলীন্য এ সব কথার সাবেক অর্থ আর নেই। Value বদলে গেছে বর্ত্তমান সমাজে। সেদিন দেখেছি একজন বলেছেন যে রামায়ণে পিতার আদেশে রামের বনগমন উচিত হয় নি। বাপ বড় জোর বাপ হ'তে পারেন; কিন্তু তার কথায় বনে যেতে হবে, রাজ্য সিংহাসন সব ত্যাগ করে'—এর কি মানে আছে? সমালোচক হয়ত ঠিক কথাই বলেছেন, কিন্তু তাঁর মতে একটু গোল হতো এই যে রাম বনে না গেলে রামায়ণ হতো না।

কিন্তু প্রেমের মূল্য যতই কম হয়ে থাক, মাঝে মাঝে এর সাবেক কদরটুকু এই বিংশ শতাব্দীতেও বিদ্যুচ্চমকের মত ঝল্‌কে ওঠে এবং তখন তার দিকে এই অবিশ্বাসী জগৎ প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত চেয়ে থাকে অকূল বিস্ময়ে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ যখন প্রেমের জন্য সাম্রাজ্য, উচ্চ রাজসিংহাসন ত্যাগ করে' অজ্ঞাতবাস বরণ করে নিলেন, তখন অর্ধজগৎ ভাব্‌লে 'কী বোকা'! কূটবুদ্ধি বল্‌ডউইনের বিরলকেশ মস্তকে জাগতিক মূল্যের বোঝা গিস্‌গিস্ করছিল; তিনি বল্‌লেন, প্রেম এবং সিংহাসনের মধ্যে একটিকে ছাড়তে হবে, এ-ই রাজনীতি, রাজার নীতি, সাম্রাজ্যের নীতি। মন্ত্রী ভাবলেন, আমার মন্ত্রণা অব্যর্থ, সূর্য্যাস্ত-বিরহিত সাম্রাজ্য—আর সামান্যা রমণীর প্রেম—ছিঃ। তুলনা হয় না। রাজাধিরাজ! বেছে নাও, একদিকে সব, অন্যদিকে তোমার প্রেম। বিজয়ের হাসি মুখে মাখিয়ে তিনি যখন ১০ নম্বর ডাউনিং ষ্ট্রীটে ফিরে এলেন—আমি কল্পনায় সে চিত্র আঁকতে পারি, তখন তিনি ভাবলেন, half a second and the boy will come to his senses. কিন্তু সম্ভবতঃ আধ সেকেণ্ডও তাঁর লাগে নি। তিনি প্রেমকেই গ্রহণ করলেন, তাঁর নতুন করে' রাজ্যাভিষেক হলো। ছিলেন তিনি আপনার রাজ্যে আপনি বন্দী সম্রাট্, আর হলেন প্রেমিকের স্বর্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র। অগণিত সম্রাট্, শাহানশাহ বাদশাহ, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে, কিন্তু হে প্রেমিক সম্রাট্! তোমার কথা জগৎ সহজে ভুলবে না। সম্রাট্ নেপোলিয়ন রাজনীতির হাঁড়িকাঠে যখন জোসেফাইনকে বলি দিলেন, তাঁর উচ্চাশার অগ্নিশিখা যখন সেই অভাগিনীকে ভস্মীভূত করতে উদ্যত হলো, তখন জগৎ ত তার প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠে নি। কাজেই যেমন বলেছি যে, এই আত্ম-প্রতারিত জগতের সব মূল্যই যে খাঁটি মূল্য একথা কোন মতে বলা চলে না। আমরা যাকে অগ্রাহ্য করবো বলে মনে মনে কোমর বেঁধেছি, সে যে আবার কোন অসতর্ক মুহূর্তে আমাদের মনকে বেঁধে ফেলেছে, সে কথাটি আমরা সব সময়ে খেয়াল করে' দেখি না। প্রেমকে আমরা ত্যাগ করলেও, প্রেম আমাদের সহসা ত্যাগ করে না।

তাই প্রেমের কথা বলবার দরকার আছে। বিশ্বের কানে কানে যে কথাটি বলা যায়, তা মর্মে গিয়ে প্রবেশ করতে পারে। যুদ্ধের জয়ঢাক, তুরীভেরী-নিনাদও মনের মধ্যে এমন করে' বিঁধে থাকে না। সুতরাং বিশ্বের ভোজে প্রেমকে অপাংক্তেয় করতে গেলে, আমাদেরই হয়ত

অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে' থাকতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা কাব্য-পরিচয়ের ভূমিকায় বলেছেন যে, তিনি তাঁর সংগ্রহ থেকে প্রেমের বা আদিরসের কবিতা বাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "মানুষের যে প্রবৃত্তি সহজেই অত্যন্ত প্রবল, পাঠকের মন অল্পেই তাতে সাড়া দেয়, তাকে স্বাদু করে তুলতে অধিক নৈপুণ্যের দরকার হয় না। এই কারণেই গৃহিণীর রন্ধন-বিদ্যায় যথার্থ গুণপনা প্রকাশ পায় তাঁর নিরামিষ রান্নায়।" কিন্তু কথা এই, বাংলা দেশের কোনও ভোজে যদি কবি যেতেন, তা হলে দেখতে পেতেন নিরামিষ রান্না গৃহিণীর গুণপনা নিয়ে পাতার অনাদৃত কোণে আশ্রয় নিয়েছে। নিরামিষের পদের দু'দশজন—কিম্বা তাও নয়; যখন সেই বঙ্গিবাটীর সুলভ ব্যঞ্জন আস্বাদন করে' গৃহিণীর গুণপনার তারিফ করছেন, তখন শত শত নিমন্ত্রিতের আমিষতর্পণে গৃহস্থ তাঁর আয়োজনের অল্পতার দিকে ব্যাকুলভাবে দৃষ্টিপাত করছেন। বিশ্বভোজেও মানুষ যা খোঁজে, তাই তাকে দিতেই হবে। না দিলে সে ভোজে বহুপংক্তি শূন্য পড়ে থাকবে এবং গৃহস্থকে যৌন ধিক্কার দেবে।

কিন্তু আদিরসকে বর্জন করতে হবে কেন? প্রেমের মধুচক্র কি হঠাৎ মধুশূন্য হয়েছে? মানুষের হৃদয় কি একদিনে হঠাৎ নীরস শুষ্ক কাঠকঠিন হয়ে গেছে? হায় রবীন্দ্রনাথ! এতদিন যে গান শুনিয়ে বাঙ্গালীকে, বিশ্বকে মুগ্ধ করে রেখেছ, যে গীতে আজও সহস্র সহস্র নরনারী মুগ্ধ, বিভ্রান্ত, উচ্চকিত, সেই গীত ভুললে? যে প্রেম তোমাকে বিশ্ববরেণ্য করেছে, আজ তাকে তুমি অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করলে? করলে বটে, কিন্তু তাতে প্রেমের কিছুই এসে যাবে না, তোমার কাব্যপরিচয় Pisaর সৌধের ন্যায় চিরদিন কাৎ হ'য়ে থাকবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যা-ই বলুন তিনি প্রেমিক। দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নেই, তাঁর শত শত গল্প, কবিতায় ও গানে প্রেমের ছবি ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁরই পূর্বগামী। তিনিও প্রেমের বিজয়বার্তা বহন করেছেন, তাঁর সাহিত্য ও উপন্যাসে। উভয়েরই পরিচয় প্রেমে, উভয়েরই কল্পনার উৎকর্ষ প্রেম-চিত্রে। প্রেম বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের থাকে সম্ভবতঃ কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত এবং বিশ্ব-পরিচয় এবং বঙ্কিমের থাকে গীতাভাষ্য ও সমালোচনা। বিশ্ব-পরিচয়ের রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভুলতে পারি, বঙ্কিম-চন্দ্রের গীতাপাঠ নিষ্প্রয়োজন মনে করতে পারি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুমিত্রা, চিত্রাঙ্গদা ও বিনোদিনী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা, ভ্রমর বা প্রতাপকে আমরা সহজে ভুলতে পারব না।

কালিদাস থেকে আরম্ভ করে', নানা কবি, নানা ভাবুক প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন ছবি এঁকেছেন। অনুকরণ মানসিক দৈন্যের লক্ষণ। যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরা অনুকরণ করেন না। তাঁদের ছবি নানা রঙের বিচিত্র সমাবেশে অভিনব হয়ে ওঠে। আমরা তাই দেখে পুলকে আত্মহারা হই, সৃষ্টির বৈচিত্র্যে গৌরব অনুভব করি। বৈষ্ণব কবির অনবদ্যসৃষ্টি শ্রীরাধা শকুন্তলার ন্যায় পতি কর্তৃক উপেক্ষিতা হয়ে' প্রেমের পবিত্র স্বর্গে প্রয়াণ করেন নাই, তিনি এই মাটির জগতেই দিনের পর দিন গণিয়া মাস এবং মাসের পর মাস গণিয়া বর্ষ অতিবাহিত করেছিলেন দুরন্ত বিরহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রেমচিত্র আয়েষা। আয়েষা জগতে অতুলনীয়া। এই মহীয়সী মুসলমান রমণীর চরিত্র-চিত্রণে বঙ্কিম যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের তুলি ধরেছেন, তাতে কেউ বল্‌তে পারে না যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে মুসলমান ধর্ম বা সমাজের প্রতি বিদ্বেষভাব ছিল। আয়েষার প্রেম আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত। এইখানে তুলির দুই একটি টানে তিনি যে ছবিটি এঁকেছেন, তার মূল্য দিতে কেউ কৃপণতা করবে না। প্রেমের গতি কুটীল। অহেরিব গতি প্রেমঃ স্বভাবকুটীলা ভবেৎ। আলঙ্কারিক এই ইঙ্গিত করে' দেখিয়েছেন যে প্রেমের চিত্র-সম্ভাবনা অফুরন্ত। অশোক বনে সীতা প্রেমের একটি দিক, আবার বীররমণী প্রমীলা প্রেমের অন্যদিক্। পতিবিরহিণী বনবাসিনী সীতা, আর মৃতপতির অনুগামিনী শ্মশান-বিলাসিনী প্রমীলা—দুইটি চিত্রই আমাদের মন মুগ্ধ করে। আয়েষার প্রেম বিশুদ্ধ হয়েছে আত্মত্যাগের হোমাগ্নিতে। প্রেম সুরের পর্দার মত মানুষের হৃদয়কে উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে নিয়ে যায়। লক্ষ্য করলে আমাদের জীবনে এর সব ক'টি পর্দার সুরসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যায়। সুর যেমন সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে অনন্তের মধ্যে আপনাকে আপনি হারিয়ে ফেলে—সেখানে গায়ক থাকে না, শ্রোতা থাকে না, থাকে শুধু সুরের লহরী। গায়ক সেই সুরের নিবিড় অনুভূতিতে আপনার

সত্তা ভুলে যায়, শ্রোতাও সেই সুরের মধ্যে আপনার মনকে গলিয়ে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয়, তেমনি উচ্চতম কোটীতে প্রণয়ীর সত্তা থাকে না, প্রণয়িণীর কথা মনে থাকে না, জেগে থাকে শুধু প্রেম।

ন সো রমণ, ন হাম রমণী
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জনি।—রায় রামানন্দ

প্রেম যেন দু'জনের মন পিশে মিলিয়ে দিয়েছেন। পৃথক সত্তা কারও নেই। প্রেমিকা তখন ধন্য হয়ে বলতে পারেন

হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।—গোবিন্দ দাস

আমার হৃদয়দেবতা আমার হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে চিরস্থির হয়ে' ঘুমাচ্চেন, আমিও সেই আনন্দে বিবশা, তন্ময়ী। জেগে আছে শুধু প্রেম—প্রেমই পাহারা দিচ্চে—কেউ যে আমার প্রাণবন্ধুকে চুরি করবে তার সাধ্য কি?

আয়েষা জগৎসিংহকে লিখ্‌ছেন, "আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নহি। আমি যাহা দিবার তাহা দিয়াছি; তোমার নিকটে প্রতিদান কিছুই চাহি না। আমার স্নেহ এমন বদ্ধমূল যে তুমি স্নেহ না করিলেও আমি সুখী……।" এই বঙ্কিমের প্রেমের নিখুঁত ছবি। আয়েষা প্রতিদান চায় না, সে দেখ্‌তেও চায় না। কারণ দেখ্‌তে গেলে দেখা দিতে হয়। কিন্তু কি জানি কি হয়! 'রমণী হৃদয় যেরূপ দুর্দমনীয়, তাহাতে অধিক সাহস অনুচিত'। অর্থাৎ সে তার চোখের পিপাসাকে গলা টিপে রুদ্ধ করতে চায়, কেননা তার হৃদয়কে যে বিশ্বাস নাই। তিলোত্তমার বিবাহ হয়ে' গেল জগৎসিংহের সঙ্গে। সেই রাত্রিতেই আয়েষা তিলোত্তমাকে বলল, 'তোমার সাররত্ন হৃদয়মধ্যে রাখিও।' 'তোমার সাররত্ন' বলিতে আয়েষার কণ্ঠরুদ্ধ হ'ল। এযে আমার সাররত্ন, আমার প্রাণারাম, আমারই আরাধ্য ধন। তোমাকে দিলাম। এ রত্নের অমর্য্যাদা ক'র না। এই রকম যখন মনের ভাব, মনের মধ্যে প্রেম-সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তখন চোখের জল কি বারণ মানে? দরদরিত ধারায় আয়েষার নয়নবারি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল। "তিনি আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া দোলারোহণ করিলেন।" তাঁর বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হ'লো। 'যজ্ঞং সর্বস্বদক্ষিণং' এ যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়। আয়েষার প্রেমযজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়লো।

কালিদাস দেখিয়েছেন তপোবনের স্নিগ্ধশ্যামতরুচ্ছায়ায় যুবকযুবতীর মধ্যে যে স্বাধীন প্রেমসঞ্চার হয়, তার অগ্নি পরীক্ষা হয় অনুতাপে, বিরহে, অবজ্ঞায়। বঙ্কিমও স্বাধীন প্রেমের যবনিকা পাত করলেন বিরহে। তিনি প্রেমের যত চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে, তাতে একটি কথা বিশেষ করে' চোখে পড়ে—সেটি সমস্ত সমাজশৃঙ্খলার মূলভিত্তি। বিবাহিত প্রেম বা দাম্পত্য প্রেমই প্রেমের চরম চরিতার্থতা। কিন্তু তিনি প্রেমের স্বৈরগতিকে অস্বীকার করেন নাই। তিনি দেখিয়েছেন যে রূপজমোহে যে প্রেমের অভ্যুদয়, তার পরিণাম শুভ নয়। কিন্তু রূপজমোহকে বাদ দিলে মানবিকতাকে অস্বীকার করতে হয়। মানুষ চিরদিনই মানুষ। দুই এক স্থলে যে দেবত্বের আভাস পাওয়া যায়, তাই মানুষের আদর্শ, তাই তার সান্ত্বনা। কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রকে ভালবাসিল। কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে আকাঙ্ক্ষার দুর্দমনীয় বেগ ছিল। কাজেই সে প্রবৃত্তি প্রেমের উচ্চতর কোঠায় পৌছুতে পারল না। কমলমণি কুন্দকে জিজ্ঞাসা করলো: তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস—না? কুন্দ উত্তর দিল না, কমলমণির বক্ষে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলো। কমলমণি বলিল, "বুঝেছি—মরিয়াছ। মর, তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে?" কমলের রমণী-হৃদয় বুঝিল, প্রেমের গ্রাসে পড়লে দুর্বলমতি নারীর নিস্তার নাই। কাজেই তর্ক করা বৃথা। হৃদয়ের বৃত্তি যুক্তির ধার ধারে না। তাই বলিল, মর তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তার ফলাফল চিন্তা করে' কমলমণি বিচলিত হলেন এবং শুধু সেই কথাটি বল্‌লেন 'সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে'—

হরদেব ঘোষালের মুখ দিয়ে বঙ্কিম যে কথা বলিয়েছেন, সে কথা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমতত্ত্বের একটি অংশ বলে' গ্রহণ করলে ভুল করা হবে না হয়ত। "মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।……সুতরাং রূপবতীয় রূপভোগলালসা ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে

পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না।…… ……প্রেম বুদ্ধিবৃত্তি-মূলক। প্রণয়াস্পদের গুণ সকল যখন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকলগুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং তৎপ্রতি সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। …… গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে, কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এইজন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজমোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দমনীয় হয় যে অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি না—ইহা স্থায়ী প্রণয় কিনা—ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকাল স্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়।"

হরদেব ঘোষাল হয়ত একটু বেশী বলে' ফেলেছেন। অনেকে হয়ত তাঁর এই বিশ্লেষণ বিনা বিতর্কে গ্রহণ করতে পারবেন না। শ্রীমতী যখন মানে মগ্না, কলহান্তরিতা অবস্থায় কৃষ্ণবিরহে কাতরা—তখন সখীরাও এই কথাই বলেছিলেন!

বিদি গুণ পরখি পরশ-রস-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়বি ইহ রূপ লাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা।'—গোবিন্দ দাস।

অভিমানিনী যখন প্রণয় করেছিলে, তখন গুণ পরীক্ষা করে' দেখ নাই। সহজেই রূপ দেখে ভুলে' গেলে। এখন দিনে দিনে তোমার রূপ লাবণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং জীবন সন্দেহস্থল হয়ে দাঁড়াবে।

কথাটি হয়ত ঠিক। কিন্তু আবার দেখ্‌তে হবে, হৃদয়ের করে' পরীক্ষা করে' যুক্তিতর্ক দিয়ে সমঝে বুঝে যে প্রেম হয়, তাকে প্রেম বলা যায় না। তাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, আস্থা—যা ইচ্ছে বল্‌তে পারা যায়; ঠিক প্রেম তাকে বলা চলে না। You cannot make love by an act of Parliament. শুন্‌তে যতই হাসির কথা হোক্, কথাটির মূলে কিছু সত্য আছে। যুক্তিতর্ক দিয়ে ভালবাসা হয় না। আবার এ কথাও ঠিক যে—যখন প্রেমের প্রথম জোয়ারে যুক্তিতর্কের হালটি ভেঙ্গে গেছে, সাধের তরণী সকাল বেলা ভাস্‌তে ভাস্‌তে অকূলে চলেছে, তখন সে প্রেমতরী ডুবেই মরে। তাকে বাঁচানো কঠিন।

সেইজন্য শৈবলিনীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো। সে মরতে মরতে বেঁচে গেল। কিন্তু প্রতাপকে বঙ্কিম মেরে তবে ছাড়লেন। তার প্রেমের মূলে ছিল যুক্তি, কিন্তু সে যুক্তির জন্য মরলো না, মরলো তার প্রেমের জন্য। তার প্রেম ক্ষণিকের মোহ নয়, সে শৈবলিনীকে ভালবেসেছিল সমস্ত প্রাণমন দিয়ে। সংযমের জন্য সে প্রেমের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তার পরে সে দেখলো যে সে বেঁচে থাকলে শৈবলিনী বাঁচে না।…"আমি বাঁচিয়া থাকিলে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরমপ্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম।……আমি থাকিলে শৈবলিনীর চিত্ত কখন না কখনও বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে প্রতাপ মরল তার নিজের জন্য নয়। পাছে শৈবলিনীর চিত্ত-বিভ্রম ঘটে—'কখনও না কখনও বিচলিত' হবার সম্ভাবনা নহে—প্রতাপ জানতো শৈবলিনীর চিত্ত বিচলিত হবেই—তা নইলে মরবার কি প্রয়োজন ছিল? প্রতাপ নিজেকেও কি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছিলো? বলা যায় না। প্রেমিক প্রেমিকার প্রত্যেক কথাই তার নগদ মূল্য হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। হৃদয়ের ভাব কথার পিছনে অনেক সময় উঁকি মারে। আমরা সহজেই বুঝ্‌তে পারি প্রতাপ ঠিক উদাসীনের মত কথা বলে নি। তার হৃদয় যে মধুরসে অভিষিক্ত ছিল, তা আমরা তার দুই একটি কথার ভিতর থেকে অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারি। তার মরবার সংকল্পের পশ্চাতে শুধু যে মঙ্গলের হস্ত দেখতে পাই তা নয়। তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। প্রেমের সঙ্গে সংযমের সংগ্রামে সে জয়ী হয়েছে বটে; কিন্তু তার সংশয় ঘুচে নি। কাজেই তার মরা আবশ্যক হয়েছিল। এ মরা philanthropic উদ্দেশ্যে মৃত্যু নয়, পরোপকারের মহৎ উদ্দেশ্যে মৃত্যু নয়। রমানন্দ স্বামীকে প্রতাপ সে কথা ভাল করে'ই বলেছিল। 'আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই বলিয়া মরিলাম।' 'এ জন্মে

এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম।' 'আপনি বলুন আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী।' রমানন্দ স্বামী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন 'তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ, শাস্ত্র এখানে মূক।' মানুষের সংস্কৃতিও সাধনার শেষ প্রশ্নের উত্তর এই বই আর কি? গ্রন্থকার বলিলেন "যাও প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও যেখানে ইন্দ্রিয় জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও।" এইভাবে তিনি প্রশ্নটি চাপা দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের একটি পবিত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সমাজের কল্যাণ, ব্যক্তির কল্যাণ, হৃদয়ের প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন প্রভৃতি তাঁহার মনে প্রেমের কল্পনায় সাহায্য করেছিল—সেই উদ্দেশ্যে যে তিনি লিখেছিলেন তা' নয়। আর সর্বোপরি ছিল তাঁর দেশের সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর, সীমাহীন শ্রদ্ধা। যা আমাদের যুগযুগান্তব্যাপী সংস্কৃতির পরিপন্থী, তাকে প্রশ্রয় না দিয়েও তিনি প্রেমের নানা বিচিত্র কাহিনী শুনিয়ে বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাই ঠানদি দিদিমারা সুতোয় বাঁধা চশমা নাকের ডগায় নামিয়ে পুরাণ পাঠ ত্যাগ করে' তাঁর উপন্যাস পড়েছিলেন। তেমনটি আর কোনও লেখকের ভাগ্যে ঘটে নি।

———

বিরহ

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

নামিছে সন্ধ্যা ঝরিতেছে জল
ডাকে দে'য়া গুরু গুরু,
আকাশ-কন্যা কাঁদে অবিরল
শ্রাবণ হইল সুরু।

বিরহ ব্যাকুল সজল নয়ান
বাঁধন নাহি যে তার,
ঘনশ্যামরূপ মাতিয়া উঠিছে
নয়নসাগরপার।

গোপনে বালার হৃদয় বিদরি'
দলে গেছে কোন্ রাজ;
কোথায় কে যেন হারায়ে গিয়েছে
ধরিয়া মোহন সাজ।

আজিকে এমন ঘন বারি-পাতে
শীতল সন্ধ্যাকালে,
রাজার কুমার স্মরণে ভাসিয়া
লুকাল অন্তরালে।

মনে হয় তারে দেখেছে কোথায়,
ভুলেছে তাহার নাম;
নয়নে বাদল আজি তাই ঘন
বিরহের পরিণাম।

কে যেন তাহারে করেছে পাগল
এমনি নিবিড় দিনে;
আজি রে সকল অঙ্গ কাঁদিছে
তাহারি সঙ্গ বিনে।

এমনি বিশ্ব ঘনায়ে সেদিন
সেজেছিল দিক সীমা;
এমনি সুদূর নীলিম ধারায়
লভেছে তার মহিমা।

———

এ্যাণ্ড ফ্রেণ্ড্স্

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নূতন অফিস—বেঙ্গল-গ্লোরি ইনসিওরান্স অফিস।

বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। অনন্ত আসিয়া অবসন্ন-ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তার দু' চোখে হতাশার নিরুপায় দৃষ্টি!

পাশের চেয়ারে বসিয়া নীলাদ্রি খাতা দেখিয়া পলিশির কাগজ লিখিতেছিল; অনন্তর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—হলো কি অনন্ত?

অনন্ত বলিল—হোপ্‌লেশ!···চৌধুরীর জুলুম।

চৌধুরী এ-অফিসের সেক্রেটারি।

অনন্তর কথায় নাটকের ইঙ্গিত! নীলাদ্রির কৌতূহল জাগিল। নীলাদ্রি কহিল—তার মানে?

অনন্ত বলিল—এক বছরের খাতা পেড়ে রাজ্যের ভাউচারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে আজকের মধ্যে—যত রাত্তিরই [illegible]ক্। কাল অডিটর আসবে।

নীলাদ্রি কহিল—কিন্তু ও তো মাণিকের কাজ।

অনন্ত বলিল—তা বললে কি হয়! মাণিক ওঁর বাড়ীতে বিনা-মাইনের টুইসনি করে। সন্ধ্যা ছটায় তাকে এ্যাটেণ্ডান্স দিতে হবে; না হলে গিন্নী হবেন অগ্নিশর্ম্মা!

চাপা গলায় চৌধুরীর উদ্দেশে নীলাদ্রি একটা কটু গালির ভাষা উচ্চারণ করিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া অনন্ত বলিল—আজ ছ'টায় আমার ইম্পর্টাণ্ট এনগেজমেণ্ট্। এক বন্ধুকে নিয়ে সিনেমায় যাবো। কথা একদম্ পাকা। দু' টাকা চার আনা খরচ করে' স'-ছটার শোয়ে দুখানি টিকিট কিনে এনেছি। সীট রিজার্ভ · ঐ নতুন বাঙলা ছবি বেরিয়েছে "মন্দোদরী" ···তা দ্যাখো একবার বিপদ!

অনন্ত আর-একটা নিশ্বাস ফেলিল।

নীলাদ্রি বলিল—টিকিট দুটো চেঞ্জ করিয়ে নিয়ো··· কালকের জন্য।

সখেদে অনন্ত বলিল—তা হবার নয়, বিশ্রী দেখাবে। বন্ধু মানে মহিলা-বন্ধু!

মহিলা-বন্ধু! আবার নাটকের ইঙ্গিত! নীলাদ্রির দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বিস্ফারিত চোখের সে দৃষ্টিতে একসঙ্গে এক হাজার প্রশ্ন ফুটিল।

নীলাদ্রি কহিল—মহিলা-বন্ধু! তার মানে?

অনন্ত কহিল—আমাদের পাড়ায় ছিলেন হরগোবিন্দ-বাবু। বাবার বন্ধু। তিনি মারা গেছেন। বাড়ীতে আছেন হরগোবিন্দবাবুর বিধবা স্ত্রী আর একটিমাত্র মেয়ে নন্দিনী। ···ও বাড়ীতে প্রায় আসি যাই কি না। ওঁদের সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গতা। নন্দিনী প্রায় বলে, একদিন সিনেমায় নিয়ে চলুন···। তাই আজ টিকিট কিনেছি। বলেছি, স' ছটার শোতে নিশ্চয়। এখন কি যে করি!

অনন্ত যেন অকূল পাথারে পড়িয়াছে! কূলের সন্ধানে যে-দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল—অনন্ত মনে মনে হাসিল; বলিল—তাঁকে একটা খপর দাও যে, sorry···আপিসে বড্ড কাজ পড়েছে।

অনন্ত কহিল—বিশ্বাস করবে না। ভাববে, পয়সা-খরচের ভয়ে পাশ কাটাচ্ছি।···নন্দিনীকে তো জানো না! সে ভারী স্পষ্ট কথা কয়···তার কথাগুলো হয় বেজায় কড়া! অর্থাৎ বুঝছো কি না, এই নন্দিনী হয়তো একদিন হবে আমার··

ইঙ্গিত বুঝিয়া নীলাদ্রি বলিল—বুঝেছি, তোমার জীবন-সঙ্গিনী! অর্থাৎ শুভবিবাহ!

—তাই!···

অনন্তর মাথায় চলিয়াছে তখন মহাযুদ্ধ! কামান দাগিতেছে ·বোমা ফাটিতেছে···শেল্ ছুটিতেছে! চোখের সামনে ধোঁয়ার রাশি কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে!

হঠাৎ একটা কথা মনে জাগিল।

অনন্ত কহিল—তুমি পারো এ বিপদে সাহায্য করতে। মানে, টিকিট দুখানা তোমায় দেবো। তুমি যদি ছুটির পরে নন্দিনীদের বাড়ীতে গিয়ে নন্দিনীকে নিয়ে সিনেমায় যাও! স'ছটার শো···আমি অবশ্য চিঠি লিখে দেবো··· তোমার পরিচয় দিয়ে···ব্যাপার বুঝিয়ে।

এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম।' 'আপনি বলুন আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী।' রমানন্দ স্বামী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন 'তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ, শাস্ত্র এখানে মূক।' মানুষের সংস্কৃতিও সাধনার শেষ প্রশ্নের উত্তর এই বই আর কি? গ্রন্থকার বলিলেন "যাও প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও যেখানে ইন্দ্রিয় জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও।" এইভাবে তিনি প্রশ্নটি চাপা দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের একটি পবিত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সমাজের কল্যাণ, ব্যক্তির কল্যাণ, হৃদয়ের প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন প্রভৃতি তাঁহার মনে প্রেমের কল্পনায় সাহায্য করেছিল—সেই উদ্দেশ্যে যে তিনি লিখেছিলেন তা' নয়। আর সর্বোপরি ছিল তাঁর দেশের সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর, সীমাহীন শ্রদ্ধা। যা আমাদের যুগযুগান্তব্যাপী সংস্কৃতির পরিপন্থী, তাকে প্রশ্রয় না দিয়েও তিনি প্রেমের নানা বিচিত্র কাহিনী শুনিয়ে বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাই ঠানদি দিদিমারা সুতোয় বাঁধা চশমা নাকের ডগায় নামিয়ে পুরাণ পাঠ ত্যাগ করে' তাঁর উপন্যাস পড়েছিলেন। তেমনটি আর কোনও লেখকের ভাগ্যে ঘটে নি।

বিরহ

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

নামিছে সন্ধ্যা ঝরিতেছে জল
ডাকে দে'য়া গুরু গুরু,
আকাশ-কন্যা কাঁদে অবিরল
শ্রাবণ হইল সুরু।
বিরহ ব্যাকুল সজল নয়ান
বাঁধন নাহি যে তার,
ঘনশ্যামরূপ মাতিয়া উঠিছে
নয়নসাগরপার।

গোপনে বালার হৃদয় বিদরি'
দলে গেছে কোন্ রাজ;
কোথায় কে যেন হারায়ে গিয়েছে
ধরিয়া মোহন সাজ।

আজিকে এমন ঘন বারি-পাতে
শীতল সন্ধ্যাকালে,
রাজার কুমার স্মরণে ভাসিয়া
লুকাল অন্তরালে।

মনে হয় তারে দেখেছে কোথায়,
ভুলেছে তাহার নাম;
নয়নে বাদল আজি তাই ঘন
বিরহের পরিণাম।
কে যেন তাহারে করেছে পাগল
এমনি নিবিড় দিনে;
আজি রে সকল অঙ্গ কাঁদিছে
তাহারি সঙ্গ বিনে।

এমনি বিশ্ব ঘনায়ে সেদিন
সেজেছিল দিক সীমা;
এমনি সুদূর নীলিম ধারায়
লভেছে তার মহিমা।

এ্যাণ্ড ফ্রেণ্ড্‌স্

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নূতন অফিস—বেঙ্গল-গ্লোরি ইনসিওরান্স অফিস।

বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। অনন্ত আসিয়া অবসন্ন-ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তার দু' চোখে হতাশার নিরুপায় দৃষ্টি!

পাশের চেয়ারে বসিয়া নীলাদ্রি খাতা দেখিয়া পলিশির কাজ লিখিতেছিল; অনন্তর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—হলো কি অনন্ত?

অনন্ত বলিল—হোপ্‌লেশ!···চৌধুরীর জুলুম।

চৌধুরী এ-অফিসের সেক্রেটারি।

অনন্তর কথায় নাটকের ইঙ্গিত! নীলাদ্রির কৌতূহল জাগিল। নীলাদ্রি কহিল—তার মানে?

অনন্ত বলিল—এক বছরের খাতা পেড়ে রাজ্যের ভাউচারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে আজকের মধ্যে—যত রাত্তিরই হোক্। কাল অডিটর আসবে।

নীলাদ্রি কহিল—কিন্তু ও তো মাণিকের কাজ।

অনন্ত বলিল—তা বললে কি হয়! মাণিক ওঁর বাড়ীতে বিনা-মাইনেয় টুইসনি করে। সন্ধ্যা ছটায় তাকে এ্যাটেণ্ডান্স দিতে হবে; না হলে গিন্নী হবেন অগ্নিশর্ম্মা!

চাপা গলায় চৌধুরীর উদ্দেশে নীলাদ্রি একটা কটু গালির ভাষা উচ্চারণ করিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া অনন্ত বলিল—আজ ছ'টায় আমার ইম্‌পর্টাণ্ট এনগেজমেণ্ট্। এক বন্ধুকে নিয়ে সিনেমায় যাবো। কথা একদম্ পাকা। দু' টাকা চার আনা খরচ করে' স'-ছটার শোয়ে দুখানি টিকিট কিনে এনেছি। সীট রিজার্ভ··ঐ নতুন বাঙলা ছবি বেরিয়েছে "মন্দোদরী" ···তা ত্যাখো একবার বিপদ!

অনন্ত আর-একটা নিশ্বাস ফেলিল।

নীলাদ্রি বলিল—টিকিট দুটো চেঞ্জ করিয়ে নিয়ো··· কালকের জন্য।

সখেদে অনন্ত বলিল—তা হবার নয়, বিশ্রী দেখাবে। বন্ধু মানে মহিলা-বন্ধু!

মহিলা-বন্ধু! আবার নাটকের ইঙ্গিত! নীলাদ্রির দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বিস্ফারিত চোখের সে দৃষ্টিতে একসঙ্গে এক হাজার প্রশ্ন ফুটিল।

নীলাদ্রি কহিল—মহিলা-বন্ধু! তার মানে?

অনন্ত কহিল—আমাদের পাড়ায় ছিলেন হরগোবিন্দ-বাবু। বাবার বন্ধু। তিনি মারা গেছেন। বাড়ীতে আছেন হরগোবিন্দবাবুর বিধবা স্ত্রী আর একটিমাত্র মেয়ে নন্দিনী। ···ও বাড়ীতে প্রায় আসি যাই কি না। ওঁদের সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গতা। নন্দিনী প্রায় বলে, একদিন সিনেমায় নিয়ে চলুন···। তাই আজ টিকিট কিনেছি। বলেছি, স' ছটার শোতে নিশ্চয়। এখন কি যে করি!

অনন্ত যেন অকূল পাথারে পড়িয়াছে! কূলের সন্ধানে যে-দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল—অনন্ত মনে মনে হাসিল; বলিল—তাঁকে একটা খপর দাও যে, sorry···আপিসে বড্ড কাজ পড়েছে।

অনন্ত কহিল—বিশ্বাস করবে না। ভাববে, পয়সা-খরচের ভয়ে পাশ কাটাচ্ছি।···নন্দিনীকে তো জানো না! সে ভারী স্পষ্ট কথা কয়···তার কথাগুলো হয় বেজায় কড়া! অর্থাৎ বুঝছো কি না, এই নন্দিনী হয়তো একদিন হবে আমার··

ইঙ্গিত বুঝিয়া নীলাদ্রি বলিল—বুঝেছি, তোমার জীবন-সঙ্গিনী! অর্থাৎ শুভবিবাহ!

—তাই!···

অনন্তর মাথায় চলিয়াছে তখন মহাযুদ্ধ! কামান দাগিতেছে··বোমা ফাটিতেছে···শেল্ ছুটিতেছে! চোখের সামনে ধোঁয়ার রাশি কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে!

হঠাৎ একটা কথা মনে জাগিল।

অনন্ত কহিল—তুমি পারো এ বিপদে সাহায্য করতে। মানে, টিকিট দুখানা তোমায় দেবো। তুমি যদি ছুটির পরে নন্দিনীদের বাড়ীতে গিয়ে নন্দিনীকে নিয়ে সিনেমায় যাও! স'ছটার শো···আমি অবশ্য চিঠি লিখে দেবো··· তোমার পরিচয় দিয়ে···ব্যাপার বুঝিয়ে।

নীলাদ্রির গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। সে যেন ঢুম্‌ করিয়া আকাশ হইতে পড়িয়াছে, এমনি ভাব!

নীলাদ্রি কহিল—তা কখনো হয়! হুঁ! আমাকে চেনেন না, জানেন না! ইয়ং লেডি! আমার সঙ্গে হঠাৎ···

অনন্ত কহিল—আঃ, বুঝচো না, নন্দিনী তেমন জড়ভরত মেয়ে নয় মোটে! খুব ফরোয়ার্ড, স্কটিশে ইণ্টার-মিডিয়েট পড়্‌চে···সেকেণ্ড ইয়ার। ট্রামে চড়ে' রোজ কলেজ যায়।···তাছাড়া ওদের বাড়ীতে সেকেলে মামুলি কুসংস্কারের নামগন্ধ নেই!···মানে, সে চায় সিনেমা দেখতে—তার মা চান্‌, একা না যায়—জানাশোনা একজন কম্‌পানিয়ন্‌ থাকবে সঙ্গে···তোমাকে তাঁরা চেনেন না, জানেন না, সত্যি! কিন্তু না চিনলেও তোমার নাম শুনেচেন আমার মুখে। তা থেকে জানেন, তুমি আমার বন্ধু! সুতরাং···

গর্ব্বে নীলাদ্রির বুকখানা ফুলিয়া উঠিল। এ যুগের মেয়েদের কাছে তার কথা তবে হয়!

তবু চট্‌ করিয়া সে বলিতে পারিল না, বেশ, আমি হইব কম্‌পানিয়ন! এ-কথা বলিতে গিয়া আরো এত কথা কণ্ঠে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল···

অনন্ত কহিল—তোমার অসুবিধা হবে?···আর কোথাও কোনো কাজ আছে?

নিশ্বাস ফেলিয়া নীলাদ্রি বলিল—না। তবে···

অনন্ত কহিল—তবে আবার কি! না, কোনো ওজর নয়, নীলাদ্রি।··তুমি জানো না, নন্দিনী কি রকম ফিল্ম-ম্যাড্‌। আশা করে' বেচারী বসে আছে···যদি যাওয়া বন্ধ হয়, তাহলে কিছুকাল আর ও বাড়ীতে আমার মাথা গলাবার উপায় থাকবে না।···লক্ষীটি, তোমাকে এ সাহায্যটুকু করতেই হবে।···ভয় নেই···বলেছি তো, নন্দিনী খুব ফরোয়ার্ড। কথায়-বার্ত্তায় তাকে মেয়ে বলে মোটে ফীল্‌ করবে না···পুরুষ-বন্ধু বলে' মনে হবে! তোমাকে মোটে সলজ্জ থাকতে হবে না।

তরুণ বয়সের প্রবল মোহ···

নীলাদ্রি কহিল—বেশ···তুমি চিঠি লিখে দাও···

অনন্তর চিঠি লইয়া নীলাদ্রি গিয়া দাঁড়াইল নন্দিনীদের গৃহে। বেশে-ভূষায় একটু পারিপাট্য করিয়া গিয়াছিল; —জামায় ও রুমালে একটু সেণ্ট্‌, সেই সঙ্গে পার্শ্বে দু'চারিটা বেশী টাকা। গল্প-উপন্যাস পড়িয়া এ সমাজের সম্বন্ধে যে-ধারণা সঞ্চয় করিয়াছিল, সে-ধারণাকে মনে-মনে বার বার আওড়াইয়া লইতে ভোলে নাই।

নন্দিনীদের গৃহে পৌঁছিয়া বুকখানা একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল—কি বলিয়া চিঠি দিবে এবং এ চিঠির উত্তরে কি কথা শুনিবে···

কিন্তু কোনো গোলযোগ ঘটিল না। নন্দিনী যে-রকম সহজে চিঠি এবং তাকে গ্রহণ করিল, তাহাতে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গল্প-উপন্যাসেও এমন হয় না।

অর্থাৎ গল্প-উপন্যাসে এমন অবস্থায় দু'চারিটা কথার হেঁয়ালিতে আদান-প্রদান চলে—সেই সঙ্গে নায়কের মনে দ্বিধা-সংশয়, নায়িকার মনে কৌতুক-বাসনা···এক্ষেত্রে তার কিছু ঘটিল না। চিঠি পাইবামাত্র পড়িয়া নন্দিনী তার মুখের পানে চাহিল···খুব সহজ দৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে বলিল—ও, আপনি তাঁর বন্ধু···নীলাদ্রিবাবু। তার পরেই তার সঙ্গে বাহির হইয়া সিনেমায় আসিল।

ট্রাম! নীলাদ্রি শুনিয়াছে অনন্তর মুখে, ট্রামে চড়িয়া নন্দিনী কলেজে যায়!

ছবি দেখিতে দেখিতে এত রকমের আলোচনা করিল যে সে হাওয়ায় মনের উপর হইতে সঙ্কোচের পাথর সরিয়া গেল—বাতাসে পাৎলা কাগজ যেমন উড়িয়া সরিয়া যায়, তেমনি ভাবে। নীলাদ্রির মনে হইল, নন্দিনীর সঙ্গে যেন তার কত কালের পরিচয়!

ইন্‌টারভালের সময় বেয়ারা আসিল একেবারে নন্দিনীর সামনে। তার হাতে ট্রে; ট্রেতে আইশক্রীম্‌। নন্দিনী লইল আইশক্রীম-পট্‌···নীলাদ্রিকেও একটা পট্‌ লইতে হইল; পার্শ খুলিয়া দাম দিল নীলাদ্রি দুটি পটের।

চকোলেট আসিল···সল্টেড্‌ বাদাম···আলোচনা করিতে করিতে নন্দিনী চকোলেট লইল, সল্টেড্‌ বাদাম লইল··· অত্যন্ত অবলীলায় সহজ ভঙ্গীতে। দেখিয়া নীলাদ্রি বুঝিল, এগুলা নন্দিনীর অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। সিনেমায় আসিয়া আইশক্রীম ও চকোলেট খাওয়া মজ্জাগত, কাজেই নিশ্বাস পড়িলেও নীলাদ্রি আবার দাম দিল নিজের পার্শ খুলিয়া। দাম দিবার এমন ভঙ্গী, সেও যেন দেখাইতে চায় সিনেমা দেখিতে আসিলে এ-সব কেনা নীলাদ্রির স্বভাব!

ছবি শেষ হইলে দুজনে বাহিরে আসিল।

প্রচণ্ড ভিড়। ট্রামে-বাসে তিল-ধারণের স্থান নাই।

নন্দিনী বলিল—ব্যস্‌ রে, কি ভিড়! ওঠবার জো নেই!

নীলাদ্রির বুকখানা ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল।···জো নাই, সত্য!

নন্দিনী বলিল—ভেতরে কি গরম। মাথা যা ধরেছে! আপনার মাথা ধরেনি নীলাদ্রিবাবু?

নীলাদ্রি কহিল—ধরেছে একটু! মানে, সব সিনেমা-হাউসে এয়ার-কুলিংয়ের বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

নন্দিনী কহিল—নিশ্চয়!··

ফিটন্‌, ট্যাক্সি সাম্‌নে হাঁকিতেছে—বাবু···

নীলাদ্রি চাহিল ট্যাক্সির পানে; তার পর নন্দিনীর পানে।

নন্দিনী বলিল—ট্যাক্সিতে অনেক পড়বে। না হলে··· যেতে আরাম ছিল!

এ-কথার পর টাকা-পয়সার হিসাব কষিতে মন মার-মূর্ত্তি ধারণ করে! মন বলিল, ভাবো একবার স্যর ওয়াল্‌টার র‍্যালের কথা ··

মনের সে ইঙ্গিতে উৎসাহিত নীলাদ্রি ডাকিল—ট্যাক্সি···

নন্দিনী বলিল—ট্যাক্সি ডাকছেন?

নীলাদ্রি বলিল—না হলে দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবেন কি? এই ভিড়ে?···ভালো দেখায় না!

ট্যাক্সিতে চড়িয়া বাড়ী। ভাড়া দিয়া নীলাদ্রি ভাবিল, এবারে সরিয়া পড়িবে।

নন্দিনী বলিল—এখনি চলে যাবেন? একটু বসবেন না? গল্পস্বল্প করতুম!

এ-নিমন্ত্রণ নীলাদ্রির ভালো লাগিল! জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা! যেন উপন্যাসের কল্পলোকের ফটক খুলিয়া গিয়াছে এবং সেই খোলা ফটক দিয়া সে প্রবেশ করিতেছে আলো-ছায়ায় মেশা কল্পলোকে!

অনন্তর কথা মনে পড়িল। অফিসে মোটা খাতার পাতায় মুখ গুঁজিয়া এখনো টাকা-আনা-পয়সার হিসাব মিলাইতেছে। বেচারী অনন্ত!

নন্দিনী ডাকিল—মা···

মা আসিলেন।

নন্দিনী বলিল—ইনি নীলাদ্রিবাবু···অনন্তবাবুর বন্ধু। দুজনে এক-অফিসে কাজ করেন। ভারী চমৎকার লোক ইনি। সিনেমায় আমাকে কি যত্নই করেছেন! আইশ-ক্রীম, চকোলেট্‌ খাওয়ানো! এক-শিশি সল্টেড্‌ বাদাম দেছেন।···তার পর ট্রামে-বাসে খুব ভিড় বলে' ট্যাক্সিতে করে নিয়ে এলেন! অনেক পয়সা খরচ করেছেন!

নীলাদ্রি ভাবিতেছিল অনন্তর কথা। সিনেমার টিকিট কিনিয়াছে অনন্ত···সিনেমার এ আয়োজন সব সে করিয়াছে, অথচ তার নাম নাই!

মা নীলাদ্রির পরিচয় চাহিলেন!

সখেদে নীলাদ্রি জানাইল, মাতামো ভারী কঞ্জুষ। অনেক টাকার মালিক। কাজেই নীলাদ্রিকে চাকরিতে ঢুকিতে হইয়াছে। তবে মাতামোর শরীর ভালো নয়। বয়স প্রায় সাতাশি·· ব্লড-প্রেশার। তিনি চক্ষু মুদিলে সকলকে নীলাদ্রি একবার দেখাইয়া দিবে, পয়সা কি করিয়া ইত্যাদি।

নন্দিনীও একাগ্র মনে এ কথা শুনিল।

এ-গল্প শুনিয়া মায়ের প্রাণ মমতায় গলিয়া গেল। মা বলিলেন—রাত দশটা বাজে বাবা—এইখানে দুটি খেয়ে যাও।

'বাবা' এ-কথায় না বলিতে পারিল না।

খাওয়া-দাওয়া চুকিতে রাত এগারোটা বাজিয়া গেল। নন্দিনী ইতিমধ্যে দুখানা গান শুনাইয়া দিল।

নীলাদ্রি বলিল, এমন গান সে জীবনে শোনে নাই!

সেই সঙ্গে আরো অনেক কথা বলিল। বলিল—রেডিয়োতে আপনি গান গান্‌ না কেন? গ্রামোফোনে রেকর্ড দিতে আপনার আপত্তি আছে?

নীলাদ্রি বলিল, রেডিয়োর দু'চার-জন মুরুব্বিকে সে জানে। নন্দিনীর যদি আপত্তি না থাকে, নীলাদ্রি তাহা হইলে রেডিয়োর আসরে মাসে দু' একটা প্রোগ্রামে নন্দিনীর গান গাহিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে।

এ-কথায় নন্দিনী মাতিয়া উঠিল। বলিল—বেশ, গাইবো—আপনি ব্যবস্থা করে' দিন। আধুনিক সঙ্গীত।

নীলাদ্রি কহিল—দেবো ব্যবস্থা করে’…

তার পর কথার শেষে একটু বিষ ঢালিয়া দিবার লোভ নীলাদ্রি সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল—অনন্তও তো তাদের জানে! কেন যে সে এ ব্যবস্থা করে নি এ্যাদ্দিন!

মা বলিলেন—তার কথা আর বলোনা বাবা! তার ঐ রকম…কোনো-কিছুতে আগ্রহ নেই!

তারপর বিদায়ের পালা…

উঠিতে-উঠিতে আরো দশ-পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল।

মা বলিলেন—মাঝে মাঝে এসো বাবা।

নন্দিনী বলিল—কালই আসবেন রেডিয়োয় আমার প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে’—নিশ্চয়! কেমন?

নীলাদ্রি বলিল—বেশ।

অনন্ত আসিয়া দেখা দিল। কহিল—সিনেমা দেখা হলো?

নীলাদ্রি কহিল—হ্যাঁ। তারপরে এই দ্যাখোনা কি যত্ন! না খাইয়ে কিছুতে ছাড়লেন না! সত্যি, আমার মা মারা গেছেন আজ সাত বছর…তারপরে এমন স্নেহ আর কোথাও পাইনি!

কথার শেষে কণ্ঠকে নীলাদ্রি বেশ জমাট এবং গাঢ় করিয়া তুলিল।…

অনন্ত যে-দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল, সে-দৃষ্টির কাঁটা লইয়া নীলাদ্রি সেখানে আর এক-মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না।

সে রাত্রে অনন্ত এখানে মোটে পাত্তা পাইল না। হাই তুলিয়া নন্দিনী বলিল—বড্ড tired…ঘুম যা পাচ্ছে, ওঃ!

তারপর হইতে নীলাদ্রি এ গৃহে নিত্য-অতিথি…অনন্তর সঙ্গে। গল্প যা জমে, তা নীলাদ্রিকে লইয়া।

মা প্রশ্ন করেন—দাদামশায় কেমন আছেন, বাবা?

নীলাদ্রি বলে—আর বলবেন না। কালই শরীর যা হয়েছিল…ভাবলুম, বুঝি-বা…

অনন্ত আসরে বসিয়া থাকে বেচারা বিমূঢ়ের মতো। নীলাদ্রির জন্য চা আসে। নীলাদ্রির জন্য গরম গরম নিম্‌কি আসে। প্রশংসায় নীলাদ্রি উচ্ছ্বসিত হয়, অনন্ত গুম্ হইয়া থাকে।

অনন্ত বুঝিল, এখানে তার আসন টলিয়াছে! তবু আসে, আসিয়া বসিয়া থাকে। মন এখনো বলে, ভাবিস কেন?

সেদিন নীলাদ্রি অফিসে আসিল না। চৌধুরীকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল—

কাল রাত্রে দাদামশায় মারা গিয়াছেন। ছুটি চাই।

সন্ধ্যার পরে অনন্ত আসিল নন্দিনীদের বাড়ী। সারাদিন অফিসের কাজে-অকাজে নীলাদ্রির মাতামহের আত্মার মুক্তি সে কামনা করিয়াছে।

আসিয়া দেখে, নীলাদ্রি খালি-পায়ে আগে আসিয়া আসর জমাইয়া বসিয়াছে।

নন্দিনী বলিল—নীলাদ্রি বাবুকে কন্‌গ্রাচুলেট্ করবো, না, কন্‌ডোলেন্স্ জানাবো, বুঝতে পারছি না! দাদামশায় মারা গিয়ে ওঁর লাভ হয়েছে দশ-হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ, আর কলকাতায় একখানি বাড়ী।

মা বলিলেন—অনন্তর জ্যাঠামশাই উইল করেছেন—তিনি মারা গেলে অনন্ত পাবে পাঁচ-হাজার টাকা। তা তাঁর যা শরীর অমন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার হিড়িক গেল, তবুও একটি দিনের জন্যে জ্বর কি মাথাব্যথা হয়নি তাঁর।

নীলাদ্রি বলিল—ও…মহেন্দ্রবাবু তো! হ্যাঁ, এখনো তিনি যেরকম শক্ত আছেন…অনন্তকে তাই আমরা বলি, তুমি ওঁর উইলের টাকা ভোগ করবে কি! উনিই তোমার উইলের টাকা ভোগ করবেন, দেখে নিয়ো!

দশ-বারো দিন পরের কথা। অনন্ত আসিয়া শুনিল, নীলাদ্রির সঙ্গে নন্দিনীর বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেছে; দু’মাস পরে বিবাহ।

মা বলিলেন, দাদামশায়ের শ্রাদ্ধ চুকিলে অন্তত একটা মাস কাটুক—নহিলে লোকে কি বলিবে!

রাগে অনন্তর গা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু রাগ করিয়া কি-বা করিবে? অভিমান? কার উপরে অভিমান?

রাগিয়া কাঁপিয়া অনন্ত চলিয়া গেল।

অফিসে নীলাদ্রির সঙ্গে অনন্ত কথা কয় না। নীলাদ্রি কথা কয়—অনন্ত কোনোমতে ‘হাঁ’ ‘হুঁ’ বলিয়া কোনো-মতে সারিয়া লয়। নীলাদ্রি হাসে; হাসিয়া অনন্তর

পাশের চেয়ারে বসিয়া রসিদের বই দেখিয়া পলিশির কাগজ লেখে।

হঠাৎ সেদিন অনন্তর বুকের উপর হইতে পাথর সরিয়া গেল অর্থাৎ তার জ্যাঠামশায় স্বর্গলাভ করিলেন।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া অনন্ত ছুটিল নন্দিনীদের গৃহে। নীলাদ্রি নাই। মা ও মেয়ে দুজনে কাঠ হইয়া বসিয়া আছে।

অনন্ত বলিল—জ্যাঠামশায় মারা গেছেন।

মা নিশ্বাস ফেলিলেন—বটে!…টাকাটা তাহলে পাবে এবার!

অনন্ত কহিল—হ্যাঁ। মানে, প্রোবেট নেওয়া হলেই! ভাবছি, ঐ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে একটা সিনেমার ছবি তুলবো। সিনেমার কারবারে অনেক লাভ।

মা বলিলেন—নীলাদ্রির টাকাকড়ি তো বিশ-বাঁও জলে! আমাদের উকিল সন্ধান নিয়েছে। উকিল বলছে, ওর মামামো বাড়ীখানি বন্ধক দিয়ে গেছেন—সুদে-আসলে তাদের পাওনা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ও বাড়ী রক্ষা করা যাবে না।

মা আবার নিশ্বাস ফেলিলেন। এবারের নিশ্বাস বেশ বড় রকম!

নন্দিনী ডাকিল—অনন্তবাবু…

অনন্ত চাহিল নন্দিনীর পানে।

নন্দিনী বলিল—নীলাদ্রিবাবুর দাদামশায় নাকি কোম্পানির কাগজ সব বেচে দিয়ে গেছেন?

মা বলিলেন—আমাদের উকিলের মুখে সব খবরই শুনলুম। নীলাদ্রিকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সে কোনো জবাব দ্যায়নি। তার পর কদিন আর এ-বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ায়নি।

নন্দিনী ফোঁশ করিয়া উঠিল; বলিল—আপনার বন্ধুর এটা কি রকম ভদ্রতা, বলতে পারেন?

মা বলিলেন—তোমার সঙ্গে বরাবর যেমন কথা আছে বাবা অনন্ত…এবারে ওদিককার ফাঁড়া যখন কাটলো, টাকা পাচ্ছো—তখন সংসার-ধর্ম্মে মন দাও।… নন্দিনীকে ডাগর বয়স অবধি এমনি রেখেছি, তার বিয়ে দিইনি সে শুধু তোমার জন্যে!…না হলে পাত্র কি মিলতো না? মিলতো।

অনন্ত মনে-মনে হাসিল।

ক’দিন পরের কথা।

দুই বন্ধুতে কথা হইতেছিল।

নীলাদ্রি বলিল—দাদামশায়ের টাকাটা উদ্ধার হয়েছে। কোম্পানির কাগজ বেচে তিনি কিনেছিলেন আদর্শ-খাবার কোম্পানির শেয়ার। শেয়ারের দাম কমে’ অর্দ্ধেকে দাঁড়িয়েছে। সে সব শেয়ার বেচে আজ নগদ টাকা পেয়েছি চার হাজার নশো বাহান্ন টাকা এগারো আনা পাঁচ পাই।

অনন্ত কহিল—জ্যাঠামশায়ের উইলের টাকাটা পাবো সামনের মাসে।

নীলাদ্রি বলিল—তোমার নন্দিনী দেবী কি বলেন?

অনন্ত কহিল—আমার নন্দিনী দেবী? না, তোমার?

নীলাদ্রি হাসিল, কহিল—বেশ, তিনি দুজনেরই, মানলুম। এখন বলো তাঁদের কথা…

অনন্ত কহিল—নন্দিনী কিছু বলে নি। তবে তার মা বলেছেন, আমার সঙ্গে যখন অনেকদিনের কথা, তখন নন্দিনীর ভার আমাকেই নিতে হবে। কিন্তু মাসখানেক সবুর।

নীলাদ্রি কহিল—নিশ্চয়। মানে, টাকাটা হাতে পাও কিনা, আগে ওঁরা দেখবেন।

অনন্ত কহিল—আমার মন খিচড়ে গেছে ভাই নীলাদ্রি। এ বয়সে যে-মেয়ে টাকাটাকেই এত বড় করে’ দেখতে শিখেছে…

নীলাদ্রি পাদপূরণ করিয়া বলিল—তাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করলে অঙ্গের সিকির-সিকিও বজায় রাখা যাবে না।… অর্থাৎ ওঁদের যে-পরিচয় পেয়েছি…

অনন্ত কহিল—আমারো ঐ কথা, নন্দিনীকে বিবাহ? নৈব নৈব চ!

টাকা মিলিয়াছে। আইন আদালতের দুই-চারিটা দ্বার পার হইয়া দুই বন্ধুর টাকা এখন তাদের হাতে আসিয়াছে।

নীলাদ্রি ডাকিল—অনন্ত…

অনন্ত কহিল—নীলাদ্রি…

নীলাদ্রি কহিল—চৌধুরী ব্যাটা থাকতে এ অফিসে উন্নতির কোনো আশা নেই। তাই আমি ভাবছি, তোমার টাকা থেকে দু’হাজার, আমার টাকা থেকে দু’হাজার—

এই চার হাজার টাকা নিয়ে এসো আমরা ব্যবসা খুলি। পার্টনারশিপ্!

অনন্ত কহিল—বললে বিশ্বাস করবে না ভাই, কাল সারা রাত ঘুমোতে পারিনি···বিছানায় পড়ে আমিও এই কথা ভেবেছি।

নীলাদ্রি বলিল,—তার উপর জানো তো, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী!

অনন্ত বলিল—আমারো ঠিক ঐ মত। তবে কিসের বাণিজ্য করবো···

নীলাদ্রি বলিল—শোনো, এ টাকাটা দেহ বা মাথা খাটিয়ে আমাদের রোজগার করতে হয়নি! এ টাকাটা দৈবেন দেয়ং। কাজেই বুঝছি, দৈব সহায় হবে। দশ-বারোটা ব্যবসার নাম লিখে লটারি করা যাক, যে-কারবারের নাম লটারিতে উঠবে, সেইটেই হবে আমাদের অবলম্বন!··· বুঝচো না, দৈব সহায় না হলে একসঙ্গে দুজনের ভাগ্যে এমন অঘটন ঘটবে কেন?

অনন্ত কহিল—তাই দৈবের উপরে নির্ভর করে' জ্যাঠামশায়ের নাড়ীটির দিকে আমি চেয়ে বসেছিলুম! দৈব সহায় না হলে এমন হয় না! দেখছো তো, কত শক্ত-শক্ত অসুখে জ্যাঠামশায় সেরে উঠেছেন আর এবারে একটি বেলার জ্বরেই কুপোকাৎ!···মানে, ডাক্তার ডাকবার সময় মিললো না!

নীলাদ্রি বলিল—কিন্তু এই ব্যবসাতে নামবার আগে একটা প্রতিশ্রুতি···

অনন্ত বলিল—যাকে বলে word of honour? বেশ, বলো···

নীলাদ্রি বলিল—বিবাহ আমরা করবো না কেউ! নন্দিনীকে নিয়ে এ যুগের মেয়েদের যে-পরিচয় পাওয়া গেছে, ভয় হয়···

অনন্ত কহিল—যা বলেছো! ভয় বলে' ভয়। শাড়ী দেখলে আমার গা ছম্‌ছম্ করে' ওঠে!

নীলাদ্রি বলিল—একালের মেয়েরা টাকা-পয়সাটাকে এত বেশী চিনেছে যে সে চেনার মধ্যে স্বামীকে চেনবার সুযোগ বা সময় তাদের নেই! ও-জাতকে বয়কট্ করা উচিত। বিবাহে নৈব নৈব চ।

অনন্ত কহিল—নন্দিনীর মা কাল নেমন্তন্ন করেছিলেন। রাত্রে ওখানে খাবার নেমন্তন্ন। বলেছিলেন, অনেকদিন দেখিনি বাবা···এসে এইখানে খেয়ো! আমি বলে পাঠিয়েছি, সময়াভাব!

নীলাদ্রি বলিল—পরশু রাত্রে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। আমি বলেছি, একটা ব্যবসার পত্তন করছি, সেজন্য নাবার-খাবার অবসর নেই!···কি বলো, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ?

—নিশ্চয়।

নীলাদ্রি কহিল—আমরা কেউ বিয়ে করবো না। এ প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে যে বিবাহ করবে, তাকে একহাজার টাকা খেশারত দিতে হবে···নগদ একহাজার টাকা।

অনন্ত কহিল—রাজী।

নীলাদ্রি কহিল—Come ··shake hands···

দুই বন্ধু হাতে হাত মিলাইল। দুজনে সমস্বরে কহিল—O. K.

ব্যবসা খোলা হইয়াছে। লটারিতে নাম উঠিয়াছে বস্ত্র। ফার্ম্মের নাম হইয়াছে 'এ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডস্'।

দুজনে এক মেশে থাকে। একসঙ্গে দোকানে আসে। দুপুরবেলায় একজন থাকে দোকানে, অপরজন মেশে যায় স্নানাহার করিতে। তারপর সে ফিরিলে এ যায় স্নানাহার করিতে। কাজে দুজনের নিষ্ঠা অসাধারণ।

ছ'মাস পরের কথা। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ছোট ঘর ছাড়িয়া বড় ঘর লওয়া হইয়াছে। দুজনে নাইবার-খাইবার অবসর পায় না।

বেলা প্রায় বারোটা। অনন্ত দোকানে আছে, নীলাদ্রি মেশে আসিয়াছে স্নানাহার করিতে।

একখানা চিঠি পাইল। বিবাহের নিমন্ত্রণ-চিঠি। নন্দিনীর বিবাহ।

আগামী শনিবার ১০ই আষাঢ় হাওড়া পঞ্চাননতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ শ্রীধর বাবাজীবনের সঙ্গে···

নীলাদ্রির মুখে অন্ন উঠিল না। কণ্ঠ কে যেন সবলে চাপিয়া ধরিয়াছে! মনে হইতেছিল, এ নিমন্ত্রণ করার অর্থ? নিশ্চয় ব্যঙ্গ···পরিহাস! অর্থাৎ ছাখো, তোমাদের অভাবে নন্দিনীর বিবাহ পড়িয়া রহিল না!

মাথার মধ্যে সুদর্শন-চক্র ঘুরিতে লাগিল!

নীলাদ্রি দোকানে আসিল। অনন্তকে এ-কথা বলিল না···বলিতে পারিল না।

তারপর অনন্ত আসিল বাসায় উদ্দেশ্য ঐ স্নানাহার। স্নান সারিয়া খাইতে বসিবে, নন্দিনীদের ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত। অনন্তর হাতে সে চিঠি দিল। নিমন্ত্রণের চিঠি। দিদিমণির বিবাহ···আগামী শনিবার ১০ই আষাঢ়।

ভৃত্য বলিল—নিশ্চয় যাওয়া চাই। মা আর দিদিমণি ···দুজনে অনেক করে' বলে' দেছেন।

রাগে অনন্ত জ্বলিয়া উঠিল। জ্বলিয়া যে-চোখে ভৃত্যের পানে চাহিল, সে-চোখ দেখিয়া ভৃত্যের মুখে আর দ্বিতীয়-বাক্য নিঃসারিত হইল না। সে সরিয়া পড়িল—

অনন্ত দোকানে ফিরিল। কাজে মন নাই। খরিদদারকে দেড়টাকা জোড়ার কাপড় দিয়া দাম বলিল সাত সিকা! মন কেমন ভারী-ভারী! নিশ্বাসের ভারে বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইবে, এমন!

সন্ধ্যার পরে দোকানে ভিড় একটু-কম।

নীলাদ্রি ডাকিল—অনন্ত···

নিশ্বাস ফেলিয়া অনন্ত বলিল—নীলাদ্রি···

নীলাদ্রি বলিল—তোমার নন্দিনীর যে বিয়ে হচ্ছে হে, আসছে শনিবারে। মানে, ১০ই আষাঢ়!

অনন্ত বলিল,—আবার ঐ কথা! আমার নন্দিনী? না, তোমার নন্দিনী!

নীলাদ্রি কহিল,—যারই হোক্, মানে, সেই নন্দিনীর বিয়ে···

অনন্ত কহিল,—জানি। নেমন্তন্নর চিঠি পেয়েছি।

নীলাদ্রি বলিল—আমিও পেয়েছি।···পেয়ে অবধি চিন্তা করছি। চিন্তায় কি স্থির করেছি, জানো?

সোৎসাহে অনন্ত কহিল—কি?

নীলাদ্রি বলিল—আমরা দুজনেও যদি ঐ ১০ই আষাঢ় তারিখে বিয়ে করতে পারি, তাহলেই এ নেমন্তন্নর রীতিমত জবাব দেওয়া হয়।

অনন্ত কহিল—আশ্চর্য্য! আমার মনের কথা তুমি জানলে কি করে?

নীলাদ্রি বলিল,—জানবো না! এ যে সাইকলোজি, ভাই···হিউম্যান্ সাইকলোজি!

অনন্ত কহিল—ঠিক!···কিন্তু আজ হলো সোমবার··· শনিবারের আর ক'দিন বা বাকী। এর মধ্যে মনের মতো দু'টি মেয়ে পাওয়া···

হাসিয়া নীলাদ্রি বলিল—কলকাতার সহরে···বলে, শীতকালে বোম্বাই আম পাওয়া যায়,—বোশেখ মাসে পাওয়া যায় দিব্যি ফুলকপি বাঁধাকপি! আর আমরা এ্যাণ্ড্ ফ্রেণ্ডস্···উঠ্‌তি বয়স, চল্‌তি ব্যবসা···আমরা মনের মতো দুটি মেয়ে পাবো না?

দ্বিধা-সংশয়-জড়িত স্বরে অনন্ত কহিল,—পাবো?

নীলাদ্রি বলিল,—আলবৎ পাবো।···এখনি আমি ডাকিয়ে পাঠাচ্ছি প্রজাপতি লিমিটেডের সেক্রেটারী বংশগোপালকে তার খাতাপত্র-সমেত। হুঁঃ, দুজনে যদি ঐ একই দিনে অর্থাৎ ১০ই আষাঢ় শনিবার সুতহিবুক-যোগে বিবাহ করি, তাহলে চুক্তি-মাফিক হাজার টাকা খেশারতীর দায় কারো থাকবে না···

অনন্ত কহিল—ঠিক বলেছো। তাহলে এখনি ডাকিয়ে পাঠাও তুমি তোমার ঐ প্রজাপতি লিমিটেডের বংশলোচনকে!···

নীলাদ্রি বলিল,—বংশলোচন নয়···গোপাল।···

অনন্ত বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বংশলোচন নয়, গোপাল। আগামী শনিবার ১০ই আষাঢ় মনের মতো দুটি মেয়ের সঙ্গে আমাদের বিবাহ হোক্! বিবাহ মানে, নন্দিনীর বিয়ের নেমন্তন্নর জবাব···মুখের মতো জবাব!

নীলাদ্রি বলিল,—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, অনন্ত! প্রজাপতি-লিমিটেডের শক্তি সামান্য নয়! দুটি কেন, চাও যদি চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে ওরা এক-ডজন মেয়ে এনে সামনে ধরে দিতে পারে···মনের মতন···কাকে রেখে কাকে ছেড়ে দেবে···ঠিক করতে পারবে না তুমি!

অনন্ত বলিল—না, এক-ডজন নয়···দুটির অর্ডার পাঠাও ···ঐ ১০ই আষাঢ় তারিখে দুজনে বিয়ে করে' ওদের এ নেমন্তন্নর মুখের মতো জবাব দি'···

নীলাদ্রি বলিল—যাকে বলে রীতিমত জবাব!

'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' সম্বন্ধে বক্তব্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে সার্ব্বভৌম উদ্ধার কাহিনীর আলোচনা করিতে দেখাইয়াছি যে, "চৈতন্যভাগবতে" বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত পরমবৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী কবি কর্ণপূরের বর্ণনানুসারে 'চরিতামৃত' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেব ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জিগীষামূলক বেদান্তবিচারের বর্ণন করিয়াছেন। এখন কবি কর্ণপূর উক্ত বিষয়ে কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন এবং কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সমস্ত কথাই যথাযথ গ্রহণ করিয়াছেন কি না, ইহাও দেখা আবশ্যক। তিনি কবি কর্ণপূরের কোন কথা গ্রহণ না করিলে কেন তাহা করেন নাই, ইহাও বুঝা আবশ্যক। আর কোন গ্রন্থের সর্ব্বাংশে প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে হইলে অন্যান্য কথারও বিচার করা আবশ্যক হয়। পরে তাহাও কিছু বলিব। এখন প্রথমে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে কবি কর্ণপূরের কথাই বক্তব্য।

কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন,—"প্রভোঃ সমীপে ধরণী সুরাগ্র্যো বভূব সংপাঠয়িতুং প্রবৃত্তঃ।" (মহাকাব্য—১২।২১), অর্থাৎ—ভূসুরশ্রেষ্ঠ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্য প্রভুর নিকটে নিজ শিষ্যদিগকে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবকেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই বেদান্ত পড়াইয়াছিলেন, ইহা কিন্তু কবিকর্ণপূরও বলেন নাই।

এখানে এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, ১২৯১ বঙ্গাব্দে কবিকর্ণপূরের উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক ও প্রকাশক বহরমপুর নিবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত শ্লোকের শেষে "বভূব সংপাঠয়িতুং প্রমত্তঃ" এইরূপ পাঠই মুদ্রিত করিয়া অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন,—"দ্বিজবর সার্ব্বভৌম এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার প্রভুর নিকট উন্মত্তের ন্যায় পাঠ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার প্রাপ্ত আদর্শ পুস্তকে উক্ত শ্লোকের শেষে "প্রমত্তঃ" এইরূপ পাঠ দেখিয়া উহাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। এ পর্য্যন্ত উক্ত পাঠের কোন প্রতিবাদের কথা শুনি নাই। কিন্তু "প্রমত্তঃ" এই পদের দ্বারা "উন্মত্তের ন্যায়" এইরূপ অর্থ কিরূপে বুঝা যায় এবং তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উন্মত্তের ন্যায় অধ্যাপনা কিরূপ, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। আর অনুবাদক বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত শ্লোকে "সংপাঠয়িতুং" এই একপদের দ্বারাই "পাঠ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন"—এইরূপ ব্যাখ্যা কেন করিয়াছেন, ইহাও বুঝা আবশ্যক। বস্তুতঃ ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, কবি কর্ণপূরের উক্ত শ্লোকের চতুর্থপাদে "বভূব সংপাঠয়িতুং প্রবৃত্তঃ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

কবি কর্ণপূর পরে শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি রূপে লিখিয়াছেন—

"কিমুচ্যতে কঃ খলু পূর্ব্বপক্ষঃ
কিম্বাস্য রাদ্ধান্তিতমাতনোযি।
বেদান্ত শাস্ত্রস্য নচায়মর্থ
তচ্ছ য়তাং যত্তু নিরূপয়ামঃ ॥ ২৩

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—'আপনি কি বলিতেছেন? পূর্ব্বপক্ষই বা কি? আর ইহার সিদ্ধান্তই বা কি করিতেছেন? বেদান্ত শাস্ত্রের ইহা অর্থ নহে, আমি যাহা নিরূপণ বা ব্যাখ্যা করিতেছি, তাহাই শ্রবণ করুন।'

কিন্তু 'চরিতামৃত' গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী ঐরূপ বর্ণন করেন নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অধ্যাপনাকালে তাঁহার নিকটে সহসা শ্রীচৈতন্যদেবের ঐরূপ প্রগল্‌ভতা বা সগর্ব্ব উক্তি তিনিও বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার মতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষার্থই

সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে শঙ্করভাষ্যানুসারে বেদান্তসূত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন সপ্তাহমধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব কোন কথা বলেন নাই। পরে অষ্টম দিনে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে তিনি অতি বিনীতভাবে তাঁহার বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করেন। তাই কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন—

"সাতদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভালমন্দ নাহি কহে বসিমাত্র শুনে ॥ ১১৫
অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥ ১১৬
ভালমন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ—ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ১১৭
প্রভু কহে—মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥ ১১৮
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি ॥ ১১৯
ভট্টাচার্য্য কহে না বুঝি হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার তরে সেই পুছে আরবার ॥ ১২০
তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি ॥ ১২১
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল ॥ ১২২

(মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পঃ)

পরে কবিরাজ গোস্বামী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে শ্রীচৈতন্যদেবের নিজ সম্মত বেদান্ত মত-ব্যাখ্যার বর্ণন করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেব যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের "বিতণ্ডা" ও "ছল" প্রভৃতির খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাও পরে বলিয়াছেন। কবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন ও নিজমত স্থাপনের কথা লিখিলেও তাহা ঐরূপ ব্যক্ত করিয়া বর্ণন করেন নাই। কিন্তু তিনিও পরে বলিয়াছেন,—

"অসৌ বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহার্থৈ
র্নিরস্ত ধীরপ্যথ পূর্ব্বপক্ষং।
চকার বিপ্রঃ প্রভুনা স চাশু
স্বসিদ্ধসিদ্ধান্তবতা নিরস্তঃ ॥ ২৬

বিমানবাবু তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"গ্রন্থে কবি কর্ণপূরের মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গের পূর্ব্বোক্ত কোন শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া কেবল শেষোক্ত "অসৌ বিতণ্ডা-ছল,"—ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তৎপূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—"বেদান্ত বিচারের কথা মহাকাব্যে আছে, নাটকে নাই। মহাকাব্যের নিম্নলিখিত শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনুবাদ করিয়াছেন। ...ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল। বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল" ইত্যাদি। (৩৬২-৬৩ পৃঃ)

কিন্তু কবি কর্ণপূরের উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়,—'অসৌ বিপ্রঃ (সার্ব্বভৌমঃ) বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহার্থৈঃ নিরস্ত-ধীরপি (নিরস্তবুদ্ধিরপি) অথ (অনন্তরং) পূর্ব্বপক্ষং চকার। সচ (পূর্ব্বপক্ষঃ) স্বসিদ্ধসিদ্ধান্তবতা প্রভুনা (শ্রীচৈতন্য দেবেন) আশু (শীঘ্রং) নিরস্তঃ। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, কবি কর্ণপূরের মতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই 'বিতণ্ডা'ও 'ছল' প্রভৃতির দ্বারা সার্ব্বভৌমকে নিরস্ত-বুদ্ধি করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক বিতণ্ডাদির দ্বারা নিরস্ত-বুদ্ধি হইয়াও পরে একটি পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সেই পূর্ব্বপক্ষেরও শীঘ্রই খণ্ডন করিয়াছিলেন। কিন্তু 'চরিতামৃতে' কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"এই মত কল্পনাভাষ্যে শতদোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল ॥১৬০
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল" ॥১৬১

কবিরাজ গোস্বামীর উক্ত বর্ণনার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যই শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে বিতণ্ডাদি করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেব সেই সমস্ত খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামী যে, কবিকর্ণপূরের পূর্ব্বোক্ত "অসৌ বিতণ্ডা" ইত্যাদি শ্লোকেরই অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। বিমানবাবু কিন্তু তাহাই বলিয়াছেন।

বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝিতে হইলে "বিতণ্ডা" কি, "ছল" কি এবং "নিগ্রহ" কি, ইহাও বুঝা আবশ্যক। বঙ্গভাষায় 'চরিতামৃতে'র ব্যাখ্যাকারগণ উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত পদার্থের

প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পরিশ্রম করেন নাই। কিন্তু ন্যায়-শাস্ত্রের কথা বলিয়া উপেক্ষা করিলে উক্ত স্থলে কবিরাজ গোস্বামীর কথার ব্যাখ্যা করা হয় না। আর কবিকর্ণপূর ও কবিরাজ গোস্বামীর ঐরূপ উক্তিভেদের কারণও বুঝা যায় না। পরন্তু "বিতণ্ডা" পদার্থে অজ্ঞতাবশতঃ অনেকদিন হইতে বঙ্গভাষায় কলহাদি নিন্দিত অর্থে "বিতণ্ডা" শব্দের অপপ্রয়োগ হইতেছে। এবং 'বাদবিতণ্ডা' ও 'বাগ্‌বিতণ্ডা' প্রভৃতি শব্দেরও প্রয়োগ হইতেছে। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী নিশ্চয়ই "বিতণ্ডা" শব্দের অপপ্রয়োগ করেন নাই। অতএব আবশ্যক বোধে এখানে সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত 'বিতণ্ডা' প্রভৃতির স্বরূপও বক্তব্য।

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, "তিস্রঃ খলু কথা ভবন্তি, বাদো জল্পো বিতণ্ডা চেতি।" অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর যথানিয়মে বাদ প্রতিবাদরূপ যে 'কথা', তাহা তিন প্রকার। (১) 'বাদ' (২) 'জল্প' ও (৩) 'বিতণ্ডা'। কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ জিগীষাশূন্য গুরুশিষ্য প্রভৃতির যে 'কথা', তাহার নাম "বাদ"। ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গোতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে উহা দশম পদার্থ এবং "জল্প" ও "বিতণ্ডা" একাদশ ও দ্বাদশ পদার্থ। গোতমোক্ত ঐ "বাদ" পদার্থকেই গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"বাদঃ প্রবদতা মহং" (গীতা—১০।৩২)। উক্ত 'বাদ' 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'র স্বরূপ ও ভেদ না বুঝিলে ভগবদ্‌গীতার ঐ কথাও বুঝা যায় না।

জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদী মধ্যস্থ সদস্যগণের নিকটে যথানিয়মে নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষখণ্ডনরূপ যে বিচার করেন, তাহার নাম "জল্প"। আর জিগীষু প্রতিবাদী নিজ পক্ষের স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষেরই খণ্ডন করিলে সেই বিচারের নাম 'বিতণ্ডা'। ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গোতম উহার লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন, "স প্রতিপক্ষস্থাপনা-হীনো বিতণ্ডা।" (১।২।৩) যিনি ঐরূপ 'বিতণ্ডা' করেন তাঁহার নাম 'বৈতণ্ডিক'। বাৎস্যায়ন পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"বিতণ্ডয়া প্রবর্ত্তমানো বৈতণ্ডিকঃ।"

কিন্তু বিচারস্থলে যিনি বাদী, তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না। কারণ, প্রথমেই কাহারই বিতণ্ডা করা সম্ভবই হয় না। প্রথমে কোন বাদী নিজ পক্ষ স্থাপন করিলেই পরে প্রতিবাদী তাহার খণ্ডন করিতে পারেন। অতএব শ্রীচৈতন্যদেব ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সেই বিচারে বাদী কে এবং প্রতিবাদী কে, ইহা বুঝা আবশ্যক। কবিকর্ণপূর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের পরেই সপ্তবিংশ শ্লোকের প্রথমে বলিয়াছেন,—"অদ্বৈতবাদী প্রথমঃ"। অর্থাৎ অদ্বৈত-বাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যই বাদী এবং শ্রীচৈতন্যদেব প্রতিবাদী। অতএব বিতণ্ডা করিতে হইলে প্রতিবাদী শ্রীচৈতন্যদেবই তাহা করিতে পারেন। তাই কবিকর্ণপূর পূর্ব্ব-শ্লোকে বলিয়াছেন,—"অসৌবিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদ্যৈর্নিরস্তধীঃ।" অর্থাৎ বাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রতিবাদী শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক 'বিতণ্ডা' 'ছল' ও 'নিগ্রহাদি'র দ্বারা নিরস্তবুদ্ধি হইয়াছিলেন।

ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রে মহর্ষি গোতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে চতুর্দ্দশ পদার্থের নাম 'ছল' এবং চরম ষোড়শ পদার্থের নাম 'নিগ্রহস্থান'।* বক্তার অভিপ্রেত শব্দার্থ বা বাক্যার্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পনার দ্বারা কোন দোষ প্রদর্শক যে অসদুত্তরবিশেষ, তাহাকে 'ছল' বলা হইয়াছে। গোতম মতে সেই ছল ত্রিবিধ। (১) 'বাক্ ছল', (২) 'সামান্য ছল' ও (৩) 'উপচার ছল'। প্রাচীন চরক মতে ছল দ্বিবিধ, "বাক্ ছল" ও "সামান্য ছল"। ("চরক সংহিতা"র বিমান স্থান অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

'বাক্ ছলে'র প্রসিদ্ধ উদাহরণ যথা,—কোন ব্যক্তি একখানা নূতন কম্বল পরিবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে দেখিয়া কোন বাদী বলিলেন, "নেপালা দাগতোঽয়ং নবকম্বলবত্ত্বাৎ।" অর্থাৎ এই ব্যক্তি নেপাল হইতে আসিয়াছে,—যেহেতু ইহাতে নবকম্বলবত্ত্ব আছে। উক্ত বাক্যে 'নবকম্বল' শব্দের দ্বারা নূতন কম্বল অর্থই বক্তার অভিপ্রেত। কিন্তু কোন প্রতিবাদী উক্ত 'নবকম্বল' শব্দের নবসংখ্যক কম্বল অর্থের কল্পনা করিয়া প্রতিবাদ করিলেন—

* কবিকর্ণপূরের উক্ত শ্লোকে ""ছল শব্দের পরে "নিগ্রহ" শব্দের দ্বারা গোতমোক্ত "নিগ্রহস্থান"ই বুঝিতে হইবে। পরে "আদ্য" শব্দের দ্বারা গোতমোক্ত পঞ্চদশ পদার্থ "জাতি" নামক অসদুত্তরবিশেষও তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'য় বাদী বা প্রতিবাদীর নিগ্রহের অর্থাৎ পরাজয়ের কারণবিশেষই 'নিগ্রহস্থান'। ন্যায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার "জাতি" ও দ্বাবিংশতি প্রকার 'নিগ্রহস্থান' বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

"একোঽস্য কম্বলঃ কুতো নবকম্বলাঃ।" অর্থাৎ এই ব্যক্তির নবসংখ্যক কম্বল না থাকায় ইহাতে নবকম্বলবত্ত্ব হেতু অসিদ্ধ। উক্তরূপ অসদুত্তরকে 'বাক্ ছল' বলে। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত প্রকার 'ছল'ই অসদুত্তর। কবিকর্ণপূরের উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব 'বিতণ্ডা' করিতে কোন সময়ে কোন প্রকার 'ছল'ও করিয়াছিলেন।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'য় প্রতিবাদী সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইলেই তখন তিনি পরাজয় ভয়ে অগত্যা উক্তরূপ 'ছল' নামক অসদুত্তরও করেন, ইহাই ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাই কবিরাজ গোস্বামী উক্ত বিচারে শ্রীচৈতন্য-দেবের সম্বন্ধে ঐরূপ কথা লিখিতে পারেন নাই, ইহা বুঝা আবশ্যক।

পরন্তু শ্রীচৈতন্যদেব নিজ পক্ষেরও সংস্থাপন করায় তাঁহার সেই বিচারকে "বিতণ্ডা" বলা যায় না। কারণ নিজপক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষের খণ্ডন করিলেই সেই বিচারকে "বিতণ্ডা" বলে। তাই কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন যে, প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেব নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যই তাঁহার পক্ষে অনেক দোষ প্রদর্শন করিয়া "বিতণ্ডা" করিয়াছিলেন এবং তিনিই তখন কোন সময়ে সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া পরাজয় ভয়ে কোন প্রকার 'ছল'ও করিয়াছিলেন। কিন্তু —"সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল।"

কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহানৈয়ায়িক হইয়াও মধ্যস্থব্যতিরেকে নিজগৃহে ঐরূপ অবৈধ "বিতণ্ডা" করিবেন কেন? পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদীর সম্মানিত উপযুক্ত মধ্যস্থ নিযুক্ত না হইলে পূর্ব্বোক্ত 'জল্প' ও "বিতণ্ডা" নামক বিচার হইতে পারে না,—ইহা ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সেই বিচারে কাহারা মধ্যস্থ ছিলেন, ইহা কবিকর্ণপূরও বলেন নাই।

পরন্তু কবিরাজ গোস্বামী উক্ত স্থলে শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিরূপে অতিরিক্ত যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন,—তাহাতেও অনেক প্রশ্ন হয়। সংক্ষেপে তাহাও কিছু এখানে বলিতেছি। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়?
॥ মধ্য ষষ্ঠ ১৪৩ ॥

কিন্তু অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যও ত ব্রহ্মকে নিঃশক্তি বলেন নাই। ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মের পরিপূর্ণ শক্তিই বলিয়াছেন।* তথাপি বহু-বিজ্ঞ কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পয়ারে "নিঃশক্তি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? "নিঃশক্তি" শব্দের অর্থ নির্গুণ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। আর তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামী উক্ত স্থলে 'নির্গুণ' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই কেন? পরন্তু শঙ্করের ব্যাখ্যাত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের খণ্ডনে তিনি অনেক প্রাচীন কথা বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে আদি লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনিও যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহা কিরূপ? সেখানে "নির্ব্বিশেষ" শব্দের অর্থ কি? তিনি সেখানে বলিয়াছেন—"নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয়॥

কবিরাজ গোস্বামী পরে বলিয়াছেন—

"ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥" ঐ ১৫৬

আদি-লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদেও তিনি বলিয়াছেন,—

"ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বিবাদ॥ ১১৪

কিন্তু বিবর্ত্তবাদী ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য কি বেদান্তসূত্রকার বেদব্যাসকেও ভ্রান্ত বলিতে পারেন? যাহা অসম্ভব, তাহা ত বলা যায় না। তবে কেন বহু-বিজ্ঞ কবিরাজ গোস্বামীও ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন? উক্ত স্থলে কোন ব্যাখ্যাকার অগত্যা কষ্ট কল্পনা করিয়া "ব্যাসসূত্রের পরিণামবাদমূলক অর্থ ভ্রান্ত," এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু কোন অর্থকে ভ্রান্ত বলা যায় না। এই অর্থ ভ্রান্ত বা ভুল,

* বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৪শ সূত্রভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"পরিপূর্ণশক্তিকস্তু ব্রহ্ম। ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ ভবতি, "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়াচেতি।" (শ্বেতাশ্বতর—৬।৮) তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাদ্ ক্ষীরাদিব বিচিত্র পরিণাম উপপদ্যতে।" পরেও (২।১।৩০ সূত্রভাষ্যে) বলিয়াছেন—"সর্ব্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতা ইত্যভ্যুপ গন্তব্যম্।" অন্যত্রও অনেকবার ঐরূপ কথা বলিয়াছেন।

এইরূপ কথা পূর্ব্বকালে পণ্ডিতগণ বলিতেন না। আর কবিরাজ গোস্বামীর তাহাই বিবক্ষিত হইলে তিনি "ব্যাস ভ্রান্ত" এইরূপ কথা লিখিবেন কেন?

বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্যও বেদান্তসূত্রকার বেদব্যাসকে অভ্রান্ত সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মান্য করিয়াই তাঁহার সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া তদ্দ্বারা 'বিবর্ত্তবাদের' ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে কল্পনা করিয়া উক্ত মত স্থাপন করিলে বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য করিবেন কেন? আর ঐ মত তাঁহার বুদ্ধি কল্পিত হইলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণও উহার খণ্ডন করিতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতানুসারে উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন কেন? শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ বহু বিচার দ্বারা নিজমত স্থাপন করিতে শ্রীভাষ্যের প্রথমে শঙ্করের মতের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত মতকেই মহা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন। পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও নিজ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতানুসারে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতেই সম্প্রদায়ভেদে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যাভেদ হইয়াছে। পরে শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত নৈয়ায়িক বৈদান্তিক অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি বেদান্ত-সূত্রের "সমঞ্জসা" নামে যে লঘুবৃত্তি রচনা করেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের মতানুসারে কোন কোন সূত্রের নূতন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। ঐ বৃত্তির প্রকাশ অত্যাবশ্যক। কিন্তু বিমানবাবুর প্রদত্ত বহু সংস্কৃত বৈষ্ণব-গ্রন্থতালিকায় ঐ গ্রন্থের নাম দেখিলাম না। *

পরন্তু কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিরূপে বলিয়াছেন,—

"বেদ না মানিঞা বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধেতে অধিক॥"

(মধ্য ষষ্ঠ ১৫২)

কিন্তু ইহাতেও প্রশ্ন হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেব কি সত্যই শঙ্করাচার্য্যকেও নাস্তিক বলিয়াছিলেন? ইহা কি সম্ভব? পাণিনির "অস্তি নাস্তি দিষ্টংমতিঃ"—এই সূত্রানুসারে "দিষ্টং পরলোকো নাস্তি ইতি মতির্যস্য" এই অর্থে "নাস্তিক" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং পরলোকের নাস্তিত্ববাদীই "নাস্তিক" শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ। আর মনু বলিয়াছেন, "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।" কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন অর্থেই শঙ্করাচার্য্যকে নাস্তিক বলাই যায় না। অতএব কবিরাজ গোস্বামীর "বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধেতে অধিক", এই কথার অর্থ কি?" *

অনেক দিন হইতেই "চরিতামৃতে"র উক্ত স্থলে কবি-রাজ গোস্বামীর ঐ সমস্ত কথায় ঐরূপ অনেক প্রশ্ন হইতেছে। অনেক জিজ্ঞাসু সজ্জন আমার নিকটেও ঐরূপ অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু "চরিতামৃতে"র স্বাধীন সমালোচনায় বহুলেখক বিমানবাবুও ঐ সমস্ত প্রশ্নের কোন অবতারণা করেন নাই।

(ক্রমশঃ)

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ঐ বৃত্তির পুথি দ্রষ্টব্য। উহার সংখ্যা—১৩৬৭। উহার শেষে শ্লোক দেখিয়াছি,—"কৃষ্ণ-প্রেম সুধাব্ধিমগ্নমনসো রূপস্বরূপাদয়ো জাতা যৎকৃপয়ৈব সম্প্রতি বয়ং সর্ব্বে কৃতার্থা যতঃ। এষা বৃত্তিরনন্যবৈষ্ণবমনোমোদায় সাধীয়সী, শ্রীচৈতন্যহরের্দ্দয়াময়তনোস্তস্যোপহারায়তাং।"

* কোন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ঐকথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ—বেদের আশ্রয় স্বীকার করিয়াও (বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও) যাহারা নাস্তিকবাদ প্রচার করে, তাহারা বৌদ্ধেতে অধিক—বৌদ্ধ অপেক্ষাও ঘৃণিত অংশ"। কিন্তু বৈষ্ণবগণ সকলেই জানেন,—"সতাং নিন্দা নাম্নঃ প্রথমমপরাধং বিতনুতে।". আচার্য্যগণের নিন্দাই প্রথম নামাপরাধ। আর যিনি প্রথমে সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন —"মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন,"—সেই 'তৃণাদপি সুনীচ' নাম-ধর্ম্ম প্রচারক লোকশিক্ষক ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব কি তখন শঙ্করাচার্য্যেরও ঐরূপ অনাবশ্যক নিন্দা করিতে পারেন? উক্তরূপ বর্ণনার দ্বারা তাঁহার সেই জগৎ-পূজ্য আদর্শ চরিত্রের খর্ব্বতারই প্রকাশ করা হয় নাকি?

ভঙ্গুর

'বনফুল'

৯

শিয়ালদহ অঞ্চলে গলির মধ্যে ছোট একটি বাসা। সেই বাসার ক্ষুদ্র একটি ঘরে মৃন্ময় মুখোপাধ্যায় ওরফে মোমবাতি নিবিষ্ট চিত্তে একখানি পত্র লিখিতেছিলেন। ঘরটিতে আসবাবপত্রের মধ্যে ছোট একখানি সেক্রেটেরিয়েট্ টেবিল, একটি দেওয়াল-ঘড়ি, একখানি চেয়ার এবং কাছেই একটি রিভলভিং বুক শেল্‌ফ্ রহিয়াছে। টেবিলের উপর একটি ইলেকট্রিক আলো। আলোর ডোমটি গাঢ় রক্তবর্ণ, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড রক্তজবা বাঁকা বৃন্তের উপর বিদ্যুৎতাড়িত হইয়া উঠিয়াছে। রঙীন চিঠির কাগজে গভীর মনোনিবেশ সহকারে মৃন্ময়বাবু যে পত্রখানি লিখিতে-ছিলেন তাহা এই:

প্রিয়তমাসু,

কাল নানা গোলমালের মধ্যে ছিলাম বলিয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই। লক্ষ্মীটি, তুমি রাগ করিও না। কাল এক জায়গায় কীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিতে শুনিতে এমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, শেষ পর্য্যন্ত আমি মূর্চ্ছা যাই। রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন বিরহ-কাহিনীর মধ্যে আমি তোমারই গভীর বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। আমার মনে হইতেছিল যেন কীর্ত্তনিয়ার কণ্ঠে রাধার জবানিতে তোমারই অন্তরের আকুলতা তুমি নিবেদন করিতেছ। সে নিবেদন এত করুণ, এত মর্ম্মস্পর্শী যে আমি নিজেকে ঠিক রাখিতে পারি নাই, জ্ঞান হারাইয়া-ছিলাম। জ্ঞান হইলে দেখিলাম ভণ্টু আমাকে শুশ্রূষা করিতেছে। সে-ই আমাকে গভীর রাত্রে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেইজন্য কাল আর আমি তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। কিন্তু সেই কীর্ত্তন শুনিবার পর হইতে অহরহ তুমি আমার মন জুড়িয়া বসিয়া আছ। তোমার অশ্রু ছলছল ডাগর চক্ষু দুইটি আমার মনের মধ্যে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কোথায় তুমি? বিশ্বাস কর, আমি তন্ন তন্ন করিয়া তোমাকে খুঁজিয়াছি। এখনও খুঁজিতেছি এবং চিরকাল খুঁজিব। তোমাকে খোঁজাই আমার জীবনের ব্রত। সেই জন্যই পুলিশ অফিসারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পুলিশে চাকুরি লইয়াছি—তোমাকে খুঁজিয়া আমি বাহির করিবই। ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য, পুলিশে চাকুরি করা অথবা পুনরায় বিবাহ করা উপলক্ষ মাত্র। এই কথাটি আমি প্রতিদিন লিখি, আজও আবার লিখিলাম। কারণ ইহাই আমার জীবনের মন্ত্র। মন্ত্রকে জাগ্রত রাখিতে হইলে প্রতিদিন তাহা জপ করিতে হয়। হাসিকে বিবাহ করিয়া তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছি তাহা সত্য, কিন্তু আমি নিরুপায়। তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি তাহাই আমাদের দেশে আমার মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানের পক্ষে এক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। পুলিশে চাকুরি লইলে ভাল করিয়া তোমার সন্ধান করিতে পারিব। কিন্তু পুলিশ অফিসারের জামাই হওয়া ছাড়া এ লাইনে ঢুকিবার অন্য কোন প্রকার উপায় বা যোগ্যতা আমার ছিল না। হাসি নির্দ্দোষ তাহা জানি, কিন্তু উপায় নাই। দেবীপূজায় চিরকাল নিরীহ জীবহত্যা হইয়া আসিতেছে—ইহা সনাতন নিয়ম। ইহা পরিবর্ত্তন করিবার সাধ্য আমার ছিল না। হাসিকে মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিয়াছি বটে কিন্তু অন্তরে স্থান দিতে পারি নাই। কারণ সেখানে তুমি বিরাজ করিতেছ। এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার অন্তর তুমি ত্যাগ কর নাই। হাসিকে স্থান দিব কোথায়? পাশের ঘরেই সে আমার অপেক্ষায় শুইয়া আছে। একটু পরেই আসিও তাহার পাশে গিয়া শয়ন করিব। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কিন্তু ঘুচিবে না। আমার এবং হাসির মধ্যে তুমি তোমার সমস্ত সত্তা লইয়া দাঁড়াইয়া আছ। তোমাকে অতিক্রম করে এমন সাধ্য হাসির নাই।

কিন্তু তুমি কোথায় আছ? এসো, আমার স্বপ্নের মধ্যে আজ। রোজই ত তোমায় স্বপ্নে দেখা দিতে বলি, কই আস না ত! আমার জাগ্রত লোকের প্রতি মুহূর্ত্তটি তুমি অধিকার করিয়া থাকো, স্বপ্নলোকে তোমায় তেমনভাবে

পাই না কেন? ঘুমের ঘোরে তোমাকে যেন হারাইয়া ফেলি। তাই মনে হয়, জাগিয়া বসিয়া থাকি। জাগিয়া বসিয়া তোমার কথা চিন্তা করি। আমার মনের আকুলতা লিখিয়া বোঝান অসম্ভব। তবু রোজ লিখি, না লিখিয়া পারি না। আজ স্বপ্নে নিশ্চয় দেখা দিও। তোমার জন্ম তৃষিত হইয়া আছি। কবে তুমি আসিবে? ইতি—

তোমারই

মৃন্ময়

পত্রখানি শেষ হইলে মৃন্ময়বাবু একটি রঙীন খাম বাহির করিয়া পত্রখানি তাহার মধ্যে পুরিলেন এবং সেটি শিল করিয়া তাহার উপর লিখিলেন—শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী। তাহার পর টেবিলের দেরাজ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি চন্দন কাঠের বাক্স বাহির করিলেন এবং সেই বাক্সের মধ্যে পত্রখানি রাখিয়া দিলেন। বাক্সে অনুরূপ আরও অনেক পত্র ছিল। চন্দনের বাক্সটি দেরাজে পুনরায় বন্ধ করিয়া রাখিয়া মৃন্ময়বাবু উঠিয়া পড়িলেন। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল। মৃন্ময়বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার ঘড়িটার পানে চাহিলেন ও তৎপরে টেবিল ল্যাম্পটি নিভাইয়া দিয়া ধীরপদসঞ্চারে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন হাসি ঘুমাইতেছে। নিরীহ কিশোরী মূর্ত্তি। বয়স বড় জোর চৌদ্দ কি পনর। পরনে একখানি রাঙা ডুরে শাড়ি। সুডোল হাতে সোনার চুড়ি। পাড় বসানো গোলাপী রঙের একখানি র‍্যাপার গায়ের উপর পড়িয়া আছে। নির্ণিমেষ নেত্রে মৃন্ময় কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে ডাকিলেন।

হাসি, ওঠ, চল এবার খাওয়া দাওয়া করা যাক্—

হাসি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল ও চক্ষু দুইটি কচলাইতে কচলাইতে বলিল, ওই দেখ, হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া বলিল, চল, নেচি কেটেই রেখেছি, শেকে দিতে আর কতক্ষণ যাবে? গরম গরম শেকে দিই গে চল। অনেক রাত হয়ে গেছে, নয়? কি করছিলে এতক্ষণ বাইরের ঘরে বসে?

মৃন্ময় অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, আপিসের কাজকর্ম্ম করছিলাম।

হাসি হাসিয়া বলিল, আর আমি শুয়ে কেমন ঘুমুচ্ছিলুম! সত্যি ভারি স্বার্থপর আমরা, তোমরা মুখে রক্ত উঠিয়ে রোজগার করে আনবে আর আমরা দিব্যি মজা করে তা খরচ করব। তুমি বেচারি ওঘরে খেটে মরছ আর আমি কেমন আরাম করে ঘুমুচ্চি! মুখে আগুন আমাদের—

ম্লান হাসি হাসিয়া মৃন্ময় বলিলেন, উপায় কি।

হাসি গা ভাঙিয়া সহাস্য মুখে বলিল, সত্যি, আমারও না ঘুমিয়ে উপায় নেই! বাপ মা বাঙলা লেখাপড়াটা পর্য্যন্ত শেখায় নি যে বইটই পড়ে সময় কাটাই! নিজের বাপ মাই মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় বড়, আমার এত পাতান বাপ মা—বলিয়া হাসি কাপড়টাকে বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া বলিল, উঃ, শীত করছে, র‍্যাপার জড়িয়ে রান্নাবান্না করা যে কি মুস্কিল, তোমাকে ত বলে বলে হার মানলাম, সোয়েটার একটা তুমি কিনে দিলে না! চল, উনুন ধারে যাই, বড্ড শীত করছে—

রোজই ভুলে যাই, কাল কিনে আনব ঠিক!

নিজের বাপ মা থাকলে শীতের তত্ত্ব করত, পাতানো বাপ মা কি-না তাই ওসব বাজে খরচের দিকে যেতে চায় না!

হাসি বড় পুলিশ অফিসারের কন্যা বটে, কিন্তু পালিতা কন্যা। আসলে ভদ্রলোক হাসির দূর সম্পর্কের পিসামহাশয়। অসহায়া পিতৃমাতৃহীনা বালিকাটিকে মানুষ করিয়াছিলেন এবং চাকুরির প্রলোভন দেখাইয়া মৃন্ময়ের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন।

মৃন্ময়ের পূর্ব্বপত্নী যে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন কিন্তু হাসিকে সেকথা ঘুণাক্ষরে জানান নাই। মৃন্ময় প্রশ্ন করিলেন, চিনু খেয়েছে?

কোন্ সকালে খেয়ে নিয়েছে ঠাকুরপো নটা বাজতে না বাজতেই! কলেজে সমস্ত দিন থাকে, ছেলেমানুষ ত, খিদে পেয়ে যায়! চল, উনুনও বোধ হয় এতক্ষণ নিবে ধুস হয়েছে! মৃন্ময়ের ভাই চিন্ময় মফঃস্বল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আসিয়া এই বছর কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। উপরের ঘরখানায় সে থাকে। সেইটিই তাহার পড়িবার ও শুইবার ঘর। হাসি ও মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সামান্য একফালি উঠানের পরই

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহ

সাগর কূলে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

রান্নাঘর। রান্নাঘরে ঢুকিয়াই হাসি বলিল, যা ভেবেছি তাই, এতক্ষণ কি আর আঁচ থাকে? আঁচের আর অপরাধ কি! স্টোভটা জ্বালি, থাম।

হাসি স্টোভ বাহির করিয়া জ্বালিতে বসিল এবং স্পিরিট ঢালিতে ঢালিতে বলিল, স্টোভে আবার রুটি ভাল হয় না।

মৃণ্ময় নিকটস্থ একটি বালতি হইতে জল লইয়া হাতমুখ ধুইতে লাগিলেন, এ মন্তব্যের কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিল। তাহার পর হাসি জ্বলন্ত স্পিরিটের দিকে চাহিয়া মৃণ্ময়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, হ্যাঁগা, একটা কথা রাখবে আমার?

কি কথা?

পরেশবাবুদের বাড়িতে এমন সুন্দর সুন্দর বেরালছানা হয়েছে! তুমি যদি বল—নিয়ে আসি একটা চেয়ে!

বেশ ত! এনো।

একটা ধপধপে সাদা বাচ্চা—এমন মিষ্টি হয়েছে দেখতে যে কি বলব!

তাই নাকি?

স্টোভটায় পাম্প করিতে করিতে মহা উৎসাহে হাসি বলিল, দেখবে? নিয়ে আসব এখন? এই ত পাশের বাড়ি, ওরা ঠিক জেগে আছে এখনও—

এখন থাক, কাল এনো।

মায়ের ল্যাজে ছোট্ট ছোট্ট থাবা মেরে মেরে এমন সুন্দর খেলা করছিল আজ দুপুরে, সে যদি দেখতে! কি দুষ্টু দুষ্টু চোখ!

হঠাৎ দুয়ারে কড়া নড়িল। এতরাত্রে কে আবার আসিল!

কে?

মৃণ্ময় বাহির হইয়া গেলেন। কপাট খুলিতেই বড় বড় চুল গোঁফ দাড়িওয়ালা একজন ভদ্রলোক সহাস্যমুখে বলিলেন, মৃণ্ময় নাকি, ভাল আছ ত সব?

কে, মুকুজ্যে মশাই, আসুন, আসুন—এত রাত্রে হঠাৎ কোথা থেকে?

মুস্কিলে পড়ে এসেছি, চল ভেতরে, সব বলছি।

মৃণ্ময়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুকুজ্যে মশাই আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন।

হাসি একমুখ হাসি লইয়া বলিল, ওমা, আপনি!

তাড়াতাড়ি আসিয়া সে মুকুজ্যে মশায়ের পদধূলি লইল—তাহার দেখাদেখি মৃণ্ময়ও প্রণাম করিলেন। মুকুজ্যে মশাই উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া হাস্যস্নিগ্ধমুখে হাসির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ভাল আছিস ত পাগলি!

ভুলেও ত খোঁজ নেন না একবার! আজ যে কি ভাগ্যি এলেন!

হাসি অভিমান ভরে ঠোঁট দুইটি ফুলাইল। মুকুজ্যে মশাই একটু হাসিয়া বলিলেন, স্বামীর কাছে আছিস্—এখন আর খোঁজ নেবার দরকার নেই ত!

দরকার না থাকলে বুঝি আসতে নেই!

মুকুজ্যে মশাই সস্মিত মুখে চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। মুকুজ্যে মশাইকে দেখিলেই আপনার জন বলিয়া মনে হয়। যদিও মুখময় কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি, মাথায় তৈলবিহীন চুল—কিন্তু এমন একটি স্নিগ্ধ হাস্য-শ্রী তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলকে ও আয়ত রক্তাভ চক্ষু দুইটিকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে যে, দেখিবামাত্রই ভিতরকার স্নেহময় মানুষটিকে চিনিতে বিলম্ব হয় না।

হাসি বলিল, কোথায় এসে উঠেছেন আপনি? আজ আপনাকে ছাড়ছি না, এখানে খেয়ে যেতে হবে।

মৃণ্ময়ও বলিলেন, আপনি কোলকাতায় কবে এসেছেন? কিচ্ছু জানি না ত!

হাসি বলিল, ওঁর ওই রকমই কাণ্ড।

মুকুজ্যে মশাই আর একটু হাসিয়া বলিলেন, এসেছি তিন-চার দিন হ'ল। শিরিষের ছেলের অসুখের খবর পেয়ে এসেছিলাম। ছেলেটি এই কিছুক্ষণ হ'ল মারা গেছে। শিরিষ বেচারা পড়েছে মুস্কিলে। তাকে ত এখানে এখনও বিশেষ কেউ চেনে না, সে এই অল্প ক'দিন হ'ল এখানে বদলি হয়ে এসেছে। সৎকার করবার লোক জুটছে না, তাই আমাকে বেরুতে হ'ল। তোমাদের দু'ভায়ের মধ্যে একজনকে যেতে হয়। একজন বাড়িতে থাকো, পাগলিটা আবার না হ'লে ভয় পাবে। চিনি ত ওকে, ভয়ানক ভীতু—

বলিয়া মুকুজ্যে মশাই হাসির দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

হাসি এতক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে এই মৃত্যু-সংবাদ শুনিতেছিল। হঠাৎ ভীতু অপবাদে মুকুজ্যে মশায়ের দিকে চোখ তুলিয়া একটু হাসিল এবং বলিল, এক্ষুণি যেতে হবে? তা হ'লে রুটি কটা তাড়াতাড়ি তৈরি করে দি!

তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়নি বুঝি এখনও ?

ঠাকুরপোর খাওয়া হয়ে গেছে, উনি এতক্ষণ কাজ করছিলেন !

মুকুজ্যে মশাই বলিলেন, চিনুই চলুক। একজন হ'লেই হবে। তিনজন পেয়েছি, তাছাড়া আমি আছি, পাড়া থেকেও দু-একজন হয় ত জুটতে পারে—

মৃণ্ময় বলিলেন, আপনি যাবেন ? যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় আপনার ?

মৃণ্ময়ের চিন্তার কারণ ছিল। মুকুজ্যে মশায়ের অঙ্গে একটি সুতির বোম্বাই চাদর ভিন্ন আর কোন আবরণ ছিল না। খালি পা। চিরকালই তাঁহার এই বেশ। মৃণ্ময়ের কথা শুনিয়া মুকুজ্যে মশায়ের বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমার ? আমার কিচ্ছু হবে না !

হাসি পাকা গিন্নির মত পুনরায় মন্তব্য করিল—ওঁর ওই রকমই কাণ্ড !

মৃণ্ময় বলিলেন, তার চেয়ে বরং আপনি হাসিকে আগলান, ঠিকানাটা বলে দিন, আমি আর চিনু যাই—

না, না—সেটা ঠিক হয় না। চিনুকে ডাকো তুমি, আমি না গেলে ভাল দেখায় না।

অগত্যা চিনুকে ডাকিতে হইল। ডাকাডাকিতে চিনু উপরের ঘর হইতে নামিয়া আসিল। সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে মিটি মিটি মুকুজ্যে মশায়ের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিবামাত্র সহাস্য মুখে আসিয়া পদধূলি লইল। এই বাড়িতে হাসি ছাড়া চিনুও মুকুজ্যে মশায়ের অতিশয় প্রিয়। চিন্ময়ের চেহারা মৃণ্ময়েরই অনুরূপ, কেবল তাহার বয়স কম ও মাথার চুল কটা নয়, কালো। সমস্ত শুনিয়া চিন্ময় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মুকুজ্যে মশায়ের সাহচর্যে এই শীতের রাত্রে মড়া পোড়াইতে যাইতে হইবে ! সে যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া নিজের র‍্যাপারখানা লইয়া আসিল।

চিন্ময়কে লইয়া মুকুজ্যে মশাই চলিয়া গেলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে হাসি মৃণ্ময়কে বলিল, ওগো, তুমি আর একটু সরে এসো, আমার ভারি ভয় করছে।

মৃণ্ময় চোখ তুলিয়া একটু হাসিল।

না, তুমি সরে এসো লক্ষ্মীটি, মড়ার কথা শুনলে আমার বড্ড ভয় করে !

আর একটু হাসিয়া মৃণ্ময় হাসির নিকটে গিয়া বসিলেন। হাসি রুটি শেকিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

১০

নির্জ্জন দ্বিপ্রহর।

নিজের শয়নকক্ষে ঘন নীল রঙের একটি সুন্দর আলোয়ানে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া একটি গদি-আঁটা আরাম চেয়ারে বসিয়া মিষ্টিদিদি একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। বাড়ীতে কেহ নাই। সোনা তাহার এক বান্ধবীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। রিণি ও প্রফেসার মিত্র কলেজে। মিষ্টিদিদি তন্ময় চিত্তে উপন্যাসখানি পাঠ করিতেছিলেন, গ্রাস করিতেছিলেন, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিছনের জানালা দিয়া একফালি রোদ তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ও বামগণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছে। বাম কর্ণের সোনার দুলটা রৌদ্রকিরণে চকমক করিতেছে। মিষ্টিদিদির চক্ষু দুইটিও চকমক করিতেছে, অধর মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত। উপন্যাসে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল যাহা মুখরোচক এবং উত্তেজনাপূর্ণ। মিষ্টিদিদির নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ একটা শব্দে মিষ্টিদিদি ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন। বাতায়ন-পথে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল ছাতের ওধারে আলিসার উপর একজোড়া পারাবত আসিয়া বসিয়াছে। পুরুষ পারাবতটি গলা ফুলাইয়া ফুলাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্‌বকম ধ্বনিতে প্রণয় নিবেদন করিতেছে। তাহার স্ফীয়মান কণ্ঠদেশে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া ময়ূর কণ্ঠের শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রতি গ্রীবাভঙ্গীতে ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য্য ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মিষ্টিদিদি আবার পুস্তকে মন দিলেন।

এমন সময় নীচে ফোন বাজিয়া উঠিল। 'বয়' আসিয়া খবর দিল যে সাহেব তাঁহাকে ফোনে ডাকিতেছেন। মিষ্টিদিদি নামিয়া গিয়া ফোন ধরিলেন। মিত্র সাহেব ফোনে তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার ফিরিতে অনেক রাত হইবে। বৈকালেও তিনি আসিতে পারিবেন না, কলেজে একটা মিটিং আছে এবং তৎপরে তাঁহাকে এক বন্ধুর বাড়িতে

ডিনার খাইতে যাইতে হইবে। মিষ্টিদিদি ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন পারাবত দম্পতী উড়িয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে ঘরের কোণে তেপায়াতে রক্ষিত ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটি সবল নগ্ন পুরুষ একটা বিরাটকায় অজগরকে বিধ্বস্ত করিতেছে। তাহার শরীরের সমস্ত পেশী শক্তির উন্মাদনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মিষ্টিদিদি কিছুক্ষণ প্রতিমূর্ত্তিটির পানে তাকাইয়া উঠিয়া বিছানায় গেলেন ও সবলে পাশ বালিশটাকে আঁকড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি বালিশে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

১১

শঙ্কর সুরমার পত্রখানি আবার পড়িতেছিল। এখানি সুরমার দ্বিতীয় পত্র। প্রথম পত্রের উত্তর না পাইয়া আর একখানি পত্র লিখিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে জিনিসটা একটু অস্বাভাবিক, সাধারণত এ রকম হয় না। কিন্তু অসাধারণ ব্যাপারও পৃথিবীতে অসম্ভব নহে। সুরমাও সাধারণ শ্রেণীভুক্তা নহেন। সুতরাং সুরমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন একটু-আধটু খটকাজনক ঘটনা ঘটিবেই। সাহিত্য-প্রীতিরূপ দুষ্টব্যাধি যাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে তাঁহার চালচলন আচার-ব্যবহার সাধারণ আইন-কানুন মানিয়া চলিবে না ইহাই স্বাভাবিক—তা তিনি নারীই হউন আর পুরুষই হউন।

শঙ্করের দ্বিপ্রহরে দুই পিরিয়ড্ ছুটি আছে, কলেজ-স্কোয়ারের নির্জ্জন কোণটুকুও ভারি সুন্দর লাগিতেছে। সুরমার পত্রখানি ইতিপূর্ব্বে সে বহুবার পড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে। সুরমা যাহা লিখিয়াছে তাহার অর্থবোধ করা খুব কঠিন নহে। কিন্তু শঙ্করের মনে হইতেছে পত্রখানিতে অর্থাতীত এমন কিছু আছে যাহা একবার দুইবার পড়িয়াই নিঃশেষ করিয়া ফেলা যায় না, বারম্বার পড়িতে হয়। একস্থানে সুরমা লিখিয়াছে—

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কত অল্প, অথচ আপনার চিঠি না পেয়ে এত খারাপ লাগছে ! এর থেকে কি প্রমাণ হয় বলুন ত। হয় ত কিছুই প্রমাণ হয় না, কিম্বা হয় ত এর থেকেই কোন নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদ মস্ত বড় কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন। সে যাই হোক, একথা কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই যে আপনার চিঠি না পেয়ে ভারি খারাপ লাগছে। আপনার সঙ্গে আত্মীয়তাটা অবশ্য তত ঘনিষ্ঠ নয় যে অভিমান আবদার করা চলে, তাই আপনাকে শুধু অনুরোধ করছি চিঠির উত্তর দেবেন এবার নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ অবশ্য স্বল্প। কিন্তু স্বল্প পরিচয়েই আপনার বিশিষ্ট রূপটি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে যেন। আজকালকার দিনে বেশ তাজা জীবন্ত মানুষ কমই চোখে পড়ে। জীবন্ত মানুষ মানে বাঘ ভালুকের মত বন্য পশু নয়, জীবন্ত মানুষ মানে যে মানুষ সভ্যতার অতিবর্ষণে গলিত হয়ে যায় নি, সভ্যতার রসে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রশংসা করছি বলে যেন অহঙ্কারে ফুলে উঠবেন না। আপনার সম্বন্ধে সত্যি যা মনে হয়েছে তাই লিখলাম। আপনাকে আর একটা কথা বলব ? রাখবেন কথাটা ? আপনার যে কবিতাগুলো দেখিয়েছিলেন সেগুলো ছাপিয়ে ফেলুন। সত্যিই ওগুলো ছাপাবার যোগ্য। আমাকে দিন বরং আমি ছাপিয়ে দিই। এমন সুন্দর করে ছাপিয়ে দেব, দেখবেন তখন। আর নতুন কিছু লিখেছেন না কি ? লিখলে আমাকে পাঠাতে হবে কিন্তু। আপনি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মনে আছে ত ? কবিতা লিখে আগে আমাকে দেখাতে হবে। আমাকে প্রথমে দেখিয়ে তবে অপরকে দেখাতে পারবেন। আমি হতে চাই আপনার কবিতার প্রথম পাঠিকা। কাল এখানে সমুদ্রের ধারে বসে বসে আপনার "কল-কল্লোল" কবিতাটার লাইনগুলো মনে পড়ছিল। কবিতাটা টুকে পাঠিয়ে দেবেন ? সত্যি বলছি ভারি সুন্দর কবিতাটি।

এই কথাগুলি বারম্বার পড়িয়াও শঙ্করের তৃপ্তি হইতেছিল না। কয়েকবার পড়িয়া শঙ্কর পত্রখানি পকেটে রাখিয়া দিল ও স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, গতকল্য যে চিঠিখানা সে সুরমাকে লিখিয়াছে তাহাতে ও কথাটা সে না লিখিলেই পারিত। নানা কাজের ভিড়ে সুরমার কথা সে বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সেই জন্য পত্র দিতে পারে নাই এই সত্যভাষণটুকু সে না করিলেই পারিত। আর তা ছাড়া সত্যই ত সে বিস্মৃত হয় নাই। সে সুরমাকে পত্র লেখে নাই সঙ্কোচভরে, পাছে কেহ কিছু মনে করে। সহজ সত্য কথাটা লিখিলেই

চুকিয়া যাইত। অনর্থক একজন ভদ্রমহিলার মনে আঘাত দেওয়াটা ঠিক হয় নাই। কি করিয়া পরবর্ত্তী পত্রে এই গ্লানিটুকু মুছিয়া ফেলা যায় সে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িল ওধারের গেট দিয়া রিণি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে আর একটি তরুণী। তাহারা কাছাকাছি আসিতেই শঙ্কর নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশ্ন করিল, কোথায় চলেছেন?

রিণি সলজ্জ হাসিয়া উত্তর দিল, পুরানো বই-এর দোকান-গুলো ঘুরব একটু—

চলুন, আমিও যাই, আমারও বই কেনার দরকার আছে কয়েকটা।

ইহা শুনিয়া অপর মহিলাটি বলিল, তবে আমাকে এইবার ছুটি দে রিণি, সঙ্গী ত একজন পেয়েই গেলি, তাছাড়া অপূর্ব্ববাবুও ত আসবেনই—বোধ হয় এসেছেন এতক্ষণ।

রিণি তথাপি বলিল, না, তবু তুমি চল বেলা-দি।

নামটা শুনিয়া শঙ্কর সহাস্যে তাঁহাকে নমস্কার করিল এবং বলিল—আপনার নাম শুনেছিলাম অপূর্ব্ববাবুর কাছে, আজ দেখাটা হয়ে গেল!

বেলাদিদি একবার চকিতে চাহিয়া ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্করকে প্রতি-নমস্কার করিলেন ও বলিলেন, আপনার পরিচয়টিও দিন তা হ'লে?

রিণি বলিল, উনি শঙ্করবাবু, সেই যে মিষ্টিদিদি সেদিন তোমায় বলছিলেন। উৎপলবাবুর বন্ধু উনি!

ও, আপনিই শঙ্করবাবু? বেলাদিদি স্মিতমুখে শঙ্করের পানে চাহিলেন ও দন্তদ্বারা অধরোষ্ঠ ঈষৎ দংশন করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন, আপনি নাকি খুব বড় কবি? অপূর্ব্ববাবু বলছিলেন।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, লিখি বটে মাঝে মাঝে, তবে সে এমন কিছু নয়—

তিনজনে গল্প করিতে করিতে কলেজ স্কোয়ার হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শঙ্কর আবার রিণিকে প্রশ্ন করিল, পুরোনো বই-এর দোকানে কি বই কিনবেন আপনি?

বেলাদিদি অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বঙ্কিম চাহনিতে রিণির পানে একবার চাহিলেন ও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

রিণি সঙ্কুচিত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইতস্তত করিয়া উত্তর দিল, কিছু ঠিক করিনি এখনও। পুরানো বই আমার খুব ভাল লাগে। নতুন বই কেনার চেয়ে পুরোনো বই কিনতে আমার বেশী ইচ্ছে করে।

বেলাদি এই উক্তিতে সহাস্য ওষ্ঠ-ভঙ্গী করিলেন ও বলিলেন, সবাই কবি!

শঙ্কর বলিল, আপনিও নন কি?

আমি? বেলাদি অধর দংশন করিয়া ভ্রূভঙ্গী সহকারে প্রশ্ন করিলেন।

নিশ্চয়! কবি না হ'লে ব্লাউসের রঙের সঙ্গে শাড়ির রঙের এমন সামঞ্জস্য করতে পারতেন? অমন সুন্দর নাগরা জোড়া, অমন সুন্দর দুল দু'টি পছন্দ করা আপনার পক্ষে সম্ভবই হ'ত না—যদি আপনি কবি না হতেন! কবি সবাই—কেউ কবিতা লেখে, কেউ লেখে না।

মোটেই না—ও সব বাজে কথা।

বেলাদি হাসিতে হাসিতে সজোরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছু না বলিয়া সস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

বেলাদি আবার অধর দংশন করিয়া সহাস্যে বলিলেন, আপনি শুধু কবিই নন দেখছি, আরও অনেক গুণ আছে আপনার।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, নিশ্চয়! আমি নির্গুণ ব্রহ্ম নই একথা মুক্ত-কণ্ঠেই স্বীকার করছি।

বেলাদির চক্ষু দুইটি ছদ্মকোপে ভাষাময় হইয়া উঠিল।

তাঁহারা কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে পুরাতন পুস্তকের দোকানগুলির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। বেলাদি ও শঙ্করই এতক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। রিণি চুপ করিয়াছিল, সে এবার কথা কহিল, অপূর্ব্ববাবু এসেছেন দেখছি—ভোলেন নি!

ভুলবে? বলিস্ কি?

বলিয়া বেলাদি চকিত দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। শঙ্কর তাঁহার সে চাহনি দেখিতে পাইল না, কারণ সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অপূর্ব্ববাবুকেই

দেখিতেছিল। দিবালোকে লোকটাকে আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। নাকের কাছে খানিকটা পাউডার লাগিয়া রহিয়াছে, লম্বা কোঁচাটা খর্ব্বাকৃতির সহিত মোটেই খাপ খায় নাই, পাঞ্জাবিটাও হাঁটু ছাড়াইয়া পড়িয়াছে। পাঞ্জাবির রঙও অদ্ভুত! এ রকম অদ্ভুত পাঞ্জাবি পরে না কি পুরুষ মানুষে! আশ্চর্য্য মেয়েলি রুচি লোকটার। লাজুক চক্ষু দুইটি তুলিয়া বিনয়-নম্র মিহি-কণ্ঠে অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনি এলেন কোথা থেকে?

প্রতিনমস্কার করিয়া শঙ্কর বলিল, কলেজে পড়ি সুতরাং কলেজ ষ্ট্রীটে আমার আবির্ভাবের হেতু খুঁজে পাওয়া ত শক্ত নয়; কিন্তু আপনি ত ক্লাইভ ষ্ট্রীটের লোক, আপনাকেই কলেজ ষ্ট্রীটে দেখে আমার আশ্চর্য্য লাগছে।

অত্যন্ত কাচুমাচু হইয়া অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, তা বটে, মিঃ মিত্রের সঙ্গে এনগেজমেণ্টটা ছিল তাই, মানে ঘণ্টা খানেক ছুটি নিয়ে—আমাদের বড়বাবুও আবার, অর্থাৎ—

অপূর্ব্ববাবু কথা আর শেষ করিতে পারিলেন না। নতচক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি এসেন্স-সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া মুখ ও কপাল মুছিতে মুছিতে চকিতদৃষ্টিতে একবার বেলাদির পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনিও এসে গেছেন, ভালই হয়েছে! আপনাকেও এ সময় এ স্থানে দেখব প্রত্যাশা করিনি। অপ্রত্যাশিত জিনিস ত অহরহই ঘটবে—কি বলেন শঙ্করবাবু?

বেলাদি শঙ্করের দিকে চাহিতেই শঙ্কর বলিল, নিশ্চয়।

মোড়ের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, তা হ'লে চলুন বইগুলো দেখা যাক্। আসুন।

একটা দোকানে তাহারা ঢুকিয়া পড়িল।

অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর শেলির কাব্যগ্রন্থাবলী একখণ্ড রিণির পছন্দ হইল। বেশ সুন্দর দামী সংস্করণ। অপূর্ব্ববাবু তাহার দাম দিলেন ও পুস্তকটি হস্তে লইয়া বলিলেন, পরশু ঠিক সময়ে নিয়ে যাব আমি। কিছু লিখে দিতে চাই—অর্থাৎ—বলিয়া একটু অপ্রস্তুত মুখে থামিয়া গেলেন।

শঙ্কর ব্যাপারটা ঠিক বুঝিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বেলাদির পানে চাহিতেই তিনি ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলেন, পরশু রিণির জন্মদিন। অপূর্ব্ববাবু রিণিকে একটা উপহার দেবেন। সাধারণত লোকে নিজেই কিনে নিয়ে যায় ওসব জিনিস, কিন্তু অপূর্ব্ববাবুর সব বিষয়ই একটু বিশেষত্ব আছে ত—উনি রিণিকে দিয়ে পছন্দ করিয়ে তবে কিনবেন! বলিয়া বেলাদি তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে অধর দংশন করিয়া অপূর্ব্ববাবুর প্রতি একটা ব্যঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ওমা, ঠিক এই এডিসনের একটা কীট্‌স্‌ও রয়েছে যে—

রিণি একটা বুক শেল্‌ফের কোণ হইতে কীট্‌স্‌কে টানিয়া বাহির করিল। শুধু বাহির করিল নয়, লুব্ধভাবে তাহার পাতাগুলি উলটাইতে লাগিল। অপূর্ব্ববাবু একটা ঢোক গিলিয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া গম্ভীরভাবে বেলাদি বলিলেন, ওটাও নেওয়া উচিত। ওটাও কিনে নিন অপূর্ব্ববাবু!

বেশ ত বেশ ত!

অপূর্ব্ববাবু কিন্তু মনে মনে ঘামিতে লাগিলেন। তাঁহার কাছে আর পয়সা ছিল না।

এটাও নিই তা হ'লে? ঘাড় ফিরাইয়া রিণি স্মিত হাস্যে অপূর্ব্ববাবুকে প্রশ্ন করিলেন।

বেশ ত বেশ ত! আমি নিয়ে যাব ওটা পাঁচটার পর এসে, মানে এখন আমার কাছে দামটা ঠিক নেই—মানে, দশটাকার নোট আনতে ভুলে একটা পাঁচটাকার নোট—মানে, তাড়াতাড়িতে—

অপূর্ব্ববাবু অকারণে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া সেটা খুলিয়া সেই দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। শঙ্করের কাছে টাকা ছিল। সে তৎক্ষণাৎ একটা দশটাকার নোট বাহির করিল ও অপূর্ব্ববাবুকে বলিল—এই যে নিন না, আমার কাছে আছে।

বেলাদির চক্ষু দুইটিতে দুষ্টামির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রিণি একটু কুণ্ঠিত সলজ্জকণ্ঠে বলিলেন, থাক, আর দরকার নেই তা হ'লে।

আমার দরকার আছে।

শঙ্কর বহিখানি কিনিয়া লইল। অপূর্ব্ববাবুর মুখ চোখের ভাব এমন করুণ হইয়া উঠিল—যেন কেহ তাঁহার গালে চড় মারিয়া তাঁহার মুখের গ্রাসটি কাড়িয়া লইয়াছে।

বেলাদি হাসিয়া বলিলেন, এটা কিন্তু ঠিক হ'ল না

শঙ্করবাবু, অপূর্ব্ববাবুকেই ওটা কিনতে দেওয়া উচিত আপনার—

হ্যাঁ, অপূর্ব্ববাবুর জন্যেই ত কিনলাম ওটা। এখন টাকা নেই ওঁর কাছে—বইটা যদি বিক্রি হয়ে যায় আবার! এই নিন্। শঙ্করবাবু বহিখানি অপূর্ব্ববাবুকেই দিল।

ধন্যবাদ, দামটা আপনাকে নিতে হবে কিন্তু।

বেশ দেবেন।

শঙ্কর নূতন পুস্তকের খোঁজে একটা শেল্‌ফের পিছনের দিকে গেল। দেখিল যে পিছনের দিকে একই সংস্করণের বায়রন ও বার্ণস্‌ও রহিয়াছে। সে দুটিও সে কিনিয়া লইল। তাহার পর একটু ভাবিয়া পকেট হইতে কলম বাহির করিয়া অপর সকলের অগোচরে বহি দুইখানিতে কি যেন লিখিল। তাহার পর বই দুটি বগল-দাবা করিয়া সে বলিল, এইবার যাওয়া যাক তা হ'লে! মিস্ মিত্র কি কলেজ যাবেন নাকি?

হ্যাঁ।

আর আপনি?—বেলাদিকে সে প্রশ্ন করিল।

আমিও ওই দিকেই যাব। অপূর্ব্ববাবু ত আপিস যাবেন?

হ্যাঁ, আমাকে আপিসে ফিরতে হবে।

চারিজনে বাহির হইয়া ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন।

অপূর্ব্ববাবুর ট্রাম আসিতে তিনি সবিনয় নমস্কারাদি শেষ করিয়া ট্রাম ধরিয়া আপিসে চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর বলিল, চলুন না হাঁটাই যাক একটু।

তিনজনে হাঁটিতে সুরু করিলেন।

বেলাদি বলিলেন, আপনি কি বই কিনলেন, দেখি!

দেখাচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

কি অনুরোধ?

অনুরোধটা সামান্যও বলতে পারেন, অসামান্যও বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে আজ আমার প্রথম আলাপ, আজই আপনাকে একটা কিছু উপহার দেওয়া স্পর্দ্ধার মত দেখাবে; কিন্তু আজকের এই প্রথম আলাপটাকে স্মরণীয় করে রাখতে ইচ্ছে করছে। রাগ করবেন?

না, রাগ করব কেন?

তা হ'লে এইটে নিন।

বায়রণের কাব্য গ্রন্থাবলীটি শঙ্কর তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিল।

বেলাদি অধর দংশন করিয়া মলাটটি খুলিয়া পড়িলেন, গোটা গোটা অক্ষরে ইংরেজীতে লেখা রহিয়াছে—Please accept Byron.—Shankar. তাহার পর চক্ষু তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, I accept. Thanks.

তাহার পর রিণির হাতে বার্ণস্‌খানি দিয়া শঙ্কর বলিল, আপনার জন্মদিনের নেমন্তন্ন আমিও পেয়েছি মিস্ মিত্র। যাব ঠিক। কিন্তু একটা উপহার বগলে বয়ে যেতে আমার লজ্জা করবে। ও জিনিসটা ভারি ভাল্‌গার ঠেকে আমার কাছে; তাই ও ব্যাপারটা এখনই সেরে দিলাম। আপনি যে এত কবিতা ভালবাসেন তা ত জানা ছিল না আমার। আমার ধারণা ছিল, সোনাদিই বুঝি কবিতা-পাগল।

এই শুনিয়া বেলাদি বলিলেন, সোনাদি কবি দেখলে কবিতা-পাগল হন, শিল্পী দেখলে ছবি-পাগল হন, বৈজ্ঞানিক দেখলে বিজ্ঞান-পাগল হন!

রিণি কিছু বলিল না। লজ্জিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বেলাদি রিণির হাত হইতে বার্ণস্‌খানি লইয়া বলিলেন, দেখি তোর বইটাতে কি কবিত্ব করলেন উনি!

তার আগে দাঁড়ান আমি যাই—

বলিয়া শঙ্কর আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একখানা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

বেলাদি খুলিয়া দেখিলেন লেখা রহিয়াছে—It Burns. —Shankar.

রিণিও দেখিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল মাটির সহিত মিলাইয়া যাইতে!

বেলাদি অধর দংশন করিয়া ধাবমান ট্রামটার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীত

কথা ও সুর :—কাজী নজরুল্ ইস্‌লাম্

স্বরলিপি :—জগৎ ঘটক

গান

নারায়ণী*—তৃতাল

নারায়ণী উমা খেলে হেসে হেসে।
হিম-গিরির বুকে পাহাড়ী বালিকা বেশে ॥
গিরিগুহা হ'তে জ্যোতির ঝরণা
ছুটে চলে যেন চল-চরণা,
তুষার-সায়রে সোনার কমল যেন
বেড়ায় ভেসে ॥

মাধবী চাঁদ উঠে কৈলাস-চূড়ে,
খেলা ভুলিয়া যায় অনিমেষ চোখে চায়
পাষাণ প্রতিমা প্রায় সেই সুদূরে।

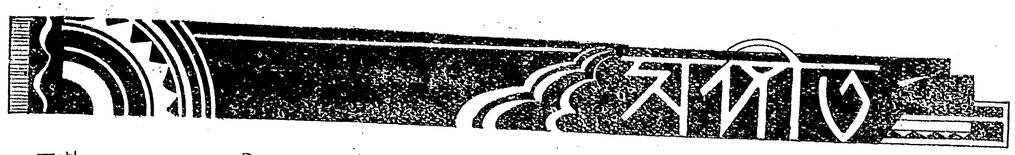

সতীহারা যোগী পাগল শঙ্করে
মনে পড়িয়া তার নয়নে বারি ঝরে,
শিব-সীমন্তিনী পাগলিনী প্রায়
"শিব শিব" ব'লে ধায় মুক্তকেশে ॥

II । সা ণ্‌া ধ্‌া । সা -া রা মা । ণা ণধা -া পা । মা -া রা সা I
০ না রা য় ণী ০ উ মা খে লে ০ হে সে ০ হে সে

I । মা মরা সা । রা -মা পা ধা । র্সা র্সর্রা র্রর্সা র্সণা । ধা পধা পা মা II
হি ম গি রি র্ বু কে পা হা ড়ী বা লি কা০ বে শে

II । ণধা পমা মরা । রমা -পা পা পা । । র্সর্রা র্সর্রা র্সণা । ধা পধাম পধা র্সা I
গি০ রি০ গু হা ০ হ' তে ০ জ্যো তি র ঝ র০ ণা০ ০

I । পধা র্সর্রা র্রর্মা । র্রা -া র্সা র্সা । রমা -পপা -ণণা -ধা । পমা মরা রসা -া I
ছু০ টে০ চ লে ০ যে ন চ০ ০০ ০০ ল চ০ র০ ণা০ ০

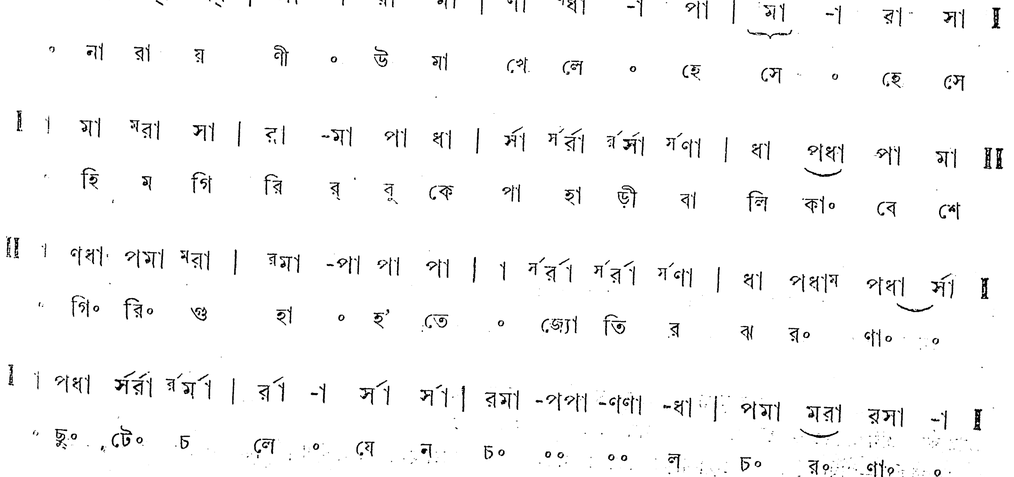

I । রা ণ্া সা । রা মা পধা -ণধণধা । ণপা পা -া পা । পণধপা -ণধপা পা পা I

০ তু যা র সা য় রে০ ০ ০ সো না র্ ক ম০০০ ০০ল্ যে ন

I । পধা পমা পা । ধর্সা -র্া র্সর্সা -া । ণা ণধা -া পা । মা -া রা সা II

০ বে০ ড়া০ য়্ ভে০ ০ সে ০ খে লে ০ হে সে ০ হে সে

II মপা -ধর্সা র্া র্া । র্সার্ র্সা -ণর্সণা পা মা । -া মপমা রা সা । ণ্া -ধ্া ধ্সা -া I

মা০ ০০ ধ বী চাঁ ০ ০ দ্ উ ঠে ০ কৈ ০ লা স চূ ০ ড়ে ০

I । রা ণ্া সা । রা রমা মরা মার । রা মা পা ধণধা । পা পা পা -া I

০ খে লা ভু লি য়া০ যা য়্ অ নি মে ষ ০ চো খে চা য়্

I ণা ণধা ধপা মা । মরা রা সা ণ্া । ণ্সা -রমা -পধা ণধা । ণপা -া মা -া I

পা যা ণ প্র তি মা প্রা য়্ সে০ ০০ ০ই সু দূ ০ রে ০

I । রা মা পা । পধা র্সা র্সা র্সা । ধা -র্সা র্া র্মর্া । মর্া -া র্সর্া র্সা I

০ স তী হা রা ০ যো গী পা ০ গ ল শ ঙ্ ক রে

I । র্সা র্া র্সা । ণা ণধা পধা মা । । রা মা পা । ধণধা ণপণ মা রা সা I

০ ম নে প ড়ি য়া তা০ র্ ০ ন য় নে বা ০ রি ০ ঝ রে

I । মা রা পা । পমা -পরা রা সা । -া ণধা পমা রসা । রা মা মপা -া I

০ শি ব সী ম ন্ তি নী ০ পা০ গ০ লি০ নী ০ প্রা য়্

I র্া র্সা র্া র্সা । ণা ণধপধাপ মা -া । মা রা -া রসা । সরা -ণ্সা সা -া II II

শি ব শি ব ব লে০০০ ধা য়্ মু ০ ক্ ত কে০ ০০ শে ০

* এই রাগ আমাদের দেশে অপ্রচলিত কিন্তু কর্ণাটদেশে ইহার চলন বেশ দেখা যায়। নানা কারণে অনেক রাগরাগিণী গায়কমহলে অব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; ইহার ফলে ঐ সকল রাগ-রাগিণী বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। এই সকল রাগ-রাগিণীর সংখ্যা কম নহে। ইহাদের কতকগুলির লক্ষণ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়; কতকগুলি বিশিষ্ট গায়ক বা ওস্তাদগণ শুধু আপনারাই গাহিয়া থাকেন,—(ঐ সকল রাগ ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া আসায়, দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া উহাঁদের অনেকেই ঐ সকল রাগের প্রসার কমাইয়া আপনাদের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত অপরকে শিখাইতে অনিচ্ছুক); এবং এই সব অপ্রচলিত রাগের কতকগুলি এখনও কর্ণাটের মত কোন কোন প্রদেশে সমধিক প্রচলিত দেখা যায়।

"নারায়ণী"—খাম্বাজ ঠাটের ও ওড়ব-খাড়ব জাতীয়। সকল সময়েই গাওয়া হয়। বাদী=সা; সম্বাদী=পা। —স্বরলিপিকার

মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্, পিএইচ্-ডি

গত জুন মাসে আমরা মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত দেখিতে গিয়াছিলাম। মাদ্রাজ শহরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত থাকায় কলিকাতা অপেক্ষা ভাল বলিয়া মনে হয়। এখানকার সমুদ্রতটটি মনোরম ও শান্তিপূর্ণ। বালুকাময় তটের নিকটে ভাল চলন-পথ আছে; তাহার পর বড় রাস্তা এবং রাস্তার অপর দিকে আবার চলন-পথ আছে। চলন-পথের ধারে বড় বড় অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। অট্টালিকার মধ্যে অধিকাংশই সরকারী আপিস। মাদ্রাজের পথগুলি পিচ দিয়া বাঁধান এবং প্রশস্ত। সমুদ্রতটের সম্মুখে বিশ্ববিদ্যালয়, বিধবাদের কলেজ, সেনোটপ্, সেণ্টজর্জ্জ দুর্গ, মহীশূর মহারাজের প্রাসাদ প্রভৃতি সুবৃহৎ অট্টালিকা অবস্থিত। সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গটি ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বপ্রথমে ইহা একটি কারখানা ছিল। এই দুর্গের মধ্যে একটি বহু পুরাতন প্রোটেস্টাণ্ট গীর্জ্জা আছে। এই গীর্জ্জায় লর্ড ক্লাইবের বিবাহ হইয়াছিল। এখন ইহার মধ্যে সরকারী আপিস দেখিলাম, যথা—য়্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল-এর আপিস। মাদ্রাজ শহর হইতে কিছু দূরে একটি সুরম্য স্থান আছে তাহার নাম আদিয়ার। এখানে আনি বেশান্ত কর্তৃক স্থাপিত থিওজফিকাল সোসাইটি একটি বৃহৎ উদ্যানের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা থিওজফিকাল সোসাইটির সুবিখ্যাত গ্রন্থশালা দেখিলাম। আমরা এই উদ্যানে একটি পুরাতন বটবৃক্ষ তলে বসিয়াছিলাম এবং সমুদ্রের শোভা এই স্থান হইতেও উপভোগ করিতেছিলাম। আদিয়ারের সমুদ্রতট ইলিয়টবীচ্ নামে সুপরিচিত এবং ইহা মাদ্রাজের সমুদ্রতট অপেক্ষা ভাল। এই নির্জ্জন স্থান আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। এখানে আমরা প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে আসিতাম এবং সমুদ্রতটে বসিয়া রত্নাকরের অহরহ কল্লোল শ্রবণ করিতাম। মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ধনী আন্নামল চিটিয়ার-এর সুন্দর এবং বিশাল অট্টালিকা আদিয়ারের পথে দেখিতে পাওয়া যায়।

মাদ্রাজ শহর কলিকাতার ন্যায় এরূপ জনাকীর্ণ নহে। তবে এখানকার কতকগুলি পল্লী আছে—যেগুলি আমাদের কলিকাতার বড়বাজারের ন্যায়; যথা—চায়না বাজার, মাড়োয়ারী পটি, মায়লাপুরের বাজার, জর্জ টাউন, এস্প্লানেড প্রভৃতি। এখানে আমরা চিড়িয়াখানা দেখিলাম। ব্যাঘ্র এবং সিংহের সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। ইহা

তিরোবতুর মন্দির

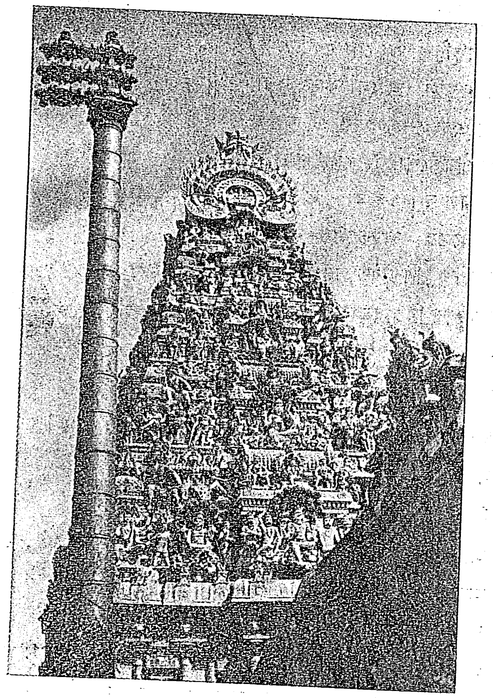

ব্যতীত একটি সুন্দর জেব্রা দেখিলাম। চিড়িয়াখানাটি ছোট কিন্তু সুরক্ষিত। যাদুঘর দেখিলাম, কলিকাতার যাদুঘরের ন্যায় বড় নহে। এখানকার যাদুঘরের মৃত জীব-জন্তুর সংগ্রহ প্রশংসনীয়। ইহা ব্যতীত প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি, শিলালিপি, স্তূপের ধ্বংসাবশেষ, অমরাবতীর ভাস্কর্য্য

সুন্দরভাবে এবং যত্নের সহিত রাখা হইয়াছে। এখানকার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শিবরাম মূর্ত্তি মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ হইল এবং তাঁহার সহিত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহগুলি বেশ ভাল করিয়া দেখিলাম; কিন্তু সময় সংক্ষেপের জন্য আর একদিন দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। যাদুঘরটি শহরের নিকটে এবং নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। মাদ্রাজে একটি নূতন জিনিষ দেখিলাম যাহা অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা সমুদ্রতটস্থ জীবন্ত মৎস্য, সর্প এবং বহুপ্রকার জলজ জন্তুর সংগ্রহ স্থান, র‍্যাকোয়ারিয়াম নামে বিখ্যাত। বড় বড় কাঁচের পাত্রে ইহাদিগকে রাখা হইয়াছে; সন্ধ্যার সময়ে ইলেক্‌ট্রিক আলোকে এই পাত্রগুলি আলোকিত করা হয় এবং সেই সময়ে এই জলজ প্রাণীর শোভা দেখিবার জিনিষ। ইহা একটি ভারতের আশ্চর্য্যের বস্তু। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বড় নহে; কিন্তু যে স্থানে ইহা স্থাপিত হইয়াছে সে স্থানটি সমুদ্র সৈকতের সন্নিকটে এবং কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান অপেক্ষা অনেক ভাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালা, রেজিষ্ট্রার-এর আপিস প্রভৃতি সব দেখিলাম এবং দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। মাদ্রাজে একটি আর্ট কলেজ আছে এবং রায় চৌধুরী মহাশয় ইহার অধ্যক্ষ। মাউণ্ট রোডে ইংরেজ এবং ভারতবাসীর বহু দোকান দেখিতে পাইলাম, যথা—হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল', ল্যারেন্স মেয়ো, মহীশূর আর্ট্‌স্ ও ক্রাফ্‌ট্ প্রভৃতি। দক্ষিণ ভারতের নানারকম চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত চেয়ার টেবিল প্রভৃতি মহীশূর আর্ট্‌স্ ও ক্রাফ্‌ট্‌স্-এ রাখা হইয়াছে। এই দোকানটী প্রত্যেক বিদেশীর দেখা কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত এখানে হিগিন-বোথম্‌স্-এর একটি বড় পুস্তকের দোকান আছে। এখানে বহুপ্রকার পুস্তক পাওয়া যায়। এখানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে। এই শহরে দুইটি রেলওয়ে স্টেশন আছে—মাদ্রাজ (সেণ্ট্রাল) এবং এগ্‌মোর্। এগ্‌মোর্ স্টেশন হইতে দক্ষিণ ভারতে রেলপথে যাইতে পারা যায়। মাদ্রাজে স্পেন্সার কোম্পানী কর্ত্তৃক চালিত কনেমারা নামে একটি বিখ্যাত হোটেল আছে। এই হোটেলটি বোম্বাই-এর তাজমহল হোটেল অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু সুন্দর ও সুরক্ষিত।

মাদ্রাজে অনেকগুলি সবাক ছবিঘর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ইংরেজী এবং তামিল সবাক চিত্র দেখান হয়। আমরা দুই-একটী তামিল সবাক চিত্র দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

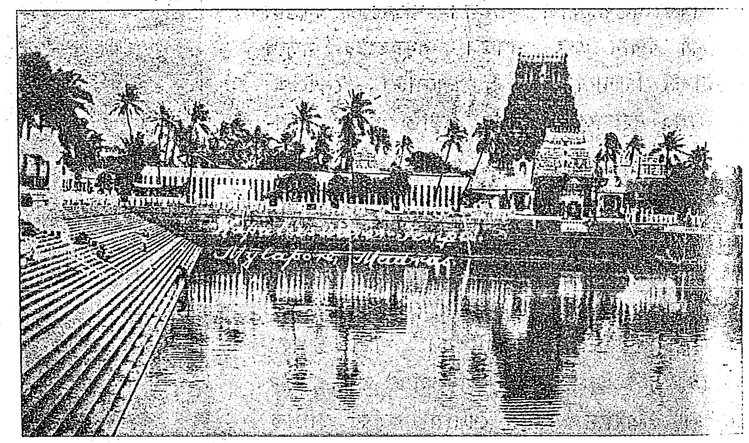

মাদ্রাজ সহরের মাইলাপুরের মন্দির

মাদ্রাজ শহরের মধ্য দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়াছে এবং এই নদীর সহিত সমুদ্রের যোগ আছে। মাদ্রাজের সমুদ্রতরঙ্গ পুরীর সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় অধিক উত্তাল নহে। প্রত্যেক সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রতীরে বহু লোকের সমাগম হয়। এখানে একটি রেডিওর দ্বারা সংবাদ এবং গান প্রচার করা হয়। সমুদ্রের সন্নিকটে রাস্তার অপর দিকে একটি ফোয়ারাও দেখিলাম, রত্নাকরের বালুকাময় তটে সভা-সমিতির আহ্বানের স্থান এবং প্রত্যেক সোমবার এখানে গোরাদের বাজনা শোনা যায়।

এদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম। আদিয়ার সমুদ্রতটে আমাদের সহিত কেবলমাত্র একটি বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত জি-সি-চন্দ্র। তিনি বলিলেন, এখানে মাত্র পঁচাত্তর জন বাঙ্গালী আছে। অধিকাংশ লোক তামিল ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। তেলেগু ভাষা খুব কম লোকে জানে। বিদেশীর পক্ষে ইংরেজী ভাষা বলা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। বাজারের সব লোক ইংরেজী জানে না। মোটর চালকের মধ্যে সবাই ইংরেজী বোঝে না। এদেশের লোকেরা বিদেশিদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করে; তাহারা পরোপকারী, ধর্ম্মভীরু এবং সজ্জন। এখনও মাদ্রাজের অনেক ঘরে বৈদিক পণ্ডিতের দ্বারা বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হয়।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রামচন্দ্র দীক্ষিত মহোদয়ের ভবনে আমরা বৈদিক পণ্ডিতদিগের বেদমন্ত্র উচ্চারণ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখানে অধিকাংশ লোক মৎস্য ও মাংস খায় না এবং গোঁড়া হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী।

মাদ্রাজ শহরে অনেকগুলি মন্দির আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে পার্থসারথীর মন্দির এবং কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পার্থসারথীর মন্দির ট্রিপ্‌লিকান্ নামক স্থানে অবস্থিত। মাদ্রাজ শহর দখল করিবার পর ইংরেজেরা ট্রিপ্‌লিকান্ দখল করিয়াছিল। মাদ্রাজের অপর একটি পুরাতন স্থানের নাম ময়লাপুর। এখানে কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। পার্থসারথীর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। প্রত্যেক মন্দিরে তোরণ, মণ্ডপ ও পুষ্করিণী আছে। পার্থসারথীর মন্দিরের কারুকার্য্য মন্দ নহে। মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহৎ রথ দেখিলাম এবং শুনিলাম, এই রথ সুসজ্জিত করিয়া দেবতাকে এখানে বসান হয়, কিন্তু টানা হয় না। মাদ্রাজ শহর হইতে ষোল মাইল দূরে তিরোবদুর নামে একটি পুরাতন মন্দির দেখিলাম, এই মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ আছে। বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম যে মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলিতে হিন্দুর প্রবেশ নিষেধ; কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ দেখিলাম যে

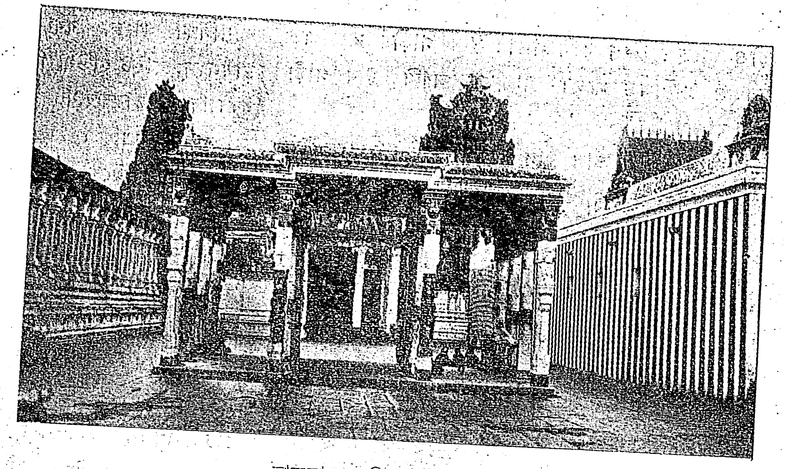

তান্‌জোরের মন্দিরের গোপুরম

আহ্বান করে এবং প্রতিমা দর্শনও বেশ ভাল করিয়া লাভ করা যায়।

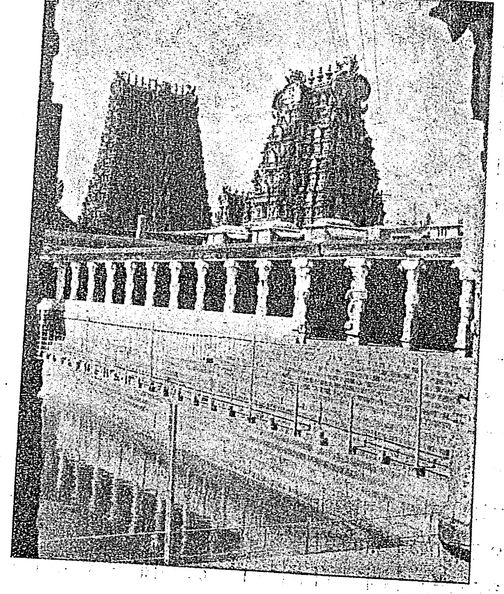

মাদুরার মীনাক্ষিমন্দিরের অভ্যন্তরে পুষ্করিণী

মাদ্রাজের সাধারণ লোকের একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে। এখানে সুন্দর সুন্দর বাস্ ও ভাড়াটিয়া মোটর গাড়ীও পাওয়া যায়। ট্রাম গাড়ীও আছে; কিন্তু কলিকাতার ট্রাম গাড়ীর মত এত সুন্দর ও সুনির্ম্মিত নহে। সমুদ্রতট অবধি ট্রাম গাড়ী করিয়া যাওয়া যায়।

মাদ্রাজের স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া মনে হইল। সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া ইহা নাতিশীতোষ্ণ। আমরা যতদিন এই শহরে ছিলাম মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় নির্ম্মল ও শীতল বায়ু আমাদিগকে আনন্দ দিত। দুই-এক দিন বৃষ্টিও পাইয়াছিলাম।

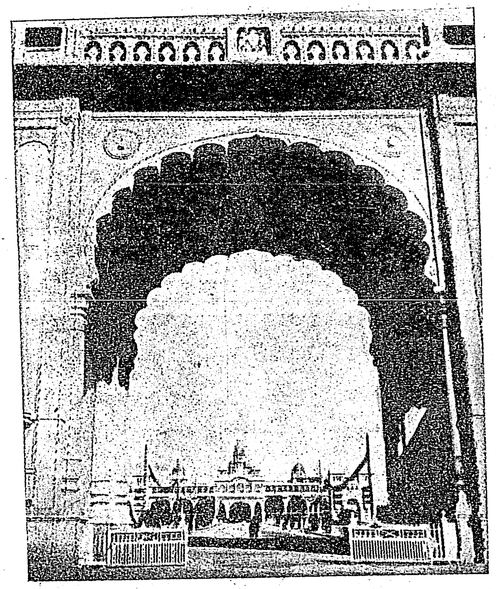

মাদুরার মীনাক্ষিমন্দিরের প্রবেশদ্বার

মোটের উপর স্থানটি ভালই লাগিল। এখানে বাড়ী ভাড়া বোম্বাই এবং কলিকাতার বাড়ীভাড়া অপেক্ষা অধিক নহে; তবে অধিকাংশ বাড়ীতে স্নানঘরের অভাব।

মাদ্রাজের সমুদ্রতট ব্যতীত আরও অনেক বেড়াইবার জায়গা আছে। লাটসাহেবের প্রাসাদের সন্নিকটে কলিকাতার গড়ের মাঠের ন্যায় ছোট ছোট মাঠ আছে এবং দুই-একটি পার্কও আমরা দেখিয়াছি। ভেপারি এবং সান থম্ নামে দুইটি পল্লী আছে, যেখানে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা বাস করে। মাদ্রাজের ঘোড়দৌড়ের মাঠ, বাকিংহাম এবং কারনাটিক নামক কাপড়ের কল, পেনসিলের কল ইত্যাদি বিদেশীর দেখিবার বস্তু। ইহা ব্যতীত এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে, যথা—হাইকোর্ট, মেডিকাল কলেজ, টাউনহল্, লাইট হাউস, ভিক্টোরিয়া টেক্‌নিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট ইত্যাদি। ভারতবর্ষের তৃতীয় শহর মাদ্রাজ দেখিয়া আমরা আনন্দ পাইয়াছি। এই শহর দেখিবার পর আমরা দাক্ষিণাত্য দেখিতে বাহির হইলাম।

মাদ্রাজে কিছুদিন বাস করিয়া আমরা রাত্রি নাটার সময়ে মাদ্রাজ হইতে ইন্দো-সিলোন এক্সপ্রেস ধরিয়া ভোর সাড়ে পাঁচটায় তানজোরে পৌঁছিলাম। কাবেরী নদীর সন্নিকটে তানজোর দেশ অবস্থিত। ইহা একটি বহু পুরাতন স্থান। তানজোর স্টেশন হইতে এক মাইলের মধ্যে বৃহদেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। মন্দিরটি দুইশত সত্তর ফুট উচ্চ এবং নিপুণ কারুকার্য্য শোভিত। এই মন্দিরের বহির্ভাগে দুইটি গণপতির মন্দির দেখিলাম। বড় মন্দিরের সম্মুখে বিশাল প্রস্তরনির্ম্মিত বৃষ আছে। মন্দিরের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সোমসুন্দর পিলাই মহাশয় আমাদিগকে ভাল করিয়া সমস্ত দেখাইলেন। এত বড় শিবলিঙ্গ আমরা আর কোথাও দেখি নাই। শিবলিঙ্গের কপালে একটি বড় চন্দনের ফোঁটা রহিয়াছে। বড় মন্দিরের চারিদিকে প্রস্তর ভাস্কর্য্যের চরম উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দ্বারপাল, গণেশ, কার্ত্তিক, সশস্ত্র সৈনিক প্রভৃতির খোদিত মূর্ত্তি রহিয়াছে। বড় মন্দিরের একদিকে বৌদ্ধ জাতকের একটি নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। আমাদের দেশে কার্ত্তিক পাখা-খোলা ময়ূরের পৃষ্ঠের উপরে বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এখানে পাখা-বন্ধ ময়ূরের পৃষ্ঠের এক দিকে কার্ত্তিক বসিয়া আছে দেখিলাম। মন্দিরের মধ্যে একটি ছোট যাদুঘর আছে। এই ঘরে তানজোরের নায়েক ও মহারাষ্ট্র নৃপতিদের পুরাতন অস্ত্র, আচ্ছাদন চিত্র প্রভৃতি রহিয়াছে। মন্দির দেখিয়া আমরা নায়েক রাজাদের প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। প্রাসাদ ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে, এখন এখানে কোম্পানির আপিস আছে। নায়েক রাজাদের পর ঐ প্রাসাদ মহারাষ্ট্রদের হস্তগত হইয়াছিল এই প্রাসাদে ত্রিশ একর জমি আছে। চোড়, নায়েক এবং মহারাষ্ট্র রাজাদের রাজধানী ছিল তানজোর। এখানে

ছোট ছোট অনেক মন্দির আছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির বৃহদেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরের চারিদিকে পরিখা রহিয়াছে। ষ্টেশন হইতে মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

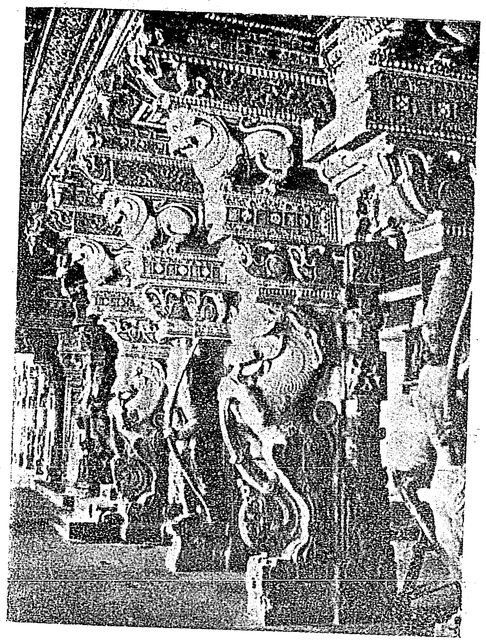

মীনাক্ষি মন্দিরের অভ্যন্তরের কারুকার্য্য

তানজোর দেশটি খুব বড় নহে; কিন্তু অত্যন্ত জনাকীর্ণ। অনেক ছোট ছোট অট্টালিকা, আদালত, নায়েক রাজাদের দরবার হল, বিখ্যাত তালপাতার পুঁথিশালা ইত্যাদি আছে। এই পুঁথিশালাটি বুধবার দিন বন্ধ থাকে। ইহা ব্যতীত তানজোরে শিবগঙ্গা পুষ্করিণী, শিবগঙ্গার বাগান প্রভৃতি আছে। এই শহরে মিউনিসিপাল ডাকবাংলা এবং রাজার ছত্রম (পথিকদিগের থাকিবার স্থান) আছে। তানজোর জেলার প্রধান শহর তানজোর দেখিয়া আমরা মাদুরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় আমরা তানজোর ত্যাগ করিলাম এবং সেই রাত্রেই ত্রিচিনোপলিতে পৌঁছিলাম। শ্রীরঙ্গমের দেশে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পর দিবস মাদুরায় পৌঁছিলাম। মাদুরা শহরটি বৈগী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি বাণিজ্যস্থান এবং বহু জনাকীর্ণ। তন্তুবায়েরা এখানে বস্ত্র তৈয়ারী করে এবং বিক্রয়ের জন্য বহু দেশে পাঠায়। মাদুরা স্টেশন হইতে বিষ্ণুমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুমন্দিরটি কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত এবং সুনিপুণ কারুকার্য্যে সুশোভিত। দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরে পরিক্রমণ করিবার জন্য চারি ধারে রাস্তা আছে। বিষ্ণুমন্দির দেখিয়া আমরা মীনাক্ষী মন্দির দেখিতে গেলাম। এই মন্দিরটি মাদুরার সর্ব্বাপেক্ষা বড় মন্দির। ইহার মধ্যে বাজার, পুষ্করিণী, চত্বর, মণ্ডপ, তোরণ সবই দেখিতে পাইলাম। মীনাক্ষী দেবী সুবর্ণ নির্ম্মিত। মৎস্যের ন্যায় ইঁহার চক্ষু বলিয়া ইঁহার নাম হইল মীনাক্ষী। ইঁহা আমাদের লক্ষ্মী। এই মন্দিরের সীমানায় শিবের মন্দির রহিয়াছে এবং এই শিবের মন্দিরের উপর সোনার পাত দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরে স্বর্ণ নির্ম্মিত ধ্বজা আছে এবং উৎসবের দিনে ঐ ধ্বজা সুসজ্জিত করা হয়। মাদুরার সুবিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দিরে একষট্টি একর জমি আছে। এই মন্দির হইতে দুই মাইলের মধ্যে একটি পুষ্করিণী আছে এবং ঐ পুষ্করিণীর মধ্যভাগে একটি মণ্ডপ আছে। কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে উৎসব হয় এবং এই স্থানে মীনাক্ষী দেবীকে আনা হয়। এই উৎসবে বহুলোক যোগদান করে।

মাদুরা শহরটী ব্যবসাস্থান বলিয়া এখানে বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে। আমরা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক দেখিলাম এবং অনেকগুলি বড় বড় দোকানও দেখিতে পাইলাম। শহরের

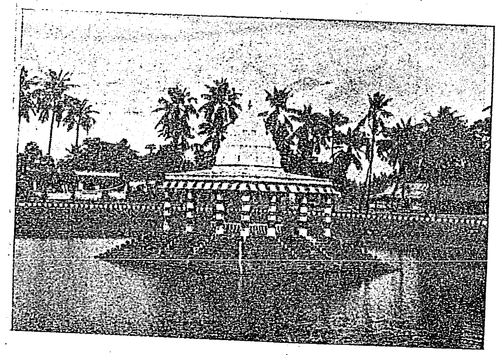

মাদুরা সহর হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত মণ্ডপ, পুষ্করিণী, ইত্যাদি

রাস্তাগুলি পিচ দিয়া বাঁধান। এই শহরে ভাড়াটিয়া মোটর গাড়ী প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। মাদুরা একটি বহু

পুরাতন নগর এবং এক সময়ে পাণ্ড্য রাজাদিগের রাজধানী ছিল। এখানে অনেকগুলি কাপড়ের কল আছে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর মাদ্রাজ এবং তাহার পর মাদুরা। মাদুরা শহর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়া আমরা রামেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

রামেশ্বর হিন্দুদিগের একটি বিখ্যাত পুণ্য স্থান। ইহা একটি দ্বীপ। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সমুদ্রের উপর সুদীর্ঘ পোল নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং এই পোল নির্ম্মাণের ফলে যাত্রীরা খুব সহজেই এই পুণ্য স্থানটি দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছে। স্থানটি খুব মনোরম বলিয়া মনে হইল। আমরা খুব ভোরে সুপ্রসিদ্ধ রামনাথস্বামীর মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। মন্দিরটি সুদীর্ঘ এবং সুবিস্তৃত; ইহার চত্বরও তদ্রূপ। প্রবেশ-পথের চারিধারে সুন্দর এবং অসংখ্য উচ্চ স্তম্ভ

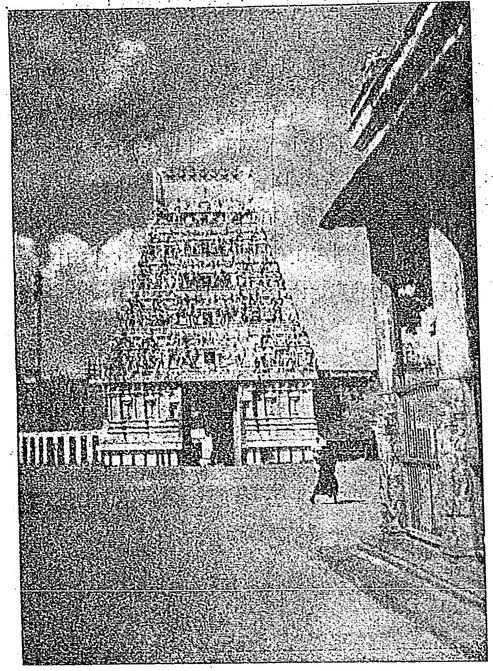

মাদুরার বিষ্ণুমন্দির

দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইতে হয়। রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া পার্ব্বতী, অন্নপূর্ণা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমানের মূর্ত্তি দেখিলাম। দ্রাবিড় ভাস্কর্য্যের চরমোৎকর্ষ দেখিয়া মন্দিরটিকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এই

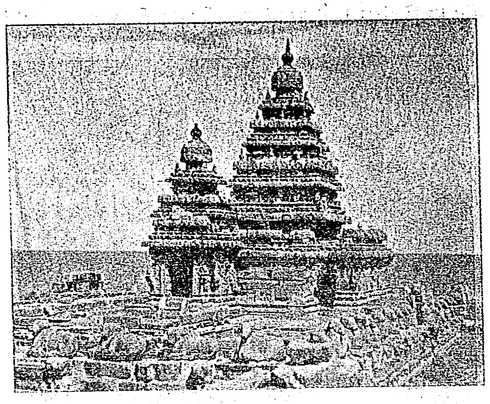

সমুদ্রতটে মহাবলীপুরের মন্দির

মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত নন্দী বৃষ আছে। তানজোরের বৃষ অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হইল। ইহার পর আমরা আর একটি আশ্চর্য্যজনক জিনিষ দেখিলাম। একটি বৃহৎ হস্তী সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিয়া দেবতার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া সেই জল দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করিল। অর্পণ করিবার পর দেবতাকে প্রণাম করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। রামেশ্বরের সমুদ্রতীর হইতে ধনুষ্‌কোডির বালুকাময় স্থানটি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপটিকে একটি গ্রাম বলিলেও চলে। কতকগুলি দোকান এবং কতকগুলি অট্টালিকা লইয়া রামেশ্বর দ্বীপ সমুদ্রতীরে অবস্থিত। উৎসবের দিনে এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। পূজারীরা পুরী এবং অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় অর্থের জন্য দর্শকদিগকে বিরক্ত করে না। এখানে আমরা ট্রাষ্টি মহাশয়ের বাংলায় গেলাম, সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। বেলা দুইটার ট্রেনে রামেশ্বর ত্যাগ করিয়া কাঞ্জিভরম দেখিতে গেলাম। রামেশ্বর দ্বীপটি এত সুন্দর ও মনোরম যে আমার বার বার দেখিবার ইচ্ছা হয়।

কাঞ্চিভরম একটী বহু পুরাতন স্থান। শিবকাঞ্চি এবং বিষ্ণুকাঞ্চি নামে কাঞ্চির দুইটি বিভাগ আছে। কাহারও কাহারও মতে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—বড় কাঞ্চি, ছোট কাঞ্চি এবং পিলায়ারপলিয়ম। শিবকাঞ্চির মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং বিষ্ণুকাঞ্চির মন্দির পরবর্ত্তীকালে

নির্ম্মিত। কাঞ্জিভরম একটি ব্যবসাস্থান বলিয়া মনে হইল। এখানে অনেক দোকান আছে এবং রেশমের বস্ত্র এইখানে তৈয়ারী হয় বলিয়া এই স্থান বিখ্যাত। এখানে বহু লোকের বাস আছে এবং চিঙ্গেলপুট স্টেশনের নিকটে অবস্থিত। ইহার পর আমরা মহাবলীপুরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

মহাবলীপুর সমুদ্রতটে অবস্থিত। সমুদ্র গর্ভগত বলিলেও চলে। ইহার অপর একটি নাম সপ্ত প্যাগাডো। এখানে মন্দির, অট্টালিকা, পর্ব্বতখোদিত মন্দিরগুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে দুইটি লাইট্ হাউস আছে—একটি নূতন এবং একটি পুরাতন। যাঁহারা পক্ষীতীর্থ দেখিয়া মহাবলীপুরের দিকে অগ্রসর হন তাঁহাদিগকে নৌকায় করিয়া খাল পার হইতে হয় এবং খাল পার হইয়া এক মাইল পথ অতিক্রম করিলে পর মহাবলীপুরে পৌঁছান যায়। মহাবলীপুর ভাল করিয়া দেখিয়া আমরা পক্ষীতীর্থ দেখিতে গেলাম; কিন্তু শুনিলাম যে সেদিন পক্ষীরা চলিয়া গিয়াছে। আমরা হতাশ হইয়া মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলাম এবং দুই-এক দিনের মধ্যে পক্ষীদ্বয়কে দেখিবার জন্য আবার ঐ স্থানে আসিলাম।

বেলা দশটার সময়ে পক্ষীদ্বয়ের আকাশমার্গে আগমন দেখিলাম এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা আবার কোথায় উড়িয়া গেল দেখিতে পাওয়া গেল না; কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া আসিল এবং পর্ব্বতোপরি মন্দিরের একপার্শ্বে বসিল। মন্দিরের পূজারী প্রদত্ত ঘৃত মধু খাইয়া তাহারা উড়িয়া গেল। আমরা যতদূর দেখিলাম

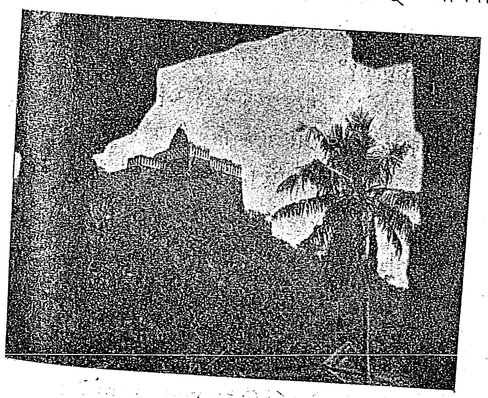

পক্ষীতীর্থ

তাহাতে মনে হইল যে, পক্ষীদ্বয় আমাদের দেশের শকুনি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রবাদ আছে যে, বহু যুগ যুগান্তর হইতে এই পক্ষী দুইটি এইরূপভাবে ঐ মন্দিরে প্রত্যহ আসে এবং দেবতার ভোগ খাইয়া উড়িয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যের যতগুলি মন্দির আমরা দেখিলাম তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পল্লব, চোড়, পাণ্ড, নায়েক রাজন্যবর্গ

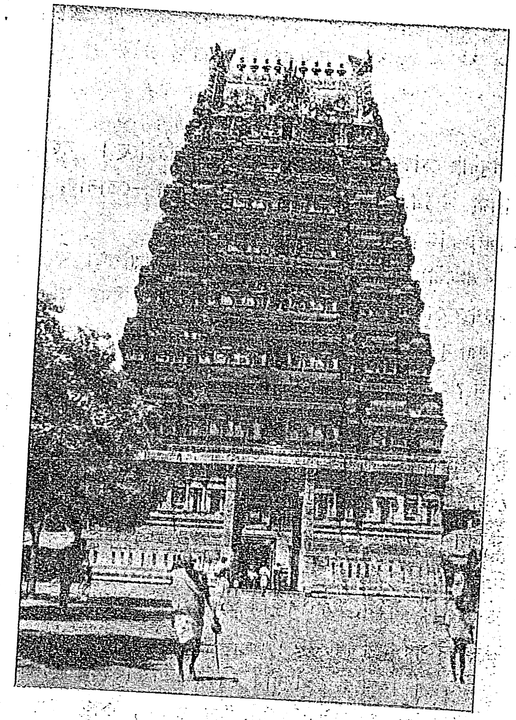

রামনাথস্বামীর মন্দির—রামেশ্বর

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং ভাস্কর্য্য হিসাবে সবগুলি একপ্রকার। আকারে কোনটি ছোট, কোনটি বড়। কাঞ্জিভরমের বিষ্ণু মন্দিরের কারুকার্য্য উল্লেখযোগ্য। মাদুরার ভাস্কর্য্য প্রশংসনীয়। মাদুরায় মীনাক্ষী মন্দিরের পুষ্করিণীর চতুর্থ দিকে যে বারান্দা আছে তাহার এক অংশে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি দেখিলাম এবং কলি ও সত্যের মূর্ত্তিও দেখিতে পাইলাম।

দাক্ষিণাত্যের লোকেরা বিদেশীদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং তাহারা অমায়িক, সদালাপী, পরোপকারী বলিয়া মনে হয়। স্বাস্থ্য হিসাবে এই সকল দেশ ভাল বলিয়াই মনে হইল; কারণ এই সকল দেশের লোকেদের স্বাস্থ্য দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, তাহাদের দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। অধিকাংশ লোক নিরামিষভোজী এবং গোঁড়া হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্যে আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

নাগরিকা

শ্রীচরণদাস ঘোষ

ষোলো

কৌমুদীর চোখে যেন কৌতুকের ঝড় উঠিয়াছে। সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "বলি, জিত্ হলো কার—তোমার, না নাগরিকার?"

সময়োচিত প্রশ্ন! ইহারই একটা রোঝাপড়া করিতে কঙ্কণও যেন প্রস্তুত! কিন্তু উহা পুরাতন, অথচ বারবার করিয়া নূতন হইয়া তাহার নির্ব্বিবাদ আত্মার কাছে আসে কেন? এই 'কেন'র জবাবটা নিজের কাছে খুঁটিয়া গ্রহণ করিতে গিয়াই তাহার মুখখানা এক আকস্মিক হর্ষে আলোকিত হইয়া উঠিল; নির্ভয়ে কি বলিতে যাইবে, থামিয়া গেল; যেন কি একটা ধোঁকা মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে নিষেধ করিল!

কৌমুদীর কাছে উহা গোপন রহিল না। ঈষৎ হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, "এখানকার কাণ্ড সবই শুনিছি—সমস্ত। একজন সব বলে দিয়েছে!"

কঙ্কণ বিস্ময়ে কৌমুদীর দিকে তাকাইতেই কৌমুদী তেমনি করিয়াই বলিয়া উঠিল, "যে রক্ষক, সেই ভক্ষক—নাগরিকা!" একটু হাসিয়াই আবার খোঁচা মারিয়া কহিল, "তাই হয়! লোকালয়ের একপাশ মহাপুরুষদের দরকার হয়! শাক্যঠাকুরের দরকার হয়েছিল নিবিড় অরণ্য, আর তোমার না-হয়—এই এক-ফোঁটা বন-ঝোঁপ! আসলে, ও একই!"

কঙ্কণ মুখ নামাইল।

কৌমুদী যেন সেদিকে লক্ষ্যই করে নাই এম্নি ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, তুমি কি জয় করলে? শাক্যঠাকুর ত জয় করেছিলেন 'মার'—শয়তান, আর তুমি?"

কঙ্কণ এইবার মুখ তুলিল, দেখিল—সম্মুখে একটি মূর্ত্তি, আশ্চর্য্য—অপরূপ, চোখ মেলিয়া না দেখিলে তাহাকে দেখা যায় না, কল্পনায় সে নিরাকার, ধ্যানে—নিশ্চিহ্ন! কয়েক মিনিট একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "অহঙ্কার! তোমাদের ওপর আমাদের!"

কৌমুদী ধীরে-ধীরে মাথা নীচু করিল; যেন নারী-সমাজের শাশ্বত নমস্কার সে ওই নিরহঙ্কার মানুষটির পদমূলে চিরতরে নামাইয়া দিতেছে! তারপর এক সময় নিঃশব্দে যেমন চলিয়া যাইবে, কঙ্কণ ডাকিল, "কৌমুদী—"

কৌমুদী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কঙ্কণ কহিল, "চলে যাচ্ছ?"

"দাঁড়িয়ে আর কি করবো?"

কঙ্কণ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তা ঠিক্! যেমন করার সব কিছুই শেষ করে চলে গেল—আর একজন!"

কৌমুদী ধীরকণ্ঠে জবাব দিল, "মিথ্যে একতিল ও নয়! 'থাকবো' বলে তোমার ওই 'আর-একজন' আসেনি! নাগরিকা—সে কী জান?—মেয়েমানুষ, তার সমাজ, তার মুখ!"

কঙ্কণ ততোধিক ধীর ও সংযতকণ্ঠে কহিল, "আর তুমি?—মেয়েমানুষ, তার সমাজ—তারই অনুভূতি!"

কৌমুদীর মুখটি রাঙা হইয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এইবার ত ছুটি?"

"আর একটু! মঠ ছেড়ে—হঠাৎ?"

কৌমুদী অবিলম্বেই জবাব দিল, "একথা জেনেই এসেছ! দরকার হ'য়েছিল, কেউ ধরে বেঁধে রাখ্তে পারে নি!" আর দাঁড়াইল না।

সঙ্গে-সঙ্গে কঙ্কণের সম্মুখে যেন এক নূতন পৃথিবী সরিয়া আসিল, যাহার ভিতর সারি-সারি পূজার বেদী, তাহার এক-একটির উপর দাঁড়াইয়া এক-একটি নারী প্রতিমা, আর প্রত্যেকের পদমূলে বসিয়া এক-একটি নর! কঙ্কণ সেইদিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, একপা—একপা করিয়া অগ্রসর হইয়া রাজপথে নামিয়া পড়িল।

* * * *

এম্নিই সময়ে নগরের আর একদিকে আর এক বিশেষ সমারোহ চলিয়াছে—চিত্রার জন্মোৎসব!

নিমন্ত্রিত—নগরের বাছাই-করা অধিবাসী—সম্ভ্রান্ত মণ্ডল, সর্ব্বোপরি—রাজা! নগরের নাগরিকা—তাহাদের জীবনেতিহাসে এতাদৃশ সৌভাগ্য আর কাহারো দেখা যায় নাই। চিত্রা রাজ-দরবারে আসন পায়, এমন কি তাহার দর্শন-প্রার্থীর তালিকায় স্বয়ং রাজার নামও উঠিয়াছে। নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌতূকময়ী নারী—চিত্রা!

চিত্রার অট্টালিকার সম্মুখে বিস্তৃত অঙ্গন, সেইখানে বসিয়াছে আসর—রচনা করিয়াছে নগরের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা। আসরে লোক আর ধরেনা—কাহারো হাতে পুষ্পহার, কাহারো হাতে রত্নহার, কাহারো হাতে বা রত্নখচিত মুকুট! সবাই আজ মানবজন্ম সার্থক করিবে এক দেবদুর্লভ নারী-প্রতিমাকে ওই-সমস্ত উপহার নিবেদন করিয়া। উপহার দিবেন সর্ব্বপ্রথমে—স্বয়ং রাজা, তারপর আর সকলে।

চিত্রা দ্বিতলে স্বীয় কক্ষে বসিয়া। তাহার হস্তে নিমন্ত্রিতের তালিকা, তাহারই উপরে সে তন্ময় হইয়া চোখ পাতিয়া—কেন যে, সেই জানে!

কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই, চঞ্চল শশব্যস্তে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল—রাজা আসিয়াছেন।

চিত্রা হাতের তালিকাটি ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া একপাশে ফেলিয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর সব?"

চঞ্চলের চোখে-মুখে তখন যেন ঝড় উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "ঝেঁটিয়ে!"

চিত্রা পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "শ্রেষ্ঠী-নন্দন?"

প্রশ্নটা চঞ্চল বুঝিতেই পারে নাই এম্নিভাবে তাকাইতেই চিত্রা আবার বলিয়া উঠিল, "যাঁর বাড়ী-ঘর ঠিক রাজারই মতন, বাড়ীর সুমুখেই 'নন্দন-বন', তার ভিতর দিয়ে রাস্তা—ঠিক যেন 'রাজ-পথ', আর ওপরে উঠ্তেই এক হরিণ-ছানা—"

চঞ্চল চালাক্ লোক, বুঝিতে বিলম্ব হইল না। প্রবল-বেগে মাথা নাড়িয়া জবাব দিল—"না।"

"ফের যাও! লোকের পর লোক চিনে দেখে এসো—"

"মিথ্যে যাওয়া—"

"তবু যেতে হবে, চঞ্চল—" চিত্রার কণ্ঠস্বর কঠিন হইয়া উঠিল। একটু থামিয়া এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমার নিমন্ত্রণ!" বলিয়াই তালিকাটি আবার উঠাইয়া লইয়া তাহার উপর মনোনিবেশ করিল।

মনিবের এরূপ সর্ব্বনেশে মূর্ত্তি চঞ্চল ইতিপূর্ব্বে আর কোনও দিন দেখে নাই। সভয়ে একবার তাকাইয়াই বাহির হইয়া গেল।

নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল চিত্রা—ক্ষণকাল। তারপর একটু হাসিল, তারপর হাতের কাগজখানা কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চঞ্চল পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই চিত্রা বলিয়া উঠিল, "গাড়ী বার করতে বল্—"

চঞ্চলের ঘাড়ে তখন আগেকার এক আদেশ ছিল; তাই বুঝিবা তাহারই উপর তার মন বেশী করিয়া বিঁধিয়াছিল। কহিল, "আসেন নি!"

"ওকথা আমি জান্তে চাইনি! গাড়ী—" বলিয়াই চিত্রা নীচে নামিয়া গেল।

তখন গৃহের প্রত্যেক মানুষটিই নীচে ব্যস্ত, চঞ্চল! প্রত্যেকেই এক মত্ত-উল্লাসে আত্মহারা! বাহিরে সভামণ্ডপ—তাহার উপর চোখ ফেলিলে চোখ আর নামে না—এম্নিই অপূর্ব্ব সে! পদার্পণ করিয়াছেন রাজা, এইবার আবির্ভাব হইবে আর এক পরমাশ্চর্য্য মূর্ত্তির, যাহারই প্রতীক্ষায় সহস্র বুকের ভিতর হৃদ্পিণ্ড যেন অধীর আগ্রহে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে!

চিত্রা প্রবেশ করিল—নগরের নবীনা নাগরিকা!

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রত্যেকেই ঈষৎ সুমুখের দিকে ঝুঁকিয়া—প্রত্যেকেরই চোখে স্বপ্ন, মুখে নিঃশব্দ স্তুতি! প্রধান পুরোহিত' রাজা—তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চিত্রার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর তাঁর শ্রদ্ধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন—রত্নহার স্বীয় গলদেশ হইতে খুলিয়া যেমন চিত্রাকে অর্পণ করিবেন, চিত্রা সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়া বাধা দিয়া কহিল, "এখন নয় মহারাজ!"

রাজা বিস্ময়ে তাকাইতেই চিত্রা মৃদু হাসিয়া কহিল, "সম্মান সেই পায়, যার এক-ডাকে দেশের লোক একযোগে এসে জড় হয়! এখানে, এখনো একজন বাকী!"

সঙ্গে-সঙ্গে সভামণ্ডপে এক রণ-সজ্জার উদ্যোগ সুরু

হইল। সবাই যেন পরশুরামের মত বীর দর্পে বলিয়া উঠিল, "এত স্পর্দ্ধা কার? বলুন, চুলের টিকি ধরে নিয়ে আস্‌ছি—"

চিত্রার মুখে তেম্‌নিই হাসি। এক দৃষ্টিতে সকলেরই প্রতি চাহিয়া বিনয়-নম্র কণ্ঠে কহিল, "তাতে মান বাড়্‌বে তাঁরই!"

রাজা এতক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে চিত্রার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, কহিলেন, "নগণ্য এক প্রজা! রাজার ইচ্ছার ওপর যার মরা-বাঁচা নির্ভর করে—মান বাড়্‌বে তার?"

চিত্রা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। হাসিয়া কহিল, "মরা-বাঁচা, তার ওপর মানুষের আত্ম-মর্য্যাদার দরদ নেই! তাহ'লে, আমিই পারতাম!" এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "রাজার ফাঁসিকাঠ, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর আমার হাতে 'মৃত্যু'—রূপের আগুনে!" বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

কোথায় গেল কেহই প্রশ্ন করিল না; যেন ঐ মেয়েটির মায়ামন্ত্রে সবাই প্রস্তর মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সবাই একে-একে চলিয়া গেল, কেনই বা ছাই আসিয়াছিল তাহাও যেন তাহাদের মনেই নাই!

বহির্দ্দেশে গাড়ী প্রস্তুত ছিল, চিত্রা গিয়া উঠিয়া বসিল—বিসর্জ্জনের প্রতিমার ন্যায়। কিয়দ্দূর গিয়াছে, এক পরিচিত কণ্ঠের গান তাহার কাণে আসিল—'স্বচ্ছ সমীর, তাহাই পৃথিবীবাসীর পরমায়ু, তাহারই উপাদানে প্রস্তুত আশা আর আকাঙ্ক্ষা!' আর একটু গিয়াই অবলোকন করিল—এক গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই নাগরিকা! আজ তাহার এক বিচিত্র রূপ—রুক্ষ কেশরাশি এলায়িত, পরিধানে গেরুয়া, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি!

চিত্রা গাড়ি থামাইয়া নামিয়া রাস্তার একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর গান থামিতেই নাগরিকার কাছে গিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি?—তোমার এ দশা কেন?"

তখন বাড়ীর ভিতর হইতে একটি ছোট মেয়ে ভিক্ষা দিতে আসিয়াছিল, নাগরিকা চিত্রার দিকে একটিবার তাকাইয়াই মুখ ফিরাইয়া ঝুলি পাতিল। তারপর যেন নিশ্চিন্ত হইয়াই চিত্রার দিকে ফিরিয়া জবাব দিল, "হবে না?—তুমি যে আমার সতীন!" কথাটা বলিয়াই নাগরিকা যেমন পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইবে, চিত্রা ডাকিয়া উঠিল, "নাগরিকা—"

নাগরিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার আর এক মহিমাময়ী মূর্ত্তি—মুখে হাসি আর ধরে না, চোখে এক দুর্দ্দান্ত মিনতি! ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সময় নেই, বোন! সারা-জীবনের সঞ্চয়—হাতে একহাত 'আমি'!" কাছে একটু সরিয়া আসিয়া গলা চাপিয়া কহিল, "আর, নেবার মানুষ—একটি ত ভিক্ষু, তাঁকে ঘিরে আবার এক লক্ষ মেয়ে মানুষ!" বলিয়াই উল্কার ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

আচম্‌কায় নিকটে বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমন চম্‌কিয়া উঠিয়াই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনি চিত্রা একটিবার শিহরিয়া উঠিয়াই নিস্পন্দের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সে অত্যল্পক্ষণ! তারপর তাহার মুখে এক শ্লেষের হাসি দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়া নির্গত হইল—'ভিক্ষু'! তারপর নিজেকে যেন প্রবলবেগে ঝাড়া দিয়া ঝড়ের ন্যায় গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

দেখিতে-দেখিতে গাড়ী যেখানে আসিয়া থামিল, সেইখান হইতেই সরু হইয়াছে কঙ্কণের পরিত্যক্ত নিকেতন—সেই পরিচিত গৃহ! তারপর যেমন করিয়া এক অতিবড় গর্ব্বিতাকে নামিলে মানায় তেম্‌নি করিয়াই চিত্রা গাড়ী হইতে নামিল। নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল—সেই সব!—প্রশস্ত অঙ্গন—মাঝখান দিয়া দৌড় দিয়াছে প্রশস্ত রাস্তা, উভয় পার্শ্বে ছড়ানো ফুলগাছ, গাছে-গাছে ফুল, আর পায়ে-পায়ে তাহাদের পরিচিত নমস্কার—সব সেই! * * * চিত্রা পায়ে জোর দিল। অতঃপর অট্টালিকার মুখে গিয়া পড়িতেই দেখিতে পাইল মূর্ত্তিমান নন্দনকে। সে তখন সাজ্জগোছ করিয়া এক বিশেষ কাজে ব্যস্ত—একটি হৃষ্টপুষ্ট শ্রীমান্ গর্দ্দভের পিঠে কম্বল জড়াইয়া বাঁধিতে গিয়া ঘামিয়া উঠিয়াছে, অবুঝ জানোয়ারটা কিছুতেই ছাই স্থির হইয়া থাকিবে না! মানুষের হাত-পা লইয়া চলা-ফেরা করে, এমন একটা যা-হোক্ মূর্ত্তি আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে, কাজেই তাহাকে চোখ তুলিতে হইল, কিন্তু সে এক নিমেষ! পরক্ষণেই আবার হাতের কাজে মনোনিবেশ করিল।

চল্‌তি-জীবনে এতবড় অবহেলা আর কাহারো কাছে এতাবৎ চিত্রা পায় নাই, সুতরাং এক কথায় সৃষ্টিকে রসাতলেই দিবার তার কথা! কিন্তু না-জানি-কেন, সে নিশ্চেষ্ট হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল এক দৃষ্টে

সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "এইখানে একদিন একটা হরিণ বাচ্ছা থাক্‌তো!"

নন্দন সায় দিল না।

চিত্রা আবার কহিল, "তার জায়গায় কিনা—একটা গাধা!"

এবারেও নন্দন নীরব।

চিত্রা আর সহ্য করিতে পারিল না। মুখ বাঁকাইয়া একটু ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "যত সব অনাসৃষ্টি!—দেখুন, আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আসি নি!"

নন্দন এইবার কথা কহিল। মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কিছু বল্‌বে?" বলিয়াই গাধাটাকে অনতিদূরে বাঁধিয়া রাখিয়া চিত্রার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কি মনে করেন আপ্‌নি?"

"তোমার নিজের ঘরে তুমি ফিরে এলে!"

চিত্রা অপর দিকে মুখ ফিরাইল। তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া খোঁচা মারিয়া কহিল, "সবাই গেরুয়া প'রে ঝুলি কাঁধে করেছে, আপ্‌নি যে এখনো—"

নন্দন চোখমুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "বাপ্‌রে! আবার গেরুয়া!"

জবাবটার মূলে যে-ইতিহাস, তাহা মনে পড়িতেই চিত্রা হাসিয়া ফেলিল। তাড়াতাড়ি আবার নিজেকে গাম্ভীর্য্যের মাত্রায় আনিতে গিয়া গাধাটার দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনার কি সবই বিশ্রী?"

"নইলে তোমার যে মুখ থাকে না!" বলিয়াই নন্দন চকিত হইয়া গাধাটার কাছে ফিরিয়া আসিল; তারপর বাহনটির উপর উঠিতে যাইতেই চিত্রা এক নিষ্ফল গর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "বাড়ী বয়ে এসেছি এখানে—তীর্থ কর্‌তে নয়!"

"নিশ্চয়ই না, যেহেতু এ তোমার স্বামীর ঘর!" বলিয়াই নন্দন গাধার উপর উঠিয়া বসিল।

চিত্রার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। রোষগম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অপমান করে সে, যে নিমন্ত্রণ না রাখে!"

নন্দন গাধার পিঠে চাবুক মারিল।

চিত্রার মুখখানা এইবার কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল—একটা রহস্যের কাহিনী মুখে করিয়া সে আসিয়াছে যে—একটিও ত বলা হয় নাই! ভারি গলায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কারুর বাড়ী অতিথি হওয়া কারুর ভাগ্যির কথা!"

নন্দন তখন খানিক দূর চলিয়া গিয়াছে, আবার তাহাকে ফিরিতে হইল। চিত্রার কাছাকাছি হইয়া বলিল, "তা আর বল্‌তে!"

চিত্রার চোখ দুটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই জ্বলন্ত চোখ নন্দনের দিকে একবার উঠিয়াই নামিয়া পড়িল।

এদিকে এক মুহূর্ত্তও অপব্যয় হইল না। নন্দন তৎক্ষণাৎ এক সাক্ষাৎ অপরাধীর ভাণ করিয়া সবিনয়ে বলিয়া উঠিল, "রাগ করো না! যাবার সময় নেই, নাগরিকা! কোথায় যাচ্ছি জান?—এই নকল সমাজ, তারই যে 'সমাজপতি', তারই শ্রাদ্ধ-সভায়; সেখানে আর এক জনের জন্মোৎসব—তার নাম কঙ্কণ!" বলিয়াই আবার বাহন ছুটাইয়া দিল।

চিত্রা নিষ্পলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল—কতক্ষণ তাহা সে জানে না—এক সময় সে টের পাইল বাহির হইয়া গিয়া গাড়ির উপর বসিয়াছে। তারপর গৃহে ফিরিয়া দ্বিতলে উঠিয়া গিয়া দেখিল—তাহার 'প্রার্থী' বসিবার কক্ষে উপবেশন করিয়া—স্বয়ং রাজা!

সতের

চিত্রার্পিতার ন্যায় চিত্রা দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখের আকৃতি দেখিয়া প্রতীয়মান হইল যে, এই-একটু-পূর্ব্বেকার পৃথিবীটা তার সম্মুখ হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

রাজারও চোখে আর পলক পড়ে না, যেন এক আনাড়ির দৃষ্টি এক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা-ছবির উপর অকস্মাৎ পড়িয়া নিথর হইয়াছে!

মিনিট কয়েক পরে চিত্রার মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। কহিল, "কি ভাগ্যি!"

রাজা অবশ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি!"

"আমাকে?"—চিত্রার চোখে কুণ্ঠা, বাক্যে মিনতি, মুখে হাসি!

রাজা তেম্‌নি করিয়াই কহিলেন, "হ্যাঁ! তখন ভালো করে দেখা ত দাও নি!"

চিত্রা সরমে মুখ নীচু করিল। একটু পরেই আবার মুখ তুলিয়া বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এখানে নয়, আসুন—" বলিয়াই স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, রাজাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তদনুসরণ করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর চিত্রা যেন-একটু কৈফিয়ৎ

দিয়াই কহিল, "ও-ঘরে প্রার্থী বসে, অর্থাৎ—" মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া কথাটা শেষ করিল, "অর্থাৎ, যারা আমাকে একবার দেখেও আবার দেখ্‌তে আসে!" বলিয়াই স্বতন্ত্র একটি আসনে বসিয়া পড়িল।

রাজা মুখ নামাইলেন, যেন সুমুখের ওই মেয়েটির দিকে চোখ আর না রাখাই ভাল। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নহে, মিনিটখানেক পরেই আবার মুখ তুলিলেন, যেন হঠাৎ তাঁর এক বিশেষ কথা মনে পড়িয়াছে! বলিয়া উঠিলেন, "আমি রাজা—তোমার ওপর আমার এক সুনিশ্চিত কর্ত্তব্য আছে!"

চিত্রা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "রাজার কর্ত্তব্য—আমার ওপর?"

রাজার মাথাটা আবার অবনত হইয়া পড়িল। কহিলেন, "হ্যাঁ!" পরক্ষণেই আবার মাথা তুলিয়া কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্বীকার তুমি করনি, কেন না, তা' করবে না! কিন্তু আমার নগর, এর পরিপূর্ণ অনুভূতি অস্বীকার করে নি যে শ্রেষ্ঠ নাগরিকা তুমিই! তাই আমার হাতের দেবার বস্তু, তোমাকে উপহার দেব!"

চিত্রা রাজার দিকে তাকাইয়াছিল, তেমনি করিয়াই রহিল—নিষ্পলক নেত্রে।

রাজা সুরু করিলেন, "রাজ-আয়োজনে কাল তোমার শোভাযাত্রা!"

চিত্রার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, যেন এক দুর্লভ-বিদ্যুৎ আচম্‌কায় আকাশ হইতে পড়িয়া তার বুকে উঠিয়াছে! সুমুখের দিকে আর চোখ পাতিয়া রাখিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি মুখটা নামাইয়া লইল।

সঙ্গে-সঙ্গে রাজার দৃষ্টিও চিত্রার মুখটায় গড়াইয়া নীচে নামিল। কহিলেন, "আমার গর্ব্ব—অবহেলা করো না!"

"তা কি পারি!" বলিয়াই চিত্রা মুখ তুলিল। আর তার সময় নাই, সঙ্কোচ নাই, যেন নীচে হইতে তাহার চিবুকে হাতুড়ির আঘাত পড়িয়াছে! সেই মুখখানি রাজার আগ্রহ-ব্যাকুল চোখের উপর রাখিয়া মুহূর্ত্তেই আবার বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, বড় করবেন কাকে?"

"তোমাকে।"

"আমি নিঃস্ব! কতটা যে, আপনি জানেন না!"

"প্রয়োজন নেই জান্‌বার! মাটির প্রতিমার বুকে ছুরি মেরে কেউ কোন দিন তার রক্ত পরীক্ষা করেনি!"

চিত্রার মুখে ম্লান হাসির এক আভা পড়িল। কহিল, "মাটির প্রতিমার বুকে রক্ত থাকে না,—সে-কথা সবাই জানে—তাই!"

রাজা যেন চিত্রার মুখের কথাগুলা একটি-একটি করিয়া লুফিয়া ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "না! তাহ'লে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে কেউ তার আরতি করতো না!"

এমনি সময়ে নীচে এক উচ্চ কোলাহল উঠিল এবং উভয়েই ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বাহির হইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া উভয়েই নেত্রপাত করিয়া দেখিল, নীচেকার উঠানে চিত্রার পরিচারিকা রাক্ষসীমূর্ত্তি ধরিয়া বজ্রমুষ্টিতে চঞ্চলের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছে,—"ঝেঁটিয়ে বিষ ছাড়্‌বো!" আর চঞ্চল তাহার দিকে চাহিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিতেছে—"ছেড়ে দাও!"

চিত্রা আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না, দ্রুতপদে নামিয়া উহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, রাজাও পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন ছায়ার ন্যায়।

রাজাকে দেখিয়াই পরিচারিকা তাঁহার পদতলে আছ্‌ড়িয়া পড়িয়া রোদনকম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নিই রক্ষে করুন্! আমার সর্ব্বনাশ করতে বসেছে—"

রাজা ঈষৎ পিছাইয়া গিয়া চিত্রার দিকে বিস্ময়ে চাহিতেই চিত্রা সহাস্যে পরিচারিকাকে প্রশ্ন করিল, "হলো কি তোদের?"

পরিচারিকা উন্মত্তার ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিবর্ণমুখে কহিল, "এত কাণ্ড হচ্ছে—ওমা, তুমি কিছুই টের পাওনি?

"না!"

"সভা বসেছে!—সেই যমের বাড়ী ইনি যাবেন!"

চিত্রা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "সভা?—কিসের?"

পরিচারিকা কপালে সজোরে করাঘাত করিয়া কহিল, "আমার তে-রাত্রের শ্রাদ্ধর!" বলিয়াই মুখখানা কাঁদ-কাঁদ করিয়া কহিল, "ঘরসংসার ভাসিয়ে দেবার!"

"মিথ্যে কথা!"—চঞ্চল প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

সাপের লেজে পা পড়িয়াছে! পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঝাঁটা—"। পরক্ষণেই

আবার চিত্রার দিকে মুখ করিয়া সুরু করিল, "আদ্দেক লোক স্ত্রীপুত্তুর ত্যাগ দিয়েছে, আদ্দেক লোক আজ দেবে! মাগো! সে আঁটকুড়ির দেব-পুত্তুরকে চোখে দেখ্‌লে কেউ কি আর ফেরে!" বলিয়াই ফোঁপাইয়া উঠিল!

চিত্রার দৃষ্টি তখন বাহিরের একটি গাছের উপর, সেখানে একটি ক্ষুদ্র পাখী বসিয়া—সে কেমন করিয়া উড়িয়া যাইবে, তাহাই সে দেখিবে, আজ—এই প্রথম! চট্ করিয়া দৃষ্টি নামাইয়া একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই নাকি? কে তোর দেব-পুত্তুর?"

পরিচারিকা গলা ঝাড়িয়া জবাব দিল, "ওই পোড়ার-মুখোদের মঠ, মঠের একজন কি-যেন!"

চঞ্চল তাড়াতাড়ি কথাটাকে পরিষ্কার করিয়া দিতে গেল—"তা বোলে মানুষ নয়—" উদ্যত অশ্রু কণ্ঠ তাহার নিরুদ্ধ করিয়া দিল।

চিত্রা ও রাজা উভয়েই চাহিয়া দেখিলেন—চঞ্চলের চোখ দিয়া মুখ বহিয়া বসুধারা পড়িতেছে!

কাপড়ে চোখ মুছিয়া গলা ঝাড়িয়া চঞ্চল পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "ঠা-কুর!—অমন রূপ তোমারও নেই, মা!"

চিত্রা রাজার দিকে চাহিয়া মুচ্‌কিয়া ঈষৎ হাসিল।

রাজাও সেই হাসিতে যোগ দিয়া পরিচারিকা ও চঞ্চলকে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের পরিচয় প্রশ্ন করিলেন, "ওরা?"

"স্বামী-স্ত্রী—" জবাবটা দিতে গিয়া চিত্রার গলার স্বরটা যেন ভাঙিয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

তখনও পরিচারিকা চঞ্চলের দিকে ক্রুদ্ধচক্ষে চাহিয়া আছে, চক্ষে দাবানল, যেন এখনিই অপরপক্ষকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে! ক্রোধে, ক্ষোভে ও দুঃখে কাঁপিতে-কাঁপিতে চিত্রার দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, "শুন্‌লে ত মা! এইবার আমার মুখে সাত ঝাঁটা মারো—"

চিত্রার বুঝিবা আজ হাসিয়া গড়াগড়ি দিবারই দিন। তাই সে মুখ ভরিয়া হাসিয়া কহিল, "ভিক্ষু!—তাকে এত ভয়?" পরক্ষণেই দেখা গেল, তাহার মুখ-চোখের ভাব বদলিয়া গিয়াছে, যেন সে অন্যমনস্ক! একটু পরেই স্বাভাবিক মুখে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু ওদের ত দুর্গতিই হয়—মারও খায়, মরেও যায়!"

পরিচারিকা মুখের এক প্রকার ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কি সেই ভিক্ষু?—ও মন্তর জানে! তুমি জান কি—লাঠি নিয়ে মারতে গিয়েছিল হাজার—হাজার লোক, সকলের হাত থেকে লাঠি খসে পড়েছে! উল্টে—" হঠাৎ চোখে আঁচল চাপিল।

চিত্রা সকৌতুকে প্রশ্ন করিল—"উল্টে—কি?"

পরিচারিকা ধরাগলায় কহিল, "সবাই মাগ-ছেলে ত্যাগ দিয়ে ঝুলি কাঁধে ক'রেছে!" আঁচলে সে চোখ মুছিল।

চঞ্চল অস্থির হইয়া উঠিল, যেন তাহার সুমুখে মানুষ খুন হইয়াছে। বলিয়া উঠিল—"না, মা! ওর মিছে কথা!"

পরিচারিকা তাড়াতাড়ি দুই-একটা ঢোক গিলিয়া রুখিয়া চঞ্চলের দিকে ফিরিবে, চিত্রা বাধা দিল। দিয়াই চঞ্চলকে প্রশ্ন করিল, "তোমার মতলবটা কি, শুনি?"

"ছেলে-পরিবার সকলকে নিয়ে—"

"ভিক্ষু হয়েছো?"

চঞ্চল প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "মঠের ভিক্ষু নয়! সে তুমি জান না মা!" পরক্ষণেই অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল, "মা, আমি যাই—"

চিত্রা পরিচারিকাকে দেখাইয়া কহিল, "একে নিয়ে ত?"

পরিচারিকা ক্রোধে ও ক্ষোভে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ফোঁপাইয়া উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার গরজ—" বলিয়াই অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া চঞ্চলের দিকে ফিরিতেই সে গোটা দুই লাফ মারিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে পরিচারিকাও যেন বুকের ভিতর হইতে একরাশ টানিয়া বাহির করিয়া সুমুখের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমিও যাচ্ছি! দেখ্‌ছি, কেমন তুমি, আর তোমার ঠাকুর—" বলিয়াই অগ্নিগোলকের ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল!

চিত্রা সেইদিকে তাকাইয়াছিল, মুখ নামাইল। রাজারও চোখ দুটা দিক-নির্ণয় যন্ত্রের ন্যায় চিত্রার আনত-মুখের দিকে ফিরিয়া স্থির হইয়া রহিল। তখন নীচে আর-কেহই ছিল না, চারিদিক নিঃশব্দ। রাজা চিত্রার দিকে আড়চোখে চাহিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিয়া কহিলেন—"অভিনয়টা করলে মন্দ নয়!"

চিত্রা চম্‌কিয়া রাজার দিকে তাকাইল, তাকাইয়া আবার মুখ নামাইয়া লইল।

রাজা একহাতে খপ্ করিয়া চিত্রার একটি হাত ধরিলেন এবং অপর হাতে তাহার চিবুকটা ধরিয়া তুলিয়া বিলোল কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "চাইলে, চেয়ে আবার চোখ নামালে ?"

চিত্রা তাকাইয়া রহিল—চোখের পলক পড়িল না, যেন সে পাষাণ-প্রতিমা, যেন বা তাহার ভিতরে স্পন্দন, সাড়া, অনুভূতি সমস্তই এইমাত্র কে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়াছে।

রাজা নিজের মনোমত চিত্রার মুখটিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কহিলেন; "নামিয়ো না!" বলিয়াই স্বীয় গলদেশ হইতে আর-একক্ষণের সেই উপেক্ষিত রত্নহারটা চিত্রাকে পরাইয়া দিলেন। তারপর তাহার দিকে তন্ময় হইয়া খানিক তাকাইয়া রহিলেন, তারপর—তারপর নিজের মুখখানা চিত্রার মুখের কাছে সরাইয়া আনিতেই চিত্রা চম্‌কিয়া খানিক পিছাইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আমার শোভাযাত্রা—"

"প্রস্তুত!"

রাজা আর অপেক্ষা করিলেন না:

* * * * *

একই সময়ে নগরের আর এক অংশে এক বিস্তৃত পটভূমির উপর আর এক অভিনয়ের একটি দৃশ্যের মুখ খুলিয়াছিল।

বিরাট সভা বসিয়াছে।

লোকে লোকারণ্য—আবালবৃদ্ধবনিতা। তিল-পরিমাণ স্থান নাই, তত্রাপি লোক প্রবাহের বিরাম নাই। সভার ঠিক মাঝখানটিতে এক উচ্চ শিলাখণ্ডের উপর করযোড়ে দাঁড়াইয়া কঙ্কণ—এক মহিমাময় মানব মূর্ত্তির অপূর্ব্ব বিকাশ! তাহার মুখে হাসি, চোখে মিনতি, সকলকেই যেন ডাক দিয়াছে—'এসো!'

সভার উদ্যোগী সেইদিনের সেই বিদ্রোহী-দল। তাহারা সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চঞ্চল সকলেই অস্থির! প্রত্যেকেই করিতেছে ভিতর-বাহির, এক অনাগত মূর্ত্তির অপেক্ষায়—সমাজপতির!

মুহূর্ত্ত, পল, দণ্ড অতিবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তত্রাপি সমাজপতির দেখা নাই। ভিক্ষুপক্ষ ব্যস্ত হইয়া অপর পক্ষকে তাগাদা দিল, "কোথায় তোমাদের সমাজপতি ?"

কঙ্কণ হাত তুলিল—নিষেধ! সকলেরই চোখ সেই-দিকে ফিরিল, ফিরিতেই কঙ্কণ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিল, "ভিক্ষু—তোমাদের কথা, ও নয়!"

যুগপৎ সকলেরই মস্তক অবনত হইল—সকলেই অপ্রতিভ!

প্রতিপক্ষ যাহারা তাহাদের প্রত্যেকেরই মুখে তখন যেন কালি পড়িয়াছে! যে অগ্রণী, সে একজনকে তাড়া দিয়া নির্দ্দেশ দিল, "যাও, শীগ্‌গীর—যদি অসুস্থ হয়েও থাকেন, উঠিয়ে নিয়ে পিঠে ফেলে ছুট্ দেবে—

এমন সময়ে জনতায় কলরব উঠিল। প্রথমে—গোড়ায়, তারপর মাঝে, তারপর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া! অতঃপর সকলেই যুক্ত দৃষ্টি যেন প্রচণ্ড কৌতুকে প্রবেশ-দ্বারে ঝাঁপাইয়া পড়িল—গাধায় চড়িয়া নন্দন!

নন্দন গম্ভীরভাবে কহিল, "আমি সমাজপতি নই—গাধাপতি!" বলিয়াই কষিয়া গাধাটার লেজ মলিয়া ছুট্ করাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তারপর বাহনটিকে উপস্থিত ভারমুক্ত করিয়া তাহার পিঠে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া চারিদিকটায় দৃষ্টি-বিনিময় করিল। দৃষ্টির এক সীমানায় কঙ্কণ, তাহারও সঙ্গে চোখ মিলিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ এমনিই ভাবে চোখ ফিরাইয়া লইল, যেন ওই লোকটির সহিত তাহার চোখের দেখাও ইতিপূর্ব্বে কখনো কোনদিন কোথাও হয় নাই। অতঃপর তাহার চোখ ফিরিল প্রতিপক্ষের উপর। একে-একে প্রত্যেকের চোখে চোখ মিলাইয়া তাহাদের অগ্রণীকে দেখিতে পাইয়াই তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল এবং সে সরিয়া আসিতেই স্বীয় গাত্রাবরণের ভিতর হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল—"সমাজপতিরা"

অগ্রণী তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলিয়া ফেলিল এবং তাহার কৃষ্ণ অক্ষরগুলার উপর চোখ পাতিয়াই মস্তক অবনত করিল।

দলের প্রত্যেক লোকই উন্মুখ হইয়াছিল, প্রত্যেকেরই মুখ ওই মারাত্মক লিপির উপর একযোগে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং সকলেই যেন দিশেহারা হইয়া বিভ্রান্তের ন্যায় পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তারপর প্রত্যেকেই আপন মনে—যেন নিজের আত্মাকেই পালাক্রমে একই প্রশ্ন করিয়া উঠিল—'ভিক্ষুর ধর্ম্মই বড় ?'

"ভিক্ষুর ধর্ম্মই বড়—"সমাধিমুক্তের ন্যায় কথাটি মুখ

দিয়া বাহির করিয়াই অগ্রণী মুখ তুলিল, যেন তাহার মুখে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। পরক্ষণেই নিজেকে যেন ধরাধরি করিয়া নন্দনের পদপ্রান্তে নামাইয়া দিল! বিস্ময়ে বিহ্বল দল —তাহারই অনুসরণ করিল। কঙ্কণ হাত বাড়াইয়া ছিল, অগ্রণী কাছে আসিতেই তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। তখন ভিক্ষুপক্ষের মেয়েদের মুখে 'উলু' আর শাঁখ।

অতঃপর কঙ্কণ অগ্রণীকে সস্নেহে বুক হইতে খুলিয়া পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া হাত দুটি জড় করিল; তারপর সেই যুক্তকর স্বীয় ললাটে একবার স্পর্শ করিয়াই নামিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন তাহার পশ্চাতে এক বিরাট বাহিনী, যেন তাহারা অভিশাপমুক্ত—নবজীবনে সবাই আত্মহারা!

রাস্তায় পড়িতেই কঙ্কণের গতি হঠাৎ থামিল—পথরোধ করিয়া চিত্রার পরিচারিকা। তাহার মাথার চুল বিস্রস্ত, চোখ রক্তবর্ণ, মুখ রোদনে বিকৃত! কঙ্কণ বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "কে তুমি, বোন্ ?"

চঞ্চল দাঁড়াইয়াছিল কঙ্কণের ঠিক্ পশ্চাতেই। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আমার—" কথাটা সমাপ্ত না করিয়াই উভয়ের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

কঙ্কণ সহাস্যে চঞ্চলের দিকে এক গুরুতর কটাক্ষ করিয়া কহিল, "তোমার স্ত্রী ?"

চঞ্চল দুই একটা ঢোঁক গিলিয়া মুখ নামাইয়া জবাব দিল—'হুঁ!'

পরিচারিকা ফোঁপাইয়া উঠিল, তারপর মুখস্থ বলার মত বলিয়া ফেলিল, "আমাকে ত্যাগ দিয়েছে—"

কঙ্কণ তেম্‌নিই হাসিয়া কহিল, "ভালোই ত! আজ নতুন করেই একজনের সঙ্গে একজনের বিয়ে হোক্!" বলিয়াই পরিচারিকার হাত ধরিয়া চঞ্চলের হাতে গুঁজিয়া দিল। দিয়াই আবার পথ ধরিল। আর সকলেও তেম্‌নিই পশ্চাতে, মেয়ে আর পুরুষ—পাশাপাশি।

দাঁড়াইয়া রহিল মাত্র চঞ্চল আর পরিচারিকা—"ঘর আর কনে!"

চঞ্চল পরিচারিকাকে তাগাদা দিয়া কহিল, "বাড়ী চল!"

পরিচারিকা নতমুখে পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে জবাব দিল, "না।"

চঞ্চলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কহিল, "তবে ?"

কঙ্কণ তখনও তাহাদের দৃষ্টির আড়াল হয় নাই, পরিচারিকা মুখ তুলিয়া তাহার দিকে আঙুল বাড়াইল।

চঞ্চল প্রথমে সংশয়ে, তারপর হর্ষে, তারপর মূঢ়ের ন্যায় মেয়েটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেই সে ঠোঁট ফুলাইয়া স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া ফেলিল।

আঠারো

কয়েক পদ গিয়াই কঙ্কণ তাহার নব দলকে আদেশ দিল—"বাড়ী যাও!"

বিস্ময়ের কথা! একজন কহিল, "কেন, মঠ ?"

কঙ্কণের মুখে হাসি আর ধরে না। কহিল, "মঠ ?—বাড়ীই যে তোমাদের মঠ!" পরক্ষণেই মুখের ভাব প্রশান্ত করিয়া কহিল, "বউ, ছেলে, মা, বাপ—এই নিয়েই তোমাদের মঠ!"

বুঝিবা এক অত্যাশ্চর্য্য নির্দ্দেশ! সকলেই বিহ্বল হইয়া কঙ্কণের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কঙ্কণ তেম্‌নি করিয়াই আবার বলিতে লাগিল, "তারই ভিতর ভিক্ষু—বাপ, মা, ছেলে, বউ! কঠোর বলে যা-কিছু সে ত কারাগার, মানুষের মুক্তির মঠ সে নয়!"

অতঃপর কঙ্কণ চলিয়া যাইতেই আর একজন অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "দীক্ষা"—

কঙ্কণ বলিতে যাইবে, অদূরে ত্রিবর্ণের আবির্ভাব হইতেই সে থামিয়া গেল। সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "অধ্যক্ষ আস্‌ছেন! এসো—" বলিয়াই বাহিনীকে যেন এক জোর টান দিয়া অগ্রসর হইয়া ত্রিবর্ণের সম্মুখে গিয়া সদলে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিল।

ত্রিবর্ণের মুখে হাসি, চোখে দীপ্তি, আর সর্ব্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত আশীর্ব্বাদ! তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এক কৌতুকময়ী—কৌমুদী!

ত্রিবর্ণ আশীর্ব্বাদ করিলেন; হাত তুলিয়া—যেন সকলেই অনুভব করিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই মস্তকে ওই মহা-পুরুষের স্পর্শ পড়িয়াছে। অতঃপর ত্রিবর্ণ কৌমুদীর দিকে ফিরিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আজ তোমার একটি কথা নেব, মা! বলত, জিত্‌লো কে—তুমি, না আমি ?"

কৌমুদীর মুখখানি সহসা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াই নামিয়া পড়িল।

ত্রিবর্ণ কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলিয়া উঠিলেন, "আবার

সেই পুরোনো লজ্জা ?" বলিয়াই কৌমুদীর মুখটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমিই বলি শোনো—তুমি ! কেন না—"

কঙ্কণকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "তোমারি খেলাঘরে ও আজ তোমারি পুতুল !"

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি বাহিনীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, "এঁদের দীক্ষা ?"

ত্রিবর্ণ স্মিতমুখে জবাব দিলেন, "প্রয়োজন নেই !" বলিয়াই মেয়েদের কাছে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "মা, তোমরা সজীব প্রকৃতি, দীক্ষা দেবার তোমাদের ওপরওয়ালা কেউ নেই ! কিন্তু—" পুরুষদের নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "এঁদের ভার নিয়ো তোমরা !"

মেয়েরা লজ্জায় মুখ নীচু করিতেই ত্রিবর্ণ পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, সিদ্ধার্থ—ওঁর নাম কেউ জান্‌তো না, যদি না গোপার অনুগ্রহ ওঁর ওপর পড়তো !"

একটি মেয়ের বিস্মিত মুখ দিয়া থাম্‌কা প্রশ্ন পড়িল, "গোপার অনুগ্রহ ?"

ত্রিবর্ণ শিশুর ন্যায় হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, মা !" পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হইয়া কহিতে লাগিলেন, "ইতিহাসে নেই ? তার কারণ—হয় ইতিহাস মেয়েমানুষের হাতে তৈরী হয় নি, নয় ফলের পরিচয়ে মানুষ গাছেরই নাম করে, মাটির কথা মুখেও আনে না !" একটু নীরব থাকিয়াই আবার সুরু করিলেন, "গোপা আঁচল থেকে চাবি খুলে না দিলে সিদ্ধার্থ বড়লোক হ'তে যে পার্‌তেন, একথা ইতিহাস বিশ্বাস করুক, কিন্তু—আমি করিনে ! আমি করিনে ! আমি বলি—গোপা ইতিহাসের উপেক্ষিতা !"

মেয়েটি যেন দুঃসহ হর্ষে বলিয়া উঠিল—"আমরাও তাই বলি, বাবা !"

"বল্‌বে বৈকি মা ! পুরুষমানুষকে এঁকে ছবি করবার রঙ্‌ তুলি তোমাদেরই যে হাতে। সুখে তাকে নিস্তেজ কর্‌তেও পারো, আবার দুঃখে তাকে মাতিয়ে দিতেও তোমাদের জোড়া মেলে না।" বলিয়া ত্রিবর্ণ আর দাঁড়াইলেন না।

কৌমুদীরও বুঝি বা আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল না। সেও যেমন ত্রিবর্ণের অনুসরণ করিতে পা বাড়াইবে, তাহার সম্মুখ দিয়া এক অশ্বারোহী ছুটিয়া গেল। কৌমুদী চম্‌কিয়া উঠিয়া চোখ তুলিতে দেখিল—একটু দূরে দৃষ্টির মাথায় এক বিরাট নর-বাহিনী তালে তালে পা ফেলিয়া সরিয়া আসিতেছে ! কাছাকাছি হইতেই টের পাইল—উহারা রাজ-পদাতিক, বিচিত্র সাজে সাজিয়া—প্রত্যেকের হাতে এক একটি করিয়া নানা রঙের পতাকা—প্রত্যেকটির গায়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা—"শ্রেষ্ঠ নাগরিকা —চিত্রা !"

অনন্তবিস্তারি আকাশ, তাহাকে ছাইয়া ঘন মেঘ একখানি—তাহার সঙ্গে আচম্‌কায় বিদ্যুতের আঁচড় পড়িলে যেমন হয়, ঠিক তেম্‌নি ধারা কৌমুদীরও মুখের চেহারা হইল এবং তন্মূহুর্তেই কঙ্কণের কাছে সরিয়া গিয়া চোখে চোখে ফেলিয়া সেইদিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই রাস্তায় যে-দিকটায় খালি, লোকজন ছিল না, সেইদিকে হেলিয়া পড়িয়া মিশিয়া গেল !

অতঃপর 'এক-পৃথিবী' নরনারীর 'পরলোক' হাতে করিয়া যে দেবদূত দাঁড়াইয়া, তাহার সম্মুখ দিয়া একে-একে চলিয়া গেল—এক বিরাট শোভাযাত্রা—রাজ-পদাতিক, অশ্বারোহী, তারপর এক উন্নতকায় শ্বেতহস্তীর পৃষ্ঠে বসিয়া নগরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকা !

চিত্রা !

চোখাচোখী হইল। হইতেই চিত্রা চোখ ফিরাইয়া লইল, যেন সহস্র সহস্র দর্শকের ন্যায় কঙ্কণও একজন অপরিচিত। কিন্তু, নামিল না কঙ্কণের চোখদুটি !

কঙ্কণ ! তাহার চোখের উপর এক শ্মশান, শ্মশানে মাত্র একটি চিতা, এই মাত্র জ্বলিয়াছে, আগে না—হু-হু করিয়া তারপর নিমেষেই নির্ব্বাপিত হইল ! * * * কঙ্কণ—তাহার মুখে হাসির একটু আভা পড়িল, পড়িয়াই বিলীন হইল। তারপর সে চোখ নামাইল—চোখের নীচে চেনা পথ, চেনা মাটি, চেনা গাছপালা, চেনা ঘর-বাড়ী ! তারপর পা বাড়াইয়া আস্তে-আস্তে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। তখন তাহার পশ্চাতের পৃথিবী একটু-একটু করিয়া দ্রব হইতে সুরু হইয়াছে।

মনে-মনে এক প্রশ্ন উঠে। মানব আত্মার এই যে চরম বিকাশ, হঠাৎ উহা ম্লান হইয়া পড়িল কেন এমন করিয়া ? হয় নাই—এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি—মানব সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আজিও ! তাই বলিয়াই বুঝিবা ত্রিবর্ণ নগরের নারীশক্তিকে

ধেড়োরা পুরুষের অভিভাবক করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু সে কথা এখন থাক্‌।

সন্ধ্যা হইয়াছে। চারিদিক ব্যাপিয়া প্রকৃতির কালোরূপ। কঙ্কণ রাস্তার একপাশ ধরিয়া একমনে চলিয়াছে। কতদূর গিয়াছে তাহা তাহার হুঁস নাই, হঠাৎ কাহার গায়ে পা পড়িল ! পড়িতেই সে চম্‌কিয়া পিছাইয়া আসিল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই এক যন্ত্রণা-কাতর নারীকণ্ঠে নিঃসৃত হইল—'মাগো !'

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি আবার সরিয়া আসিল। রাস্তার অন্যত্র আলো থাকিলেও সে-স্থানটায় ছিল গাঢ় অন্ধকার—গাছগুলা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লতাপাতায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কঙ্কণ বসিয়া পড়িয়া শায়িত দেহটাকে হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিয়াই ভীতি-ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ?"

"…—"

কঙ্কণ আর কাল বিলম্ব না করিয়াই সেই আর্ত্তব্যক্তিকে সযত্নে ধরিয়া বাহুর উপর উঠাইয়া লইল তারপর হাওয়ার ন্যায় আলোয় উড়িয়া আসিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াই অস্ফুট বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "নাগরিকা—"

নাগরিকার মাথাটি নীচের দিকে লট্‌কিয়া পড়িল।

কঙ্কণ চট্‌ করিয়া মাথাটা হাতের উপর রাখিয়া ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, "তোমার বাড়ী ?"

যে দিকে বাড়ী—নাগরিকা আস্তে-আস্তে হাত বাড়াইয়া সেইদিকে আঙুল দেখাইল।

কঙ্কণ আর অপেক্ষা করিল না, বিদ্যুৎবেগে নাগরিকার বাড়ী গিয়া উঠিল, তারপর আতুরার নির্দ্দেশ মত তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া আস্তে-আস্তে শয্যায় শোয়াইয়া দিল। দিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "লেগেছে খুব, নয় ?"

নাগরিকা চোখ বুজিয়া অস্ফুট শব্দ করিয়া যেন অসহ্য যন্ত্রণায় পাশ ফিরিল।

কঙ্কণের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। নাগরিকা যেদিকে ফিরিল, সেও সেইদিকে উঠিয়া গিয়া আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় লেগেছে ? কোন খানে ?"

নাগরিকা হাত দিয়া দেখাইল। যেখানে হাত পড়িল সে তাহার বুক।

কঙ্কণের মুখখানা একটিবার কাঁপিয়া উঠিয়াই স্থির হইয়া গেল, যেন মেয়েটির অঙ্গের ওই আঘাত সে তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লইয়া নিজের বুকেই সংস্থাপন করিয়াছে। তারপর মুখ দিয়া কহিবার কি কথা তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। দুই একবার মেয়েটির মুখে অকারণ দৃষ্টি ফেলিয়াই নেহাৎ আনাড়ির ন্যায় আপন মনে বলিয়া উঠিল, "রাস্তা—অন্ধকার—ওখানে কেউ শুয়ে থাকে ?"

নাগরিকা এইবার আস্তে-আস্তে চোখ খুলিয়া কঙ্কণের দিকে অবশনেত্রে তাকাইয়া কহিল, "হাঁট্‌তে যে আর পারিনি !"

কঙ্কণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইতেই নাগরিকা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া নিস্তেজকণ্ঠে পুনরায় বলিয়া উঠিল, "অনাহারে আছি—সাতদিন !"

"খাওনি কিছু ?"

"ভিক্ষে মেলে নি !"

ইন্দ্রালয়ের ন্যায় অট্টালিকা—যতদূর দৃষ্টি যায়, উহার প্রত্যেক অংশে কঙ্কণ বিস্ময়-দৃষ্টিতে তাকাইয়া হঠাৎ মেয়েটির দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি ভিক্ষে কর ?"

নাগরিকা মাথাটা এধারে ফিরাইয়া কঙ্কণের দিকে একটিবার তাকাইল—তাহার মুখে নিষ্প্রভ হাসি, তিক্ত এক অভিযোগের ! তারপর যেন কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়াই কহিল, "জানেন না আপনি ?" থামিল। একটু পরেই আবার সুরু করিল, "সন্ন্যাস নিয়েছে নগরের সবাই—আদর আমাকে কে আর কর্‌বে ?—একটু জল দিতে পারেন ?"—বলিয়াই কক্ষের এক কোণে আঙুল বাড়াইয়া একটা জলপাত্র দেখাইয়া দিল।

কঙ্কণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল এবং জল আনিয়া মুখে ধরিয়া পান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভিক্ষে কোথাও পেলে না কেন ?"

নাগরিকার মুখে জল লাগিয়াছিল। আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া যেন অবসরমতই ঈষৎ হাসিল—ম্লান ! কহিল—"আপনি শিশুর মতো অবোধ ! যেখানে ঘরে-ঘরে ভিক্ষু, ছেলেবুড়ো সকলে—ভিক্ষা কে কাকে দেবে ?" বলিতে—বলিতে মাথাটা বালিশ হইতে নীচে পড়িয়া গেল, যেন হঠাৎ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে।

কঙ্কণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি এ-পাশে আসিয়া মাথাটি ধীরহাতে বালিশের উপর তুলিয়া দিল, তারপর ঝুঁকিয়া কি বলিতে যাইবে, নাগরিকা হাত নাড়িয়া নিষেধ

করিল। একটু পরে পার্শ্বের একটি কক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "ওই ঘরে—আছে একটি, তার আধখানি—তার এক কুচি ফল—এনে দেবেন?"

"দিই" বলিয়া কঙ্কণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। করিতেই দ্বারদেশে, চৌকাঠের ও-পারে, নাগরিকার ঠিক চোখের উপর আর-এক মানব-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল, সে—নন্দন! তাহার চোখে অস্বাভাবিক এক পুলক, মুখে মারাত্মক চোরা-হাসি! নাগরিকার মুখেও তখন যেন ঘন ঘন বিদ্যুৎ খেলিয়া চলিয়াছে! কিন্তু সে ক্ষণিকের। মুহূর্ত্তেই আবার সে মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল এবং কি-এক আদেশ-কঠিন সঙ্কেত করিতেই নন্দন অদৃশ্য হইয়া গেল।

উনিশ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

রাত্রির কালো ছায়ার ন্যায় চিত্রা বাড়ী ফিরিল। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া মনে হইল, যেন সে টক্কর খাইয়া কোথায় মুখ থুব্‌ড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল, এইমাত্র উঠিয়া আসিয়াছে—মুখে খানিক কাদা জল। সটান উপরে উঠিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

কতক্ষণ কাটিয়াছে তাহার ঠিক নাই, মেঝের কাহার পদশব্দ হইতেই চিত্রা চম্‌কিয়া উঠিল। হাতে ভর দিয়া ঈষৎ উঠিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল—রাজা! দেখিয়াই আবার তেম্‌নি করিয়াই শুইয়া পড়িল।

রাজা অগ্রসর হইয়া একেবারে চিত্রার শয্যায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "এমন করে?"

চিত্রা উঠিয়া বসিল এবং মাথার কাপড়টা খুলিয়া ফেলিয়া রাজার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আপনি মদ খান?"

চিত্রার মুখের ঐ মুক্ত দৃশ্য, চোখের সেই অভিনব শ্রী রাজাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। কহিলেন, "খাই, যখন কেউ হাতে তুলে দেয়—তুমি দেবে?"

চিত্রা তৎক্ষণাৎ ও-ঘর হইতে একটি পাত্র ভরিয়া সুরা আনিয়া রাজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"চিত্রা—"

বাহির হইতে এক অস্থির কণ্ঠ ছুটিয়া আসিল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই নন্দন ঝড়ের ন্যায় কক্ষে প্রবেশ করিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

চিত্রা তখন সবে সুরার পাত্রটা রাজার মুখের গোড়ায় তুলিয়াছে, হাতের চাপ খুলিয়া পাত্রটা মেঝেয় পড়িয়া গেল। নন্দন ও মুখ নামাইয়া মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া নন্দনের আর পা উঠে না, যেন সে এক নিবাসহীন পান্থ, আশ্রয়ের নির্দ্দেশ নাই, যত্ন করিয়া ডাকিয়া আনিবে—এমন কোন আমন্ত্রণও নাই! সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে চোখের দৃষ্টি তাহার ঝাপ্‌সা ঠেকিতে লাগিল, হঠাৎ যেন এক ঝড় উঠিয়া চোখে ধূলা পড়িয়াছে। নীচে নামিয়া অঙ্গনে পা দিয়াছে, সহসা ঠিক পশ্চাতেই এক শব্দ হইল, চাহিয়া দেখিল চিত্রা—পায়ে কাপড় জড়াইয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। চোখের পলকেই চিত্রা উঠিয়া নন্দনের সুমুখে পড়িয়া গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌তে এসেছিলেন?"

নন্দন যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে! বিস্ময়ের ভাণে সসম্ভ্রমে কহিল, "আপনাকে?"

চিত্রা পথ ছাড়িয়া এক পাশে দাঁড়াইল।

নন্দনও পায়ে জোর দিল। কিয়দ্দূর গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল, যেন হঠাৎ কি মনে পড়িয়াছে। চিত্রার কাছা-কাছি হইয়া শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "ভাল কথা! এই কঙ্কণ—না থাক্!" আবার সে পিছন ফিরিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

চিত্রা নীরব অচঞ্চল, যেন কোথায় কার বাঁশী বাজিয়াছে, সেই দিকেই সে একমনে কাণ পাতিয়া।

কিন্তু এবার আর নন্দন পা বাড়াইল না। মুখ ফিরাইয়া আবার তেম্‌নি করিয়াই বলিয়া উঠিল, "কথাটা চল—নাগরিকা, তাকে চেনো ত? তারই ঘরে এক বিছানায়, মুখে মু—"

"মিথ্যে কথা!"—চিত্রার চোখ দিয়া এক ঝলক অগ্নিশিখা নির্গত হইল।

গঙ্গাজল আর তুলসী—এ যেন নন্দনের হাতেই! এম্‌নিই দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না—মিথ্যে নয়!" অতঃপর এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়াই আবার কহিল, "ভালোবাসা! চেন কি? নাগরিকা কত ভালোবাসে—জান তুমি?"

চিত্রার মুখখানা কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, "ভালোবেসেও তাঁকে আপন করতে পারি নি!

"দেখ্‌বে এসো!"—বলিয়াই নন্দন মুখ ফিরাইয়া রাস্তা ধরিল!

চিত্রা অকস্মাৎ থর্‌থর্ করিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিয়াই স্থির হইয়া গেল। তারপর দেখা গেল, তাহার দেহে স্পন্দন আসিয়াছে—চোখে এক চোখ জ্যোৎস্না! ধীরে ধীরে সে পা বাড়াইল, কোথায় যেন সে জানে না, কোথাই বা তাহাও তাহার অবিদিত, অথচ এখানে আর দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহার চলিবে না—যেন এই জন্মের পূর্ব্বে তাহার আর-এক জন্ম ছিল, সেই জন্মে বসবাস করিবার ছিল এক পত্রকুটীর, ধরিত্রীর একান্তে—আজ সেই দিকটাই হঠাৎ তার মনে পড়িয়াছে!

এম্‌নিই সময়ে পশ্চাৎ হইতে এক তীক্ষ্ণকণ্ঠের ডাক পড়িল—"চিত্রা!"

চিত্রা ফিরিয়া দেখিল—রাজা!

কাছে আসিয়া রাজা কহিলেন, "চল্‌লে কোথায়?"

যেন আনমন হইয়া আছে, এম্‌নি ভাব দেখাইয়া চিত্রা প্রত্যুত্তর দিল, "আমি? মেয়েমানুষ যেখানে যায়!"

অট্ট হাসিয়া রাজা কহিলেন, "গিয়ে লাভটা কি?—সেখানে ত' আর সুবিধে হবে না।" বলিয়াই চিত্রার মুখের কাছে মুখ আনিয়া এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "তোমারও নয়, নাগরিকারও নয়—গিয়ে দেখবে দ্বার বন্ধ!

চিত্রার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। রাজা সেই মুখের দিকে তেম্‌নি করিয়াই চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তা ছাড়া—"

কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামাইয়া আবার সুরু করিলেন, "এমন রূপ—ভিক্ষু—ভিখিরীদের জন্যে নয়! সে জ্ঞান আছে কি?—কে কার বুকে আগুন জেলেছে? এত বড় আমার বুকে এতদিন ছিল না, চিত্রা! হাতে করে তুলে দিয়েছ—তুমিই! সুতরাং নামিয়ে দেবার ভার আমার—নগরের নবীনা নাগরিকার নয়!"

চিত্রার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, মুখ দিয়া একটি কথাও কহিতে পারিল না।

রাজার মুখ ছুটিয়াছিল, তেম্‌নি করিয়াই আবার বলিয়া উঠিলেন, "মুখ রাঙা কোরো না—ওতে রূপ বাড়ে!" বলিয়াই পিছাইয়া গেলেন।

চিত্রার আপাদমস্তক টলিয়া উঠিল, তারপর সুমুখের দিকে একবার ঝুঁকিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যে রাস্তার অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

কুড়ি

দশজন একসঙ্গে সহজেই বশ হয়, কিন্তু পৃথকভাবে একজনকে হাতে আনা কত যে মুস্কিল, কঙ্কণ তাহা হাড়ে-হাড়ে বুঝিতে পারিল। এইমাত্র সে সমস্ত নগরবাসীকে এক কথায় বশ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু একা এই নাগরিকার কাছে সে হার মানিল। ফলের কুচিটা কাছে আনিতেই নাগরিকা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিয়া উঠিল, "ধ্যান উপাসনা বুঝি আপ্‌নাদেরই একচেটে?"

কথাটা কঙ্কণ বুঝিতে পারিল না। বিস্মিতনেত্রে নাগরিকার পানে তাকাইতেই সে বলিয়া উঠিল, "সকাল থেকেই রাস্তার-রাস্তার—অশুচি-বাস, ধুলো-পা, ইষ্টদেব্‌তার নাম নিইনি—এ কথা আপনি জানেন না?

কঙ্কণ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কি করে জান্‌বো?"

নাগরিকা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা জান্‌বেন কেন?" থামিল, যেন একসঙ্গে এতকথা কহিয়া হাঁপ ধরিয়াছে। একটু পরেই কহিল, "বলিনি আমি—ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিলাম?" তারপর যেন এক অভিমানের কটাক্ষ করিয়া সুরু করিল, "আমাদের মতন যারা ভিখিরী—আমার মতন—তারাই জানে, পরের বাড়ী আঁচল পাত্‌তে হ'লে নিজের অবসর মত বাড়ী থেকে বেরুলে চলে না—সব কাজ সেরে যাওয়া কি যায়?"

"তা হ'লে, সেরে নাও—"

নাগরিকার মুখ দিয়া ঈষৎ হাসি বাহির হইল—দুষ্টামির হাসি। কহিল, "হুকুম—এখ্‌খুনি তামিল করতে হবে!" পরক্ষণেই আবার অবসন্নার ন্যায় কহিল, "করতাম, যদি শক্তি থাকতো!"

"তবে?"

"এক কাজ করবেন? এই যদি—না থাক্—"

"বল না?"

"একটু উঠিয়ে আমাকে যদি বসিয়ে দেন!"

কঙ্কণ তৎক্ষণাৎ নাগরিকাকে সন্তর্পণে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিল। দিয়া কহিল, "এইবার—"

"এইবার হুকুম প্রতিপালন!" বলিয়াই নাগরিকা একমুখ হাসিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তপরেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "আর একটি—"

কঙ্কণের দৃষ্টি সপ্রশ্ন হইতেই নাগরিকা কহিল, "একটিবার বস্‌বেন আমার সুমুখে—বিছানায়?"

"কেন?"

"ধ্যানের রূপ একটি ত চাই!"

কঙ্কণ এইবার হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "সে কি আমি?"

"'আমি' মানে মহাশ্রেষ্ঠী 'কঙ্কণ' নয়, 'ভিক্ষু' শ্রমণ কঙ্কণও নয়!—অপরিচিত পথিক একজন; মাত্র রাস্তার লোক!" একটু চুপ করিয়াই নাগরিকা আবার আরম্ভ করিল, "কেন জানেন? চিরটা কাল অচেনা মানুষকেই ভালবেসে এসেছি! তাই ধ্যানের সময় রাস্তায় যাকে দেখ্‌তে পাই, তাকেই হাত ধরে এনে সুমুখে বসাই!"

কঙ্কণকে কে-যেন তখন কৌতুকের দোলায় চাপাইয়া দোল দিয়াছে। কহিল, "সত্যি?"

নাগরিকা নির্ব্বিবাদে জবাব দিল, "যা মনে করেন! সত্যি যদি মনে করেন—সত্যি! মিথ্যে যদি মনে করেন—মিথ্যে!" বলিয়াই একবার আড়চোখে চাহিল, চাহিয়াই আবার কহিল, "ভালোবাসা!—যাকে আমি ভালবাসি, তাকে যদি আর-একটু বেশী করে প্রাণ দিই অর্থাৎ—তারই রূপ স্মরণে নিয়ে যদি—ধ্যানে বসি, তাহ'লেই—দেবতালাভ! —ওকি, বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

কঙ্কণ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, তারপর মন্ত্রচালিতের ন্যায় নাগরিকার শয্যার উপর উপবেশন করিল, কাছাকাছি, মুখোমুখী—'ভক্তের' মনোমত!

নাগরিকা আর কঙ্কণ, কঙ্কণ আর নাগরিকা! নাগরিকা মুদ্রিতনেত্র, তন্ময়—স্থিরমূর্ত্তি! আর তাহারই অগ্রে বসিয়া কঙ্কণ—উৎকণ্ঠায় চঞ্চল, চোখ খুলিয়া কখন্ চাহিবে! যেন হিমালয়ের এক গোপন প্রান্তে এক পর্ব্বত-বালিকা তপস্যায় ভোর হইয়া আছে, আর তাহারই সম্মুখে তাহার আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তির কখন্ যে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা ওই মেয়েটি জানেই না!

দ্বার উন্মুক্ত ছিল, হঠাৎ কাহার পদশব্দ হইতেই কঙ্কণ ফিরিয়া দেখিল—চিত্রা!

চিত্রা!—সেই পুরাতন 'মহিমা!'

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া মুখ খুলিয়া কি বলিতে যাইবে, চিত্রা দুই হাত তুলিয়া শাসন-কঠিন চক্ষে নিষেধ করিল—'চুপ্!' পরক্ষণেই পা টিপিয়া-টিপিয়া নাগরিকার কাছে সরিয়া গেল, গিয়া মিনিটখানেক অপলক নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। প্রথমেই তাহার চোখে উঠিল ঝড়, তারপর—রৌদ্রের খরতেজ, তারপর—চন্দ্রের অনাবিল জ্যোৎস্না! তারপর—তারপর আস্তে-আস্তে বসিয়া পড়িল নতজানু হইয়া, আঁচল ফেলিয়া ধীরে ধীরে নাগরিকার পায়ের উপর মাথা রাখিল।

স্পর্শ পড়িতেই নাগরিকা চোখ খুলিয়া তাকাইল। বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "চি-ত্রা?"

চিত্রা স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল—"না—সতীন!"

নাগরিকার বুঝিবা আজ হাসিবার দিন, তাই হাসিয়া সারা হইয়া বলিয়া উঠিল, "তাই বুঝি এত ভক্তি?"

চিত্রা নির্ব্বিকারকণ্ঠে কহিল, "হিংসে!—যাঁকে আমি পাই নি, তাঁকে তুমি পেয়েছ!"

নাগরিকার মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। কহিল, "ও-কথার জবাব দেবে দেবতা!" বলিয়াই কঙ্কণের দিকে ফিরিল। তারপর তাহার প্রতি এক ভারি কটাক্ষ করিয়া একটি-একটি করিয়া কহিল, "মেয়েমানুষের পাঠশালায় না প্রাথমিক পাঠ পড়লে পুরুষ মানুষের পাঠশালা খোলা চলে না!" বলিয়াই আচম্‌কায় কঙ্কণের হাতটা চিত্রার হাতের উপর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ তোমার এই হাতে খড়ি—এইখানে!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাহিরে যেন এক প্রচণ্ড ঝড় উঠিল এবং চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই মূর্ত্তিমান বজ্রের ন্যায় প্রবেশ করিলেন রাজা, পশ্চাতে সশস্ত্র লোকজন। কক্ষের ভিতর পদার্পণ করিয়াই তিনি থম্‌কিয়া গেলেন—যেন পটে-আঁকা একখানি ছবি আর সুমুখেই তাহার—অনন্যসাধারণ চিত্রকর!

চিত্রার বুকটা উড়িয়া গেল। কঙ্কণের হাত হইতে নিজের হাতটা টানিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর উদ্‌ভ্রান্তার ন্যায় অগ্রসর হইয়া রাজার পথরোধ করিয়া বলিয়া

উঠিল, "আমি প্রস্তুত! এই নিন্—" আর্ত্তনাদ করিয়া রাজার পায়ের উপর আছড়িয়া পড়িল।

রাজা ঈষৎ পিছাইয়া গেলেন। তারপর পশ্চাতের লোকগুলাকে ইঙ্গিত করিতেই তাহারা নতশিরে অন্তর্ধান হইল। অতঃপর চিত্রার দিকে স্থিরচক্ষে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ একটু হাসিলেন—পলকমাত্র! তারপর মুখের চেহারা তেম্‌নিই শক্ত করিয়া কহিলেন, "আমার দণ্ড, আর তোমার উৎকোচ—এক নয়!"

চিত্রা মাথাটা একটু খাড়া করিয়াছিল, আবার উহা বুকের উপর লুটিয়া পড়িল। পরক্ষণেই সে নিজেকে যেন এক জোর টান দিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইয়া কি বলিতে যাইবে, বলিল না—তাহার মুখের উপর রাজার চোখের এক গুরুতর শাসন পড়িয়াছে! কণ্ঠ অধিকতর তীক্ষ্ণ করিয়া রাজা চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "রক্ত মাংস মেদ মজ্জা রূপ রং—সবই গড়ন—এ নিয়ে মেয়েমানুষ নয়!"

চিত্রা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তবে?" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল।

বর্ষার পর শরৎ, শরতের এক ঊষা, সেই ঊষায় পৃথিবীর উপর যেমন সোনালী আলো পড়ে, ঠিক তেম্‌নি ধারা আকস্মিক এক আলোকে রাজার মুখখানা চক্‌চক করিয়া উঠিল। সরিয়া আসিয়া চিত্রার সজল মুখের দিকে একটিবার চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "মেয়েমানুষ পৃথিবী গড়ে! অসম্পূর্ণকে পরিপূর্ণতা এনে দেয়!" বলিয়াই চিত্রাকে টানিয়া আনিয়া কঙ্কণের পাশে দাঁড় করাইয়া কহিলেন, "এইখানেই তোমার আসন!"

মুহূর্ত্তেই দ্বারদেশে সহসা যেন একখানি চাঁদ উঠিল। রাজা, কঙ্কণ, চিত্রা—সকলেই অবলোকন করিল—কৌমুদী! আর তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নন্দন।

নাগরিকা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন আচম্‌কায় তাহার ঘুম ভাঙিয়াছে! সহাস্যে দ্রুতপদে কৌমুদীর কাছে সরিয়া আসিয়া খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "এসো, ভাই!" তারপর হাত ছাড়িয়া পিছনে দাঁড়াইয়া আর-তিনটি যে মূর্ত্তি, তাহাদের দিকে একবার চাহিয়াই আবার মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "সব মাটি!"

কৌমুদী!—এক 'মৃত্যু-বাসরেই' বুঝিবা তাহার ডাক পড়িয়াছিল, কিন্তু—একি! * * * তাহার দুটি চোখই বড় হইয়া আর্দ্র হইয়া উঠিল, যেন বুকের ভিতরকার এক কঠিন পুলক দ্রব হইয়া চোখে পড়িয়া জমা হইয়াছে। ঝটিতি চোখের সে-ভাবটা পরিবর্ত্তন করিয়া রোষের ভাণ করিয়া নন্দনের দিকে চাহিল, চাহিতেই নন্দন থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি কিন্তু!" তারপর সেই মুখ আর-একজনের দিকে ফিরাইতেই নিমেষ-কঠিন এক কটাক্ষ পড়িল। নন্দন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল ও যেমন সে তাড়াতাড়ি মুখ নামাইবে কৌমুদী একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "থাক্! লক্ষ্মণের লজ্জা ঢাক্‌তে বসুমতী আর দ্বিধা হলেন না!" অতঃপর কঙ্কণের দিকে মনের মত একবার আড়-চোখে চাহিয়াই রাজার পানে ফিরিয়া হাত জোড়ে কহিল, "আপ্‌নাকে কিন্তু নমস্কার!"

রাজা তখন তন্ময় হইয়া তাকাইয়া ছিলেন আর একটি মূর্ত্তির পানে—নাগরিকার কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইতেই কৌমুদী কপালে হাত ঠেকাইল।

রাজাও প্রতি-নমস্কার করিলেন। তারপর আনমনে নাগরিকার কাছে সরিয়া গিয়া মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন; তারপর—তারপর কটিবন্ধ হইতে তরবারি খুলিয়া নিঃশব্দে মেয়েটির পদমূলে নামাইয়া রাখিলেন।

কঙ্কণ, চিত্রা, কৌমুদী, নন্দন—প্রত্যেককেই দৃশ্যটা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দোল দিয়া গেল। অত্যধিক বিস্ময়ে ও হর্ষে বিহ্বল হইয়া কঙ্কণ ছুটিয়া গিয়া রাজার হাত ধরিয়া কি বলিতে গেল, পূরাপূরি পারিল না। বুকের কোণ ভাঙিয়া মাত্র এইটুকুই বাহির হইল, "রাজা—"

রাজা নীচু হইয়া কঙ্কণের পদস্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশান্তকণ্ঠে কহিলেন, "না। আজ থেকে আমিও ভিক্ষু! কিন্তু, শিষ্য তোমার নই—" নাগরিকার প্রতি আঙুল বাড়াইয়া কহিলেন, "ওঁর!" বলিয়াই চিত্রার দিকে আড়চোখে তাকাইলেন।

চিত্রা বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল।

শেষ

আক্‌তার সাহেবের ব্যাঘ্র শিকার

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত

সন্ধ্যা কখন অতীত হয়ে গেছে। পৌষ মাস, শীতার্ত্ত-রজনী। পার্ব্বত্য অঞ্চল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। "একতারা"র ডাক-বাংলো ঠিক পাহাড়ের পাদপ্রান্তে। কপাট জানালা বন্ধ ক'রে একটী টেবিলের চারিপাশে জুটেছি কয়েকটী শিকারী-বন্ধু। গোটা আষ্টেক বন্দুক ও রাইফেল, একটা ছোট-খাটো যুদ্ধের উপযোগী গোলা-গুলি, আর দুই-একখানা নেপালী ভোজালী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কখন জল বন্ধ হবে তারই প্রতীক্ষা হ'চ্ছে। সমস্ত ঘরখানা উত্তেজনায় পূর্ণ। রাত বারোটায় বেরোব জঙ্গলে—তাই মাঝে মাঝে জানালা খুলে আকাশের অবস্থাটা দেখে নিচ্ছি। সমস্ত আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন। ক্বচিৎ বিদ্যুৎশিখায় গাঢ়তর হ'চ্ছে চতুর্দ্দিকের নিরন্ধ্র অন্ধকার।

গরম চায়ের সঙ্গে শিকার-প্রসঙ্গ আরও জমে উঠেছে। আক্‌তার সাহেব বর্ণনা করছেন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর শেষের বাঘ-শিকার। আমাকে ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। একদিন শিকার-সন্ধানে বনে-জঙ্গলে ঘুরে আমার কবি-বন্ধুর ইচ্ছানুসারে সেই রাত্রেই একতারা থেকে ফিরে এসেছিলাম। বর্ণনা হচ্ছে সেই রাত্রেরই অভিজ্ঞতা।

রাত তখন একটা। জমিদার সাহেব পূর্ব্বরাত্রের মত আজও শিকারে বেরিয়েছেন। টুরার কার, হুড নামান হয়েছে, সামনের উইণ্ডগ্লাসখানাও খুলে রেখে দেওয়া হয়েছে। শুধু বন্দুক চালানর সুবিধার জন্যই নহে। স্পট্ লাইট শিকারে এই কাচ খুলে না ফেললে আলোর রশ্মি কাচে প্রতিফলিত হয়ে মোটর-চালককে বিভ্রান্ত করে। বন্দুকের নিশানার জন্যও তার অপসারণ প্রয়োজন। এক পাশে দাঁড়িয়ে আক্‌তার সাহেব চতুর্দ্দিকে লাইট ফেলে জঙ্গলের জানোয়ার সন্ধান করছেন, আর এই লাইট সঞ্চালন ক'রে মোটর-চালককে রাস্তাও দেখাচ্ছেন। পথ ভুল হ'লে বিপদ অনেক। মোটরে চ'ড়ে স্পট্ লাইটের শিকার অভিজ্ঞ শিকারীদের চোখে হেয়। স্পট্ লাইটের শিকার নিন্দনীয়—কিংবা মাচায় বসে বাঘ শিকারই ধন্য, এখানে সে তর্ক তুলছিনে—যা ঘটেছে তা-ই বলছি।

তীব্র অলোক-শিখায় পাহাড়ের উপর এক জোড়া বড় চোখ জ্ব'লে উঠেছে। দুই চোখের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট। আক্‌তার সাহেবের বিভীষিকা-ভরা চাপা-গলার আওয়াজ শোন —"টাইগার—টাইগার, গো অন্।" শিকারী সাহেব বলেন, "ওটা শেয়াল!" কিন্তু অভিজ্ঞ আক্‌তার সাহেবের ভুল হয় না। বাঘের চোখে স্পট্ লাইট প্রথম মনে হবে লাল—তার পরে নীল। তারপরে চোখ বন্ধ করে দেবে। যখন চোখ খুলবে আবার সেই, প্রথমে মনে হ'বে উজ্জ্বল লাল, তার পরেই নীল। আক্‌তার সাহেবের উত্তেজিত ড্রাইভারের ঔদাসিন্যে ক্রুদ্ধ—বার বার জিদ করছেন "গো অন্"—এগিয়ে চল। ড্রাইভার নিশ্চল। হঠাৎ রাইফেলের আওয়াজ, পর পর দুবার। সাহেব গুলি ছুঁড়েছেন—সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গর্জ্জন। রাইফেলের আর বাঘের হুঙ্কারে পাহাড় যেন কাঁপছে। আক্‌তার সাহেব বধির। একটা রবারের নলের সঙ্গে নিকেলের চোঙ লাগান। কানে নলটা লাগিয়ে চোঙে মুখ রেখে কেউ চেঁচিয়ে কথা বললে তিনি শুনতে পান। এই ব্যবস্থা না হ'লে তিনি রাইফেলের আওয়াজও শুনতে পান না। এবারেও রাইফেলের শব্দ তিনি শোনেননি—কিন্তু রাইফেলের ব্যারেল নিঃসৃত দীর্ঘ অগ্নিশিখা তিনি দেখেছেন। বাঘের উল্লম্ফন তাঁর চোখে পড়েছে। চেঁচিয়ে আবার হুকুম দিলেন, "গো অন্!" শিকারে আক্‌তার সাহেবের আদেশ অলঙ্ঘ্য—কিন্তু সোফার মালিকের আদেশে গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে দিলে। মোটর ছুটে চলল—ক্রোশ দুই দূরে বস্তী অভিমুখে। আক্‌তার সাহেব লাইট বন্ধ ক'রে মোটরে দেহ এলিয়ে দিলেন। দারুণ হতাশায় ও রোষে বাক্যহারা।

দুপুর রাতে জমিদার সাহেবের ত্রস্ত আবির্ভাবে বস্তিখানি চঞ্চল। উত্তেজিত, কিন্তু প্রায় সকলেই নির্ব্বাক।

মাঝে মাঝে এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে গুঞ্জিত হ'চ্ছে সাহেবের বিলাপ। দুঃখ তাঁর দুঃসহ। বহু বৎসরের বহু ব্যর্থতার পরে এই তাঁর প্রথম সার্থক প্রয়াস। বাঘ ঘায়েল, কিন্তু তাহা সহজলভ্য নহে। খড়-শয্যায় অর্পিত দেহ আক্‌তার সাহেব ভোরের দিকে জানালেন—হুজুরের হুকুম হ'লে তিনি বাঘের সন্ধানে যাবেন। একটী মাত্র সঙ্গী চাই। ইঙ্গিতে ইসারায় এই বধির শিকারীকে বাঘের চলাচল জানিয়ে দেবে। "বাঘ ঘায়েল হ'লে অনুসরণ করা হবে না" এই ছিল হুজুরের হুকুম। আজ বাঘ হাত ছাড়া হওয়ার লোভে তাঁহার সঙ্কল্প শিথিল হ'ল। তিনি জানালেন, তাঁর আপত্তি নাই। কিন্তু সঙ্গে যাবে কে? এই দারুণ বিপদকে বরণ ক'রে কে হ'বে আক্‌তার সাহেবের মৃত্যু-পথের সাথী। কেউ রাজী হ'ল না—হুজুর ত নিশ্চয়ই নন। অনেকেরই জরুরী কাজ আছে—কারও বা তবিয়ৎ খারাপ। একটা লোক এই দল থেকে দূরে তৃণাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে চাদর মুড়ি দিয়ে তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছিল। আহ্বান কাছে পৌঁছতেই সে এগিয়ে এল। সে পুনোয়া। এমন অনেক দুঃসাহসিক অরণ্য-যাত্রায় সে আক্‌তার সাহেবের পার্শ্বচর। গায়ের রং কালো, দোহারা চেহারা, মাথায় নাতি-দীর্ঘ রুক্ষ চুল—চোখ দুটো অনবরত লাল। তাড়ি খেয়ে বেহুঁস না হ'লে পুনোয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত। তিন ক্রোশ দূরে শিকারের আয়োজন হচ্ছে, কখন্ নিঃশব্দে পুনোয়া এসে দলে ভিড়ে গেছে। কখন্ সে খবর পেয়ে তিন ক্রোশ অতিবাহন ক'রে এসেছে, ভেবে আমরা বিস্মিত হয়েছি।

পুনোয়া বেছে নিলে একটা উনচেস্টার রাইফেল, আর আক্‌তার সাহেব নিলেন হল্যাণ্ড এণ্ড হল্যাণ্ড ডাব্‌ল ব্যারেল। এই দারুণ শীতেও আক্‌তার সাহেব গায়ের গরম সেরোয়ানী খুলে ফেললেন। গায়ে রইল খাকি শার্ট, আর পরণে ব্রিচেশ। কামিজ ব্রিচেশের ভিতরে গুঁজে নিয়ে স্মার্ট সাজা তাঁর আসে না। হ্যাট তাঁর মাথায় কখনও দেখিনি। পকেটে একখানা সুতীক্ষ্ণ ছুরী—হাতে রাইফেল। পুনোয়ার গায়ে মলিন কামিজের উপর একটা লাল র‍্যাপার। বাঘ শিকারে ইহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী, রেড্ র‍্যাগ্ টু এ বুল্-এর মত রেড্ র‍্যাগ্ টু এ টাইগার্ সমানই উত্তেজক।

সকলেই মোটরে উঠেছে। কতকটা রাস্তা মোটরে যাওয়া যাবে—তারপর মোটর ছেড়ে আক্‌তার ও পুনোয়া যাবে বাঘের সন্ধানে—গহন অরণ্যে। আক্‌তার সাহেব জানিয়ে দিলেন—বন্দুকের ঘন ঘন আওয়াজ শুন্‌লে বুঝ্‌তে হবে বিপদ হয়েছে। আহত হ'লে তার দেহটা হাসপাতাল পর্য্যন্ত টেনে যেন নিয়ে যাওয়া হয়। বিপদ অনিবার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

যেখানে বাঘ গুলি বিদ্ধ হ'য়ে গর্জ্জন ক'রেছিল সেখানে রক্ত জমাট হয়ে আছে। এবারে রক্তের দাগ দেখে সুরু হ'বে বাঘের অনুসরণ। এ এক বিষম ব্যাপার। রাইফেল বাগিয়ে রেডি হ'য়ে সামনে এগিয়ে যেতে হ'বে—নিঃশব্দে, রুদ্ধশ্বাসে। কথাবার্ত্তা চল্‌বে না। সংবাদ আদান-প্রদান হবে ইঙ্গিতে, চোখের ইসারায়, গা টিপে। চোখ থাক্‌বে একাগ্র, শ্রুতিপথ উদগ্র। শুষ্ক পত্রের মৃদু শব্দটুকুও না এড়ায়। একটী অসতর্ক পদক্ষেপ, এক লহমার ভুলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এতবড় বিশাল দেহ বাঘ এতটুকু লতা-গুল্মের অন্তরালে বেমালুম লুকিয়ে যায়—শিকারীর তীক্ষ্ণ নজরে তাকে খুঁজে পায় না। বাঘের সন্ধানে এটা সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিস্ময়। আর বাঘের এই অদ্ভুত আর নিঃশব্দ আত্মগোপনের জন্য কত শিকারীই না অকালে প্রাণ হারিয়েছে!

আক্‌তার সাহেবের পক্ষে এই রকমের দুঃসাহস এই প্রথম নয়। এর বিপদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট। এরূপ এবং আরও অনেক প্রকারের অভিজ্ঞতা! হরিণ শিকার করতে গিয়ে বাঘ বেরোল—একটার পরে একটা, তার পর আরও একটা। আহত শার্দ্দূল বিরাট হাঁ ক'রে দীর্ঘ উল্লম্ফনে ছুটে এসেছে একটুখানি লতাপাতার আড়ালে উপবিষ্ট আক্‌তার সাহেবের দিকে। পাশের সঙ্গী দারুণ আতঙ্কে বেহুঁস হয়ে প'ড়ে গেছে। কিন্তু আক্‌তার সাহেব অটল। স্থির লক্ষ্য। ভয়লেশহীন তাঁর মুখখানা মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে সংকল্পে কঠিন হয়েছে, কিন্তু স্থৈর্য্য হারায় নি। কিন্তু আজিকার এই শিকার-যাত্রায় মনে হ'চ্ছে তিনিও একটুখানি বিচলিত। রবারের নল আর চোঙ্‌টা কোন কাজেই আসবে না। শিকারে আর যে কোন শব্দ যদিই বা চলে, মানুষের একটুখানি কথাবার্ত্তার শব্দ জানোয়ারের কানে বিশেষ অর্থপূর্ণ, অদ্ভুত বিপদের ইঙ্গিত। আক্‌তার সাহেব গম্ভীর, পুনোয়া উদাসীন। রক্তলোভী অদৃশ্য ব্যাঘ্রের বিরুদ্ধে এই

দুটী মাত্র লোক। চেহারা নেহাৎ সাধারণ। ব্যাঘ্রের বিশাল দেহের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

দুর্ভাগা দেশ, দুর্ভাগ্য তার পরিস্থিতির। আহত শার্দ্দূলের সঙ্গে লড়াই-এ যে এগিয়ে যাচ্ছে—অরণ্যের সেই মৃত্যুভয়হীন সাহসী বীর লোকালয়ে চৌকীদারের সম্মুখে তটস্থ—জমিদারের পিয়াদার ভয়ে অঞ্চলস্থ। ভাব্‌ছি এর জন্য জবাবদিহি কার? দেশের নেতৃদের, না জমিদারদের? এরা অন্নহীন কাঙাল। শীত বর্ষায় মাথা রাখবার ডেরাটুকুও নাই। বস্ত্রাভাবে দেহ অর্দ্ধনগ্ন। পুরুষানুক্রমে নিরক্ষর। প্রতিবাদ জানে না—আশার উত্তেজনা নাই। এই মৌন পুরুষকার নিঃশেষ হ'চ্ছে রোগের পীড়নে—পিয়াদার তাড়ায়। শুধু একতারায় নহে, চাত্রায় দেখেছি, পালামৌতে দেখেছি, শিঙ্গারে দেখেছি—সশারামে, আরও কত জায়গায়। শিঙ্গারের ধুন্ন সিংকে মনে পড়ে। এই ক্ষীণ-দেহ লোকটী রয়াল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে লড়েছে—বাঘের করল থেকে ছিনিয়ে আনত আক্রান্ত মোষকে। বাঘের দাঁত ও নখের ছিন্নভিন্ন তার দেহটা তীব্র এসিডে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেমন ক'রে এই ছাতুতে গড়া প্রাণটা তার রক্ষা পেল! সর্ব্বাঙ্গে গভীর ক্ষত নিয়ে এই লোক সেদিন থেকে প্রত্যেক বাঘশিকারীর সঙ্গী। সেই লড়াই-এর পরে বুঝি তার সঙ্কল্প হয়েছে—তার আর বাঘের একই অরণ্যে স্থান অসম্ভব। একজনকে বাঁচতে হ'লে আর একজনকে জায়গা ছেড়ে দিতে হ'বে। এই জঙ্গলে আর একটী লোক ল'ড়েছিল—ভালুকের সঙ্গে। তার মুখে চোখে ভালুক দাঁত ও নখরের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। জীবনান্ত পর্য্যন্ত তার এই বীভৎস চেহারা ভালুকের হিংস্রতার সাক্ষী হ'য়ে থাকবে। আজ সে অতি বৃদ্ধ, কিন্তু প্রত্যেক শিকারে সে অগ্রগামী। বনের বাঘ-ভালুকের কাছে এরা নির্ভীক, কিন্তু জমিদারের পিয়াদার কাছে এরা ভয়ে বিমূঢ়।

যেখানে খানিকটা রক্ত জমাট হ'য়েছিল—অনুসন্ধানে তার আশে পাশে পাহাড়গাত্রে সামান্য ধূলায় বাঘের পা ও নখরের দাগ পাওয়া গেল। আক্‌তার সাহেব নিবিষ্ট হ'য়ে পায়ের দাগ ও রক্ত দুইই পরীক্ষা ক'রে পুনোয়াকে রাস্তা নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন। মাঝে মাঝে রক্তের দাগ তাঁদের রাস্তা দেখাচ্ছে। প্রায় একশত গজ এমনি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলে হঠাৎ পুনোয়ার গতিরুদ্ধ হ'ল। আক্‌তার সাহেবের দিকে তাকিয়েই তাঁর রাইফেলের মুষ্টি দৃঢ়, আর সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ল। ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লেন। তার পর রাইফেল নামিয়ে কি একটা পরীক্ষায় ব্যস্ত হ'লেন। সেখানে আবার খানিকটা রক্ত, এবারে টাট্‌কা রক্ত। পুনোয়াকে বুঝিয়ে দিলেন বাঘ ঘায়েল বটে, কিন্তু অশক্ত নয়। ফুসফুসে আহত হয় নাই। রক্ত ফেনযুক্ত (frothy) নহে। খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে এগোতে হ'বে। তাঁরা বাঘকে দেখ্‌তে পাবে না বটে, কিন্তু খুব সম্ভব বাঘ তাদের গতিবিধি দেখ্‌তে পাবে। এই মাত্র বাঘ এইখানেই শুয়েছিল—তাজা রক্ত তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। অনুসরণকারীদের সাড়া পেয়ে এই মাত্র বিরক্ত হয়ে উঠে গেছে।

আবার নিঃশব্দে অনুসন্ধান সুরু হ'ল। এবার আরও সতর্ক। মাথা সামনে ঝুকিয়ে রাইফেলে অদৃশ্য বাঘকে লক্ষ্য ক'রে নতজানু হ'য়ে এই কণ্টকাকীর্ণ প্রস্তরময় পথে এগিয়ে চলা কতটা দুঃসাধ্য তা এই কার্য্যে অভ্যস্ত ব্যক্তি ছাড়া কাহারও অনুমান করা অসম্ভব। খানিকটা এগিয়ে যেতেই এই শীতের প্রভাতেও তাঁরা স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছেন। কাঁটায় তাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার তাঁদের অবসর নাই।

কিসের একটু শব্দ, পুনোয়া ইসারায় জানালে। উত্তেজনায় তাঁদের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছে একটুখানি শুষ্ক পাতায় পায়ের শব্দ। উভয়ের রাইফেলের দৃষ্টি এবার দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে—এবার শুষ্ক লতাপাতা দেখেও বাঘ ভ্রম হ'চ্ছে। তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে তাদের চোখ যেন ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। কিছুই দেখা গেল না; কিন্তু এরা ঠিক বুঝতে পারলে বাঘ থেকে এদের দূরত্ব বেশী নয়। চড়াই পথে চলেছে। উভয়ে অবাক হ'ল। বাঘ ক্ষীণবল হ'লে এই চড়াই পথ ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত সমতল রাস্তা বেছে নিত।

আহত ব্যাঘ্রের অনুসরণ কতটা বিপদসঙ্কুল তার দীর্ঘ বর্ণনা অনাবশ্যক। শুধু এটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হ'বে যে আড়াল থেকে নিদ্রিত বাঘকে গুলি করা চলে, কিন্তু শায়িত না থাকলে শিকারীর হাতে বন্দুক থাকা বা না-থাকার মধ্যে পার্থক্য অতি যৎসামান্য। জঙ্গলের চারিপার্শ্বে সমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাও যেমন অসম্ভব, লুক্কায়িত বাঘকে অকস্মাৎ দেখ্‌তে পাওয়াও তেমনি ভাগ্যের উপরেই

নির্ভর করে। অরণ্যে একটুখানি শব্দ আর বাঘের উল্লম্ফন ও অতর্কিতে আক্রমণ এতই সহসা ও ক্ষিপ্র হওয়া সম্ভব যে অনুসরণকারীদের গুলি করার অবকাশ থাকে না। তবু আমাদের শিকারীদ্বয় এগিয়ে চলেছেন। ফলাফল অনিশ্চিত। হয়ত বাঘ নিহত হ'বে অথবা তার দংষ্ট্রাঘাতে প্রাণ দিতে হ'বে; নিদেন পক্ষে চিরতরে বিকলাঙ্গ হ'য়ে বিড়ম্বিত জীবন যাপন।

শিকারীদ্বয় এগিয়ে চলেছেন। অগ্রগমনের ভঙ্গী থেমেনি। দ্বিপ্রহর কখন পেরিয়ে গেছে। ক্ষুৎপিপাসা বোধের সময় নাই—দেহ শ্রান্ত কিন্তু সঙ্কল্পে তাঁরা অটল। কোথাও একটু শব্দ হয়ত জানোয়ারের একটা কল্পিত নিঃশ্বাস তাঁদের সাম্‌নে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, অরণ্য থেকে অরণ্যান্তরে। এক সময়ে তাঁরা সভয়ে দেখ্‌তে পেলেন বাঘ তাঁদের কালীপাহাড়ীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বাঘ কালীপাহাড়ী পৌঁছিতে পারলেই তার সন্ধান অসম্ভব। আবার কি একটু শব্দ শোনা গেল—এক টুকরো পাথর গড়িয়ে নীচে পড়েছে। মনে হ'ল চড়াই পার হ'য়ে বাঘ এবার উৎরাই ধরেছে। তারই পায়ের আঘাতে এক-টুকরো পাথর গড়িয়ে নীচে পড়েছে। এ তারই শব্দ।

এ স্থানটা ছোট ঝোপঝাড়, লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। একবার মনে হ'ল, দূরে ঝোপের ভিতর দিয়ে একটা বড় জানোয়ার এগিয়ে চলেছে। লতাগুল্মে তারই আন্দোলন। তারপর লতাগুল্মের সে আন্দোলনও থেমে গেল। জঙ্গল ঘন হ'য়েছে, বাঁয়ে অদূরে কালীপাহাড়ীর গম্বুজায়িত চূড়া চোখে পড়্‌ছে। অরণ্য-পথ ক্রমেই ক্ষীণ হ'য়ে এল—এখন আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না—অনেক দূর পর্য্যন্ত রক্তের চিহ্নও দেখা যায়নি। শিকারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। আক্‌তার সাহেব বাম হাতে কপালের ঘাম মুছে নিলেন। আশে-পাশে, ডাইনে ও বাঁয়ে স্বতন্ত্রভাবে দুজনে রক্তের সন্ধানে নিবিষ্ট হলেন। রক্তের দাগ হারিয়ে ফেললে আজকের অভিযান ব্যর্থ। আর একটা আশঙ্কা প্রবল হ'তেই আক্‌তার সাহেব পুনোয়াকে ইসারায় ডেকে নিলেন। কাছেই কোথাও বাঘ লুকিয়ে নেই ত? এমন বেসামাল হ'য়ে অনুসন্ধান চলবে না—তাতে অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও প্রচুর। আক্‌তার সাহেব খানিকটা ভেবে কর্ত্তব্য স্থির করে নিলেন। পুনোয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, জল কত দূরে? পুনোয়া জানালে, অর্দ্ধ মাইলের ভিতরেই জল আছে। ঝরণার একটুখানি ক্ষীণধারা সেখানে প্রস্তর বালির মধ্যে জমা হচ্ছে। সমুদ্রে দিকহারা নাবিক যেমন ধ্রুবতারা দেখ্‌তে পেয়ে উল্লসিত হয়, আক্‌তার সাহেবেরও বিবর্ণ মুখখানা জলের সন্ধান জেনে তেম্‌নি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তৃষ্ণা নিবৃত্তির সম্ভাবনায় নয়—বাঘের লক্ষ্যস্থল যে জল তাতে সন্দেহ নাই। জলের দিকে যাওয়ার সহজ রাস্তাটা ধ'রে আবার তাদের যাত্রা সুরু হ'ল। খানিকটা দূরে যেতেই পুনোয়া ঝুঁকে প'ড়ে কি দেখ্‌লে—তারপরে একটা শুক্‌নো পাতা তুলে আক্‌তার সাহেবকে দেখালে। পাতার উপরে এক বিন্দু তাজা রক্ত। চল,

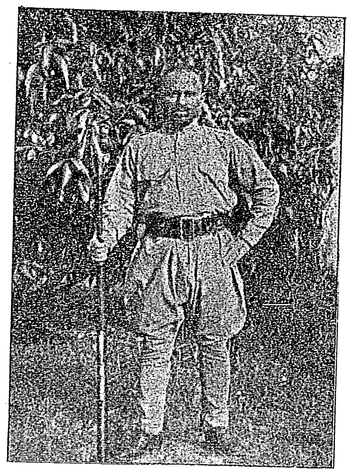

নবী আক্‌তার (বিহারের প্রসিদ্ধ বাঘ শিকারী)

এগিয়ে চল—সাবধানে সন্তর্পণে। আবার সেই উৎকর্ণ অভিনিবেশ; রুদ্ধশ্বাস, চকিতদৃষ্টি, রাইফেলের লক্ষ্য। কতক্ষণ এইভাবে খোঁজা হ'ল কারুরও হুঁস নাই। শীতের সূর্য্য কখন মাথার উপর থেকে স'রে গেছে। বনের ভিতরে অপরাহ্নের ঈষৎ তরল অন্ধকার দ্রুত নেমে আস্‌ছে। এবারে উভয়ের বেশ শীত বোধ হচ্ছিল। ঘড়ি খুলে দেখা ফেল বেলা চারটা। আক্‌তার সাহেবেরও গতি রুদ্ধ হ'ল। আর এক ঘণ্টায় সমস্ত বনভূমি অন্ধকারে ডুবে যাবে—ফিরে যেতে হ'বে যে! একটী টর্চ্চও সঙ্গে নেই। রাইফেল নামিয়ে এবারে তারা ফেরবার পথ সন্ধানে ব্যস্ত হ'ল। জঙ্গলে রাস্তা একটু ভুল হ'লে সে ভুল সংশোধন কত কষ্টসাধ্য—

যারা পাহাড় অরণ্যে অভ্যস্ত নয় তাদের পক্ষে ধারণা করাও অসম্ভব। কিন্তু আশৈশব জঙ্গলের মধ্যে বাস করেও আজ উভয়ের বার বার রাস্তা ভুল হচ্ছিল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে—জঙ্গলের রাস্তা ক্রমেই অস্পষ্ট হচ্ছে। একটা কি জানোয়ার হঠাৎ তাদের ঠিক সাম্‌নে উপস্থিত হয়েই ছুটে পালাল। ওটা বন-শুয়োর হ'বে। হাতে রাইফেল আছে, কিন্তু এদিকে ভ্রূক্ষেপ করার তাদের অবসর নাই। আজ কত রাত জঙ্গলে কাটাতে হ'বে কে জানে—জঙ্গল থেকে বেরুতে পারবে কি-না তারই বা নিশ্চয়তা কি? হঠাৎ বৃক্ষশীর্ষে স্পট্ লাইটের আলোক রেখা দেখা দিল। মোটরের হর্নও শোনা গেল। আশ্বস্ত হ'য়ে উভয়ে হর্নের শব্দ লক্ষ্য করে অগ্রসর হ'লেন।

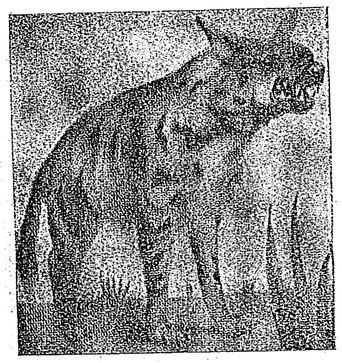

হায়না

মোটরে যখন তাঁরা পৌঁচেছেন—তখন অনেকটা রাত হয়েছে। মোটরে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লিষ্ট—দীর্ঘ প্রতীক্ষায় অসহিষ্ণু। উৎকণ্ঠারও অবধি ছিল না। আক্‌তার সাহেব পৌঁছতেই অসংখ্য প্রশ্ন তাঁকে করা হ'ল। এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া তিনি অনাবশ্যক বোধ ক'রে ডাক-বাংলার দিকে গাড়ী চালাতে আদেশ করলেন। পুনোয়া প্রশ্নের উত্তরে হাত তুলে আক্‌তার সাহেবকে দেখিয়ে দিল।

জমিদার সাহেব বিষণ্ণ। "চা লাও"—"খানা জলদি" এ গর্জ্জন আর শোনা যাচ্ছে না। খানসামা বাবুর্চ্চি ভৃত্যের অভাব নেই—কিন্তু সকলেই নির্ব্বাক। পুনোয়া সাহেবের জন্য চায়ের কথা বলতেই সকলের চৈতন্য হ'ল। চা এসেছে, আক্‌তার সাহেব একটা আরাম কেদারায় শুয়ে চোখ বুজে। হয়ত তাঁর দু চোখ ভ'রে জ্বলে উঠেছে গত রাত্রে স্পট্ লাইটে উদ্ভাসিত এক জোড়া বড় চোখ—দুটো মশালের মত।

সাহেব লেপের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন। চা ও নাস্তা যখন টেবিলে রাখা হ'ল তিনি বেরিয়ে এলেন। বাঘের জন্য হতাশা আর বিলাপের অন্ত নাই। আক্‌তার সাহেব তাঁর অনুসন্ধানের কাহিনী বর্ণনা ক'রে জানিয়ে দিলেন, ভোর হ'লে তিনি আবার বাঘের সন্ধানে যাবেন। বাঘের আশ্রয়স্থল নির্ণীত হয়েছে, তিনি ভরসা করছেন এ চেষ্টা তাঁদের সার্থক হবে। উপসংহারে শুধু এইটুকুই বললেন, বাঘ নজরে এলে হয়—বাঘ অথবা আক্‌তার সাহেবের মৃতদেহ তিনি ফিরে পাবেন। কিন্তু বাঘ যদি কালী-পাহাড়ীতে অদৃশ্য হয় তিনি নাচার। আক্‌তার সাহেবের দৃঢ়সংকল্পের অনেক পরিচয় তিনি পেয়েছেন। আশ্বস্ত হ'য়ে তিনি লেপ আশ্রয় করলেন। আক্‌তার সাহেব চোখ বুজে প্ল্যান করছেন আগামী অভিযানের। সকলেই আহারের প্রতীক্ষা করছেন। সমস্ত বাংলো নিঃশব্দ। কপাট জানালা বন্ধ। রুদ্ধদ্বার বাংলোর বাইরে খোলা বারান্দায় একাকী উপবিষ্ট পুনোয়া। নিদ্রা তার একান্ত প্রয়োজন ও আবশ্যক। সকলের আহারের পরে তার ভাগ্যে এক মুঠো জুটবে কি-না কে জানে।

তার চোখের সাম্‌নে অদূরে অন্ধকার গাঢ়তর ক'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে একতারার পাহাড়। উচ্চ পাহাড়ের কোন অদৃশ্য গহ্বর থেকে উৎক্ষিপ্ত জলধারা সশব্দে প্রতিহত হ'চ্ছে পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়ের শীর্ষ থেকে শীর্ষান্তরে আছাড় খেয়ে সে স্রোত নেমে এসেছে ধরণীর বুকে। বাংলো থেকে তার শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু দিনের বেলায় পাহাড়গাত্রে তার জল-প্রবাহ চোখে পড়ে। এই ঝরণা থেকে দিকে দিকে বেরিয়ে গেছে কত স্রোত-ধারা। এরই একটা ধারা ব'য়ে এসেছে ডাকবাংলোর ঠিক সম্মুখে। আর একটা বয়ে যাচ্ছে সশব্দে ডাকবাংলোর পশ্চাৎভাগে। এই দুই ধারার মিলন হয়েছে বাংলোর দক্ষিণ প্রান্তে, যেখানে অরণ্যের প্রথম আভাস হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে পথিককে, ঘন অরণ্য আর ঝর্ণার দিকে। ঐ ঝর্ণায় যেখানে উৎস পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখর—

সেখানে বাস করে বিশালকায় সম্বর, মৃগ, ভালুক, বন্য-বরাহ, শার্দ্দূল আর চিতা। এমনি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে চিতা বাঘ নেমে আসে শস্যক্ষেত্রে মৃগের সন্ধানে, সুপ্ত পল্লীর আশে পাশে ভেড়া-ছাগলের রক্ত-লোভে। মাঝে মাঝে নৈশ নীরবতা ছিন্ন করে ক্যানেস্তারা, কাড়া, নাকাড়া বেজে ওঠে। বস্তির লোক হুঁসিয়ার হয়—বস্তিতে বাঘ ঢুকেছে। কোথায় আকের ক্ষেতে ভুট্টার ক্ষেতে বাঁশের তৈরী মাচা থেকে টিনের শব্দে প্রান্তর ধ্বনিত হয়, ভালুকের গ্রাস থেকে বাঁচাতে ফসল। পুনোয়া অরণ্যের অন্ধকারের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে—হয়ত বহু রজনীর বহু দুঃসাহসের স্মৃতি তার মনকে আলোড়িত করছে।

যখন আহারের পালা শেষ হল তখন রাত প্রায় শেষ হ'য়েছে। ড্রাইভারকে আদেশ করা হ'ল, আধ ঘণ্টার মধ্যে মোটর চাই। শিকারীরা একটা জলের কেরিয়ার সঙ্গে নিলেন। রাইফেল, গুলি, গোলা—আর একটা বড় ভোজালি। আজ হয়ত বাঘের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ, হয়ত বা এই শেষ শিকারযাত্রা, কে জানে।

গ্রাম্য শিকারীদের আহ্বান করা হ'ল। আক্‌তার সাহেব তাঁর আজকার প্ল্যান তাদের বুঝিয়ে দিলেন। তাদের বাঘের অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, গাছে চ'ড়ে ডা'নে বাঁয়ে বাঘের গতি জানিয়ে দিতে হ'বে আক্‌তার সাহেবকে। বাঘ সামনে না গিয়ে অন্য দিকে গেলে যারা গাছে থাকবে, হাঁক্ ডাক্ ক'রে বাঘকে তারা সম্মুখের দিকে তাড়া করবে। আক্‌তার সাহেব আর পুনোয়া এগিয়ে যাবেন বাঘের সম্ভাবিত আশ্রয়স্থান পশ্চাতে রেখে সাম্‌নে। পিছন থেকে তাড়া খেয়ে বাঘ ছুটে এলে আক্‌তার সাহেব তাঁর কর্ত্তব্য করবেন। বাঘের আশ্রয়স্থান জান্‌তে পেলে এই ব্যবস্থাই উত্তম। আক্‌তার সাহেব সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছেন—বাঘ ঝর্ণার জল পান ক'রে তারই নিকটের ঘন জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।

পূর্ব্ব দিন আক্‌তার সাহেব আর পুনোয়া অক্ষত দেহে অরণ্য থেকে ফিরে এসেছে, রাত্রে জঙ্গলে পথ অতিবাহন করেছে। এই ঘটনায় অনেকেই আশ্বস্ত হ'য়ে এগিয়ে এল। এদের যথাযোগ্য উপদেশ দিয়ে আক্‌তার সাহেব তাদের পায়ে চলা পথে আগে পাঠিয়ে দিলেন—তাঁদের যাওয়া হ'বে মোটরে। আজ কন্‌কনে শীত—হাত পা শীতে আড়ষ্ট হ'চ্ছে। আক্‌তার সাহেব গরম সেরওয়ানী প'রে নিলেন, পুনোয়ার পোষাক শীত-গ্রীষ্মে ঐ একই। কামিজ আর লাল র‍্যাপার। বার মাস পাহাড়ে বাস ক'রে শীত-গ্রীষ্ম সে জয় করেছে। এই র‍্যাপার পুনোয়ার নিত্য সহচর। শীতের সময় গায়ে, রোদের সময় পাগড়ী। রাত্রে খড়ের শয্যায় লেপের কাজ করে। স্নানের পরে র‍্যাপার প'রে শুকিয়ে নিচ্ছে ভিজে ধুতি। আর ক্ষুধা পেলে দোকান থেকে বেঁধে নিয়ে আস্‌ছে মুড়ি চিড়ে ছাতু। দেহাতির পক্ষে এই একটা র‍্যাপারই যথেষ্ট।

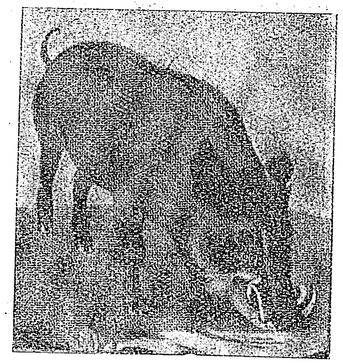

আজ অনেকটা রাস্তা অল্প সময়েই অতিক্রম করা যাবে। কাল যে জঙ্গল তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হয়েছে—আজ সেগুলি খুঁজে দেখার প্রয়োজন নাই। সোজা চলে যেতে হবে ঝর্ণার দিকে। তারপর ঝর্ণা পিছনে রেখে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আরও দূরে। পুনোয়া দেখে নিলে সব আয়োজন প্ল্যান অনুযায়ী ঠিকই হয়েছে। গাছের উপরে সর্দ্দার হ'য়েছে মোদিয়া। তার হাতে বন্দুক। ঝরণার অতি নিকটে যে গাছ, মোদিয়া থাকবে সেই গাছে। বাঘ সেখান থেকে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোদিয়াও এগিয়ে যাবে এক গাছ থেকে নেমে অন্য গাছে।

বন্যশূকর

বাঘ নজরে এলে তার গতি লক্ষ্য ক'রে পুনোয়াদের জানিয়ে দেবে—বাঘ ডানে কি বাঁয়ে, পূর্ব্বে কি পশ্চিমে। কোন বিপদ উপস্থিত হ'লেই মোদিয়া ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ দেবে। যাঁরা দূরে মোটরে অপেক্ষা করবেন এ বন্দুকের আওয়াজ তাঁদেরই জন্য। আক্‌তার সাহেব নিজে সব ব্যবস্থা দেখে খুশী হ'য়ে নিঃশব্দে পুনোয়াকে নিয়ে

এগিয়ে গেলেন। জলের কাছে এসে বাঘের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। আক্তার সাহেবের অনুমান মিথ্যা হয়নি। পায়ের দাগ পরীক্ষা ক'রে বোঝা গেল, বাঘের একখানি সামনের পা আহত। নরম মাটীতে সব জায়গায় তার ছাপ আসেনি। যেখানে ছাপ পড়েছে তাও সামান্য। দুই-এক জায়গায় রক্তের দাগও দেখা গেল।

অদূরে একটী অনুচ্চ পাহাড়। একে একটা ঢিবি বা টীলা বলাই সঙ্গত। আমাদের শিকারীদ্বয় এই টীলার উপর তাদের আসন স্থির ক'রে নিলেন। টীলার ঠিক নীচেই জঙ্গল। উপরে কোন গাছপালা নেই। পাথর আর শক্ত মাটীর একটা স্তূপ। তার সর্ব্বত্র পাথরের টুকরো ছড়ানো। উভয়ে নিজ নিজ রাইফেল পরীক্ষা ক'রে নিলেন।

ব্যাঘ্র

ভোজালিখানাও দেখে নিয়ে আবার কোমরে বেল্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন। দূরে গাছের সর্ব্বোচ্চ শাখায় আরোহণ ক'রে মোদিয়া হাত নেড়ে নিজের আর আশে পাশে ও পশ্চাতের বৃক্ষারোহীদের অবস্থান জানিয়ে দিল। একটু পরেই যারা গাছে চড়েছে তাদের আঁচলে কুড়োনো পাথরের টুকরো জঙ্গলে ছোঁড়া হ'বে। সকলের হাঁক্‌ডাকও সুরু হ'বে। আর মোদিয়া একটা বন্দুকের আওয়াজ করবে। উদ্দেশ্য, আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে বাঘকে সাম্‌নের দিকে এগিয়ে দেওয়া।

পনর মিনিট পরে ব্যবস্থা অনুযায়ী হাঁকডাক সুরু হ'বে, কিন্তু পুনোয়া আক্তার সাহেবের রকম লক্ষ্য ক'রে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। আক্তার সাহেবের চোখ নিমীলিত, মাঝে মাঝে হাই তুলছেন, দেহ শ্লথ হ'য়েছে। পুনোয়া বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে দেখ্‌তে পেলে আক্তার সাহেব তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। আজ এই আসন্ন সঙ্কটে তাঁর এ কি আচরণ! পুনোয়া তাঁকে তুলে দিয়ে ইসারায় জঙ্গল দেখিয়ে দিল। আক্তার সাহেব জানালেন চেষ্টা বৃথা; তাঁকে ঘুমুতে হবেই। এই নিদ্রার হাত থেকে তাঁর অব্যাহতি নাই। চোখের দৃষ্টি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল। পাঠক বিস্মিত হ'বেন, জীবনে এই মহাসন্ধিক্ষণে আক্তার সাহেব নিদ্রার ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর অবচেতনার ভিতরে মাত্র একটী কথা ওতপ্রোত হয়েছে। "এ আমার কালনিদ্রা, অতলস্পর্শ সুষুপ্তি! চোখের পাতায় নেমে আস্‌ছে অন্ধ তমসা—রোধ ক'রার শক্তি আমার নেই—হয় ত এ কালনিদ্রার শেষ অঙ্কে এ ধরণীর মোহ থেকে চির-নিষ্কৃতি।"

তারপর? তারপর দিনরাত্রি শার্দ্দূলের সাহচর্য্য, আকাশ অরণ্য সব একাকার হ'য়ে নিঃশেষে মুছে গেল! এই নিদ্রার রহস্য কে জানে! এই সন্ধিক্ষণে আহত ব্যাঘ্রের সঙ্গে আসন্ন সংগ্রামের শঙ্কটাকুল মুহূর্ত্তে আক্তার সাহেবের এ অদ্ভুত নিদ্রা আর একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই ব্যাপারের মত তারও প্রতি বর্ণ সত্যি।

আমাদের এক বিশেষ পরিচিতা মহিলা যৌবনের প্রারম্ভে স্বামীর বিশ্বাস ও স্নেহ হারিয়ে একমাত্র সন্তানকে বুকে করে নিয়েছিলেন। দুঃখিনীর ছেঁড়া আঁচলের মণি। এই সন্তানের জ্বর বিকারে দুই মাস সুশ্রূষা ক'রে তাকে মৃত্যুর কবল থেকে সেবার বাঁচালেন বটে—কিন্তু কয়েক দিন পর জ্বরের পাল্টা আক্রমণ দেখা গেল—অবস্থা বুঝে ডাক্তার চোখ মুছে জবাব দিলেন। জননী এবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে সন্তানের শিওরে জায়গা ক'রে নিলেন। পলকহীন নেত্রে সন্তানের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর বিশ্বাস—তাঁর চোখের সাম্‌নে থেকে ঈশ্বরও তার প্রাণটুকু কেড়ে নিতে পারবে না। এই সন্তানের মৃত্যু হ'লে প্রতিবেশী সকলে এসে দেখতে পেলে—মৃত সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ধরে মহিলা গভীর নিদ্রার ক্রোড়ে সমাহিত!

জীবন-মরণের বেলাভূমিতে এমনি ধারা বিস্মৃতির কাহিনী আরও কত আছে—আজ সে প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য নহে।

টীলার উপরে তারপর যে ঘটনা ঘটেছে তা বর্ণনা

করার কৃতিত্ব আমার নাই। পাঠক আপন কল্পনায় সে দৃশ্যের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করুন, আমি আভাস দিব মাত্র। অনুমান বিশ মিনিট পরে—পুনোয়ার হস্ত তাড়নায় নিমেষে আক্তার সাহেবের চেতনা ফিরে এসেছে। যে অনুচ্চ টীলার উপরে ব'সে তাঁরা বাঘের প্রতীক্ষা করছিলেন ঠিক তার নীচেই বাঘ। একে বাঘ বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। এর বিপুল আয়তন, এর বিরাট বিচিত্র মাথা, এর গুম্ফ এবং শ্মশ্রু, এর দুই চোখের সন্ত্রাসবর্ষী দৃষ্টি যাঁর চোখে পড়েছে সেই আতঙ্কে অভিভূত হ'য়েছে। এর রং গাঢ় পিঙ্গল, না পাটকিলে বল্‌তে পারছি না। দেহের কোন অংশ পিঙ্গল, কোথাও সাদা, তার পাশেই কালো, আবার পাটকিলে। আর এই বর্ণ-সমাহারকে ভীষণ ভয়াল করেছে এর দেহ;

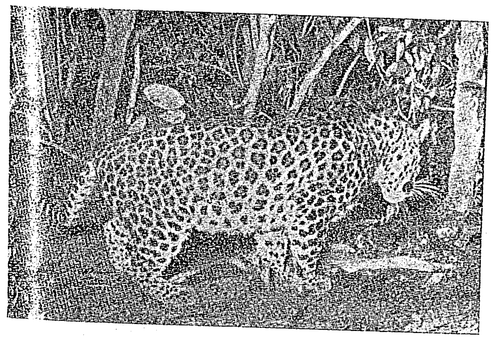

চিতা

মস্তক আর বৃহৎ লাঙ্গুলের সর্ব্বত্র গাঢ় কৃষ্ণ তীর্য্যক্ রেখা। এই তীর্য্যক্ রেখার জন্য কেউ কেউ একে বলেন—মিঃ তীর্য্যক রেখা। এর বলিষ্ঠ বপু, উজ্জ্বল বিচিত্র দেহ, আর এর দীর্ঘ চোখের তীক্ষ্ণ ও নির্ভীক দৃষ্টি রোমাঞ্চকর। অরণ্যপথে এর গতি শব্দ-লেশহীন, কিন্তু এর চিত্রিত দেহ, মস্তক ও লাঙ্গুল প্রতি পদক্ষেপে নিঃশব্দে একটী কথাই বল্‌ছে—"খবরদার!"

আক্তার সাহেব সভয় ও সোৎসাহে দেখলেন—বিশ্ব-স্রষ্টার সেই অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাঁর সম্মুখে।

গুড়্‌ম্, গুড়্‌ম্! নিশানায় সিদ্ধহস্ত আক্তার সাহেবের হ্যাণ্ড এণ্ড হ্যাণ্ড দুবার গর্জ্জন করলে। আক্তার সাহেবের দেহের রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুট্‌ছে।

এ কি! বাঘের গতি রুদ্ধ হ'য়েছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বাঘ ভূলুণ্ঠিত হয় নি। সে নিশ্চল হ'য়ে টীলার নীচে দাঁড়িয়ে, উপরের আততায়ীদের নিরীক্ষণ করছে। দুই চোখে তার আগুন।

লক্ষ্য ব্যর্থ হ'য়েছে, আক্তার সাহেবের উৎকণ্ঠার অবধি নাই; পুনোয়া চঞ্চল হ'য়ে হুকুমের প্রতীক্ষা করছে, আদেশ না পেলে গুলি করার তার অধিকার নাই। এ কি, বাঘ টীলার উপরে উঠে আস্‌ছে। এক মুহূর্ত্ত, কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই আক্তার সাহেবের প্ল্যান সাব্যস্ত হ'ল। পুনোয়াকে অনুসরণের আদেশ করে বাঘকে বাঁয়ে রেখে আক্তার সাহেব দ্রুত অবতরণ করছেন। উদ্দেশ্য, সমান্তরাল অবস্থান থেকে বাঘের একপাশ থেকে গুলি চালাবেন। আবার দুবার রাইফেলের নির্ঘোষ। পাহাড়ে দূরে দূরে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হ'ল। কিন্তু বাঘ নির্ব্বিকার! পুনোয়া

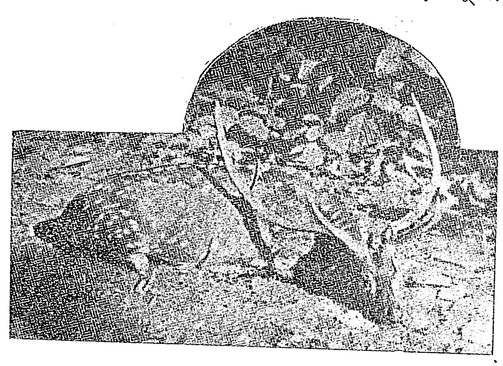

হরিণ

দেখলে বাঘের মুখখানা জিঘাংসায় আরও ভয়ঙ্কর হয়েছে। একবার শত্রুকে চোখের চাহনীতে শাসন জানিয়ে টীলার নীচে মুহূর্ত্তে জঙ্গলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। লক্ষ্য ব্যর্থ, আক্তার সাহেব ক্ষিপ্ত হ'য়ে গেছেন। ছুটে নীচে নেমে এলেন। উদ্দেশ্যহীন, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল হয়ত গুলি লেগেছে। পুনোয়াকে বললেন, ঘড়ি ধরে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হ'বে। জঙ্গল ন'ড়্‌ছে না। গাছের উপর থেকে মোদিয়া জানালে—বাঘ দেখা যাচ্ছে কিন্তু জীবিত কি মৃত বোঝা যাচ্ছে না। আধঘণ্টা পরে উভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলের দিকে এগোতে লাগলেন। বুক আর কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে চলা। হাতে উদ্যত রাইফেল। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে বাঘ দেখা গেল। মনে হ'ল দুই পায়ে ভর ক'রে বাঘ ব'সে আছে। হয়ত ভুল দেখা, কিন্তু এগিয়ে

যাওয়া আর হ'বে না। পুনোয়াকে জানালেন, এক সঙ্গে উভয়ে বাঘ লক্ষ্য করে গুলি করবেন। মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়। বাঘ জীবিত থাক্‌লে অবিলম্বে আক্রমণের সম্ভাবনা। দুইটি রাইফেলের ব্যারেল থেকে অগ্নিশিখা বিদ্যুৎশিখারই মত বেরিয়ে এল। মোদিয়া চীৎকার করে বললে—বাঘ মরেছে! পুনোয়া সায় দিল। আক্‌তার সাহেবকে ইসারায় তাই জানিয়ে দিলে। আক্‌তার সাহেব নিঃশব্দে পুনোয়ার হাত ধরে দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। ইঙ্গিতে বৃক্ষারোহীদের নীচে নেমে আসতেও নিষেধ জানালেন। আর আধ ঘণ্টা। তার পর এগিয়ে দেখ্‌তে হ'বে। আধ ঘণ্টা পরেই এগিয়ে দেখা গেল রক্তাক্ত বিগতপ্রাণ ব্যাঘ্রের দেহ ভূলুণ্ঠিত।

আক্‌তার সাহেব বাঘের ক্ষত পরীক্ষা ক'রে পুনোয়াকে দেখালেন—জমিদার সাহেবের সে রাত্রের গুলিতে বাঘের একটা থাবা জখম হ'য়েছে। আর একটা গুলি তার চোয়াল ভেঙ্গে দিয়েছিল। আক্‌তার সাহেব আরও জানালেন এই দাঁত ও চোয়াল ভাঙ্গা ছিল বলেই বাঘ বারংবার লক্ষ্য করেও তাঁদের আক্রমণ করেনি—এ না হ'লে এই ঘটনা হয়ত অন্য ভাবে লিখিত হ'ত।

ডাকবাংলোয় যখন বাঘের দেহ আনা হ'ল তখন রাত হয়েছে। দারুণ শীত উপেক্ষা ক'রে জমিদার সাহেব সপারিষদ বাঘ ঘিরে বসে আছেন—গোঁফ আর নখ কেউ উপড়ে নিতে পারে নি। টিপয়ের উপরে রক্ষিত গরম চা'র পেয়ালা থেকে ধূঁয়া উড়্‌ছে। নাস্তাও দেখ্‌তে ভারি। আক্‌তার সাহেব হুজুরকে অনুসরণ বৃত্তান্ত জানাচ্ছেন। আর সকলের পশ্চাতে বারান্দার এক কোণে লাল র‍্যাপার দিয়ে মুড়ি দিয়ে পুনোয়া নিদ্রার ক্রোড়ে মগ্ন।

কল্প-প্রিয়া

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মোর কল্পলোকে—
এসো আজ মন্থর চরণে,
বরণে বরণে—
আনন্দের শিহরণে স্তিমিত রহস্যভরা চোখে।
হেথা শুধু তুমি আর আমি
রচিব সুরার পাত্রে সুরলোক স্বপ্ন দিবা যামি।
তোমার অঙ্গের গন্ধে চন্দনের লাজক্ষুব্ধ মুখ
ব্যথিত উন্মুখ—
চেয়ে রবে বেদনামন্দ্রিত আঁখি মেলি
অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে গুরুভার হৃদয় উদ্বেলি'
মোর মুখপানে,
সায়াহ্নের গানে—
নমিবে তন্দ্রার ঘোর ধীরে মোর তনুমন ছাপি,
শালের শাখায় মৌন কামনার স্পর্শাবেশ কাঁপি
ছড়ায়ে পড়িবে বিশ্বময়;
তুমি আর আমি রবো চেয়ে মুখোমুখি,
কোন কথা নয়;
দৃষ্টি দিয়ে আমি শুধু লেহন করিব তব তনু,
অণু-পরমাণু—
প্রতি লোমকূপে মোর মাগিবে আশ্রয়;
সেই মোর জয়—
রহিবে অক্ষয় চির-যুগান্তের সুনীল আকাশে,
তারই আশে পাশে—
কামনার জ্যোতিহীন অস্পষ্ট তারকাসম মোর ব্যাকুলতা
বহিবে ব্যর্থতা।
পদপ্রান্তে কাঁদিবে একাকী
নগ্ন বসুন্ধরা;
তুমি লোকোত্তরা
উর্ব্বশীর লইবে প্রণাম নববধূ বেশে।
তোমারই প্রেমের মন্ত্র অফুরন্ত রবে দেশে দেশে।

রহস্যময়ী

শ্রীগৌতম সেন

অনেকদিন পরে যতীনের সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হ'লো। সেই যতীন যাকে ছোটবেলায় আমরা ইন্দ্রনাথ বল্‌তাম। অদ্ভুত একটা টাইপ: না পারে এমন কাজ নেই। সাপের লেজ ধ'রে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে তাকে ছুঁড়ে দিতো—যেন ক'রে লোকে ঢিল ছোঁড়ে।

একদিন বল্লে, চল্ নবাবের কবরখানা দেখে আসি। পৌঁছুতে রাত্রি হ'য়ে গেলো। বল্লে, কুছ্‌পরোয়া নেই, আজ খোসবাগেই খিচুড়ি পাকাবো। আর ঐ যে দেখ্‌ছিস লুৎফা উন্নিসার কবর—ঐখানে চুপ ক'রে কান পেতে শোন্, শুনতে পাবি।

শুনতে অবশ্য কিছুই পেলাম না, তবু বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো।

শ্মশানঘাটের সুরঙ্গপথে অবলীলাক্রমে যতীন একদিন নেমে গেলো। বল্লে, থাক্ তোরা দাঁড়িয়ে—ব্যাপারটা কি দেখে আসি।

এই সুরঙ্গ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বল্‌তো। কেউ বল্‌তো, নবাব সিরাজদ্দৌলার গুপ্তপথ—কেউ বল্‌তো, জগৎশেঠের ধনাগার—আবার কেউ বল্‌তো রঘুডাকাতের আড্ডা ছিলো ঐ মাটির মধ্যে। কথা যাই থাক্, লোকচক্ষে ঐ স্থানটি ভীতিপ্রদ ছিলো সন্দেহ নেই। প্রকাণ্ড একটি সুড়ঙ্গ। অন্তত বাইরের বিস্তার দেখে তাই মনে হয়। নীচে নামবার সিঁড়ি আর তারই পাশ দিয়ে নেমেছে একগাছা লোহার শিকল।

কিন্তু যতীন আর ফির্‌লো না। সেই যে লোহার শিকল ধ'রে নেমে গেলো, তারপর ভগবান জানেন সে এতকাল কোথায় কিভাবে ছিলো।

বল্লে, খুব মোটা হয়েছিস দেখ্‌ছি। দেশের খবর কি? রাজপেয়ী তেমনি বিনিয়ে বিনিয়ে কবিতা লিখ্‌ছে তো?

বল্লাম, ঠিক পনের বছর হবে, নয় রে?

—ও আর ক'টা দিন। মানুষের আয়ুর কাছে ওটা কিছুই নয়। ব'লে যতীন হাস্‌লে।

—কিন্তু কি হ'য়েছিলো তারপর?

—সে অনেককথা। বল্‌বো একসময়। কাল যাস্, আমার ওখানেই খাবি। ব'লে যতীন তার ঠিকানা লিখে দিয়ে ঝড়ের মত অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

পরদিন গেলাম ঠিকানা খুঁজে খুঁজে। এক অন্ধকার গলি এবং ততোধিক অন্ধকার জীর্ণ একখানা বাড়ী। দরজার কড়া নাড়্‌তেই গেলো খুলে। নারীকণ্ঠে উত্তর এলো, আপনি কি নির্ম্মলবাবু?

—হাঁ। যতীন নেই?

উত্তর এলো, ভেতরে আসুন।

—যতীন কি নেই?

—না।

—তাহ'লে থাক্, আর-একদিন আস্‌বো।

—কিন্তু আপনার যে এখানে খাবার কথা।

বল্লাম, বেশ তো, আর একদিন খাবো না হয়।

—তিনি আপনার খাবার সমস্ত ব্যবস্থাই ক'রে গিয়েছেন। আপনি অত লাজুক কেন? বল্‌তে বল্‌তে মহিলাটি—সম্ভবত বৌদিই হবেন, খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লেন।

—কিন্তু এই বা কি-রকম ভদ্রতা, খেতে ব'লে খাওয়াবার মালিকই রইলো অনুপস্থিত! অনুযোগের সুরেই বল্লাম।

—কিন্তু মালিক তো তিনি একা ন'ন। এতবড় মানুষটাকে আপনার নজরে পড়লো না এও তো আশ্চর্য!

—আচ্ছা, হতভাগাটা আস্‌বে কখন? বল্লাম।

—তা তো জানি না ঠাকুরপো। আজ নাও আসতে পারেন, আবার পাঁচ সাত-দিন দেরি ক'রে আসাও তাঁর অভ্যেস আছে।

—চমৎকার! স্বামীভাগ্য তাহ'লে আপনার ভালই দেখ্‌ছি।

—হাঁ, তা খুব। ব'লে মহিলাটি মুখ টিপে হাস্‌লেন।

কিন্তু অদ্ভুত সপ্রতিভ এই মেয়েটি। ঠিক যে-সময়টিতে নিজেকে ধিক্কৃত করবো মনে করেছি, সেই সন্ধি মুহূর্তে পরম নিষ্কৃতির মত মেয়েটি এলো একটি স্নিগ্ধ-অধিকার নিয়ে। অকুণ্ঠিত-কণ্ঠে কত পরিচিতের মত ডাক্‌লে, ঠাকুরপো। লজ্জায় মাথাটা আপনিই পড়্‌লো নুয়ে।

—কি ভাব্‌ছো ঠাকুরপো? তারচেয়ে হাতমুখ ধুয়ে ভাল হ'য়ে ব'সো, আমি রান্নাটা সেরেনি।

আশ্চর্য এই যতীন। আর ততোধিক আশ্চর্য তার এই বৌটি। বন্ধু হ'লেও, এক অপরিচিত যুবককে এমন অসঙ্কোচে আহ্বান করার কল্পনাও আমি করিনি কোনদিন। মনটা বিষিয়ে উঠ্‌লো। মনে হ'লো চীৎকার ক'রে বলি, এ আমার সইবে না—আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু কি জানি কেন, এতবড় আঘাত দিতেও প্রাণ চাইলো না।

আকাশে উঠেছিলো মেঘ। বৌদির উৎকণ্ঠার আর অন্ত নাই। বল্লে, এই মেঘ মাথায় ক'রে নাই বা গেলে ঠাকুরপো!

বলে কি এই মেয়েটি! বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাইলাম। একটা পরিচ্ছন্ন সরলতায় সেও ঠিক আমারই দিকে আছে চেয়ে। বল্লাম, তা হয় না বৌদি!

—কেন হবে না। মেঘ না কাট্‌লে তোমার কিছুতেই যাওয়া চল্‌বে না।

—কিন্তু তাই বা কি ক'রে সম্ভব। যতীন বাড়ী নাই—

বাধা দিয়ে বৌদি বল্লে, সম্ভব অসম্ভবের কথা আমি বুঝ্‌বো। তিনি বাড়ী নেই, সেকথাটা তোমার চেয়ে আমি বেশী জানি ঠাকুরপো!

লজ্জিত হ'লাম। বল্লাম, তার জন্যে নয় বৌদি। এই একখানা ঘর—আমাকে ছেড়ে দিয়ে হয়তো তোমার খুব খানিকটা আত্মপ্রসাদ হবে, কিন্তু আমি সেটাকে গ্রহণ করবো কিসের জোরে?

—আমাকে যে কৃচ্ছ্রসাধনই করতে হবে, এই বা তোমাকে কে বল্লে।

—কিন্তু ঘর তো এই একখানিই।

বৌদি খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো। বল্লে, একঘরে রাত্রিবাস করলে জাত যায়, এ আমিও যেমন স্বীকার করি না—আমার স্বামীও তেমনি ঐ কথাগুলোকে অবজ্ঞা করেন।

বুঝ্‌লাম, যতীন কিসের জোরে তার স্ত্রীর উপর এমন ক'রে নির্ভর করতে পেরেছে। কিন্তু মন সায় দেয় না। কিছুতেই পারি না এই নির্লজ্জ পরিবেশের মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে! আজন্ম সংস্কারের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনে মনের এই বিক্ষুব্ধতাকে কোন দিক দিয়েই গোপন করতে পারলাম না। বৌদির তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি এড়ায় নি। বল্লে, না হয় নাই থাক্‌লে, মেঘটা অন্তত দেখে যাও।

এরপর সাতদিন কেটে গিয়েছে। যতীনের বাড়ী যেতে সাহস হয়নি। হয়তো সে এখনো ফেরেনি এবং বৌটি তেমনি একলাই আছে। কি জানি কোথায় আমার মনের কোনে একটু সঙ্কোচ জমে উঠেছে যেটাকে দূর করতেও মমতা হচ্ছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন বারবার ক'রে মনে আস্‌ছে, যতীন যদি নাই এসে থাকে, তবে তার সংসার চল্‌ছে কি ক'রে? তাদের সাংসারিক দৈন্য তো নিজের চোখেই দেখে এসেছি। একটা বিশ্রী ব্যাকুলতায় মনটা ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়্‌লাম।

ডাক্‌তেই, বৌদি এসে দরজা খুল্‌লে। বল্লে, মনে পড়্‌লো ঠাকুরপো!

সেকথার উত্তর না দিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করলাম, যতীন আসেনি?

বৌদি তেমনি ক'রেই হেসে উত্তর দিলে, না। বোধ করি এখনো তাঁর সময় হয়নি।

—মানে, সে কি সেই থেকেই বাড়ী নেই?

—এসো, ভেতরে এসো। ব'লে হাত ধ'রে বৌদি আমাকে একেবারে নিজের ঘরে নিয়ে এলো। অমন ক'রে দোর ধ'রে দাঁড়িয়ে কোন মেয়েছেলের সঙ্গেই কথা বল্‌তে নাই: তাতে পাঁচজনে পাঁচকথা বলে, এ বুদ্ধিটুকুও কি তোমার হয়নি? ব'লেই বৌদি হেসে ফেল্লে।

অদ্ভুত এই মেয়েটি! ও যেন হাস্‌বার জন্যেই পৃথিবীতে এসেছে। যে দৈন্য ওর ক্ষুদ্র পরিবেশটিকে অক্টোপাসের মত অহোরাত্র রয়েছে ঘিরে—ভাবি, তাকে ও তুচ্ছ করলো কিসের জোরে! হয়তো এ ক'দিন ওর অনাহারে অর্দ্ধাহারেই কেটেছে, কিন্তু মুখ দেখে কিছুই বোঝ্‌বার উপায় নাই।

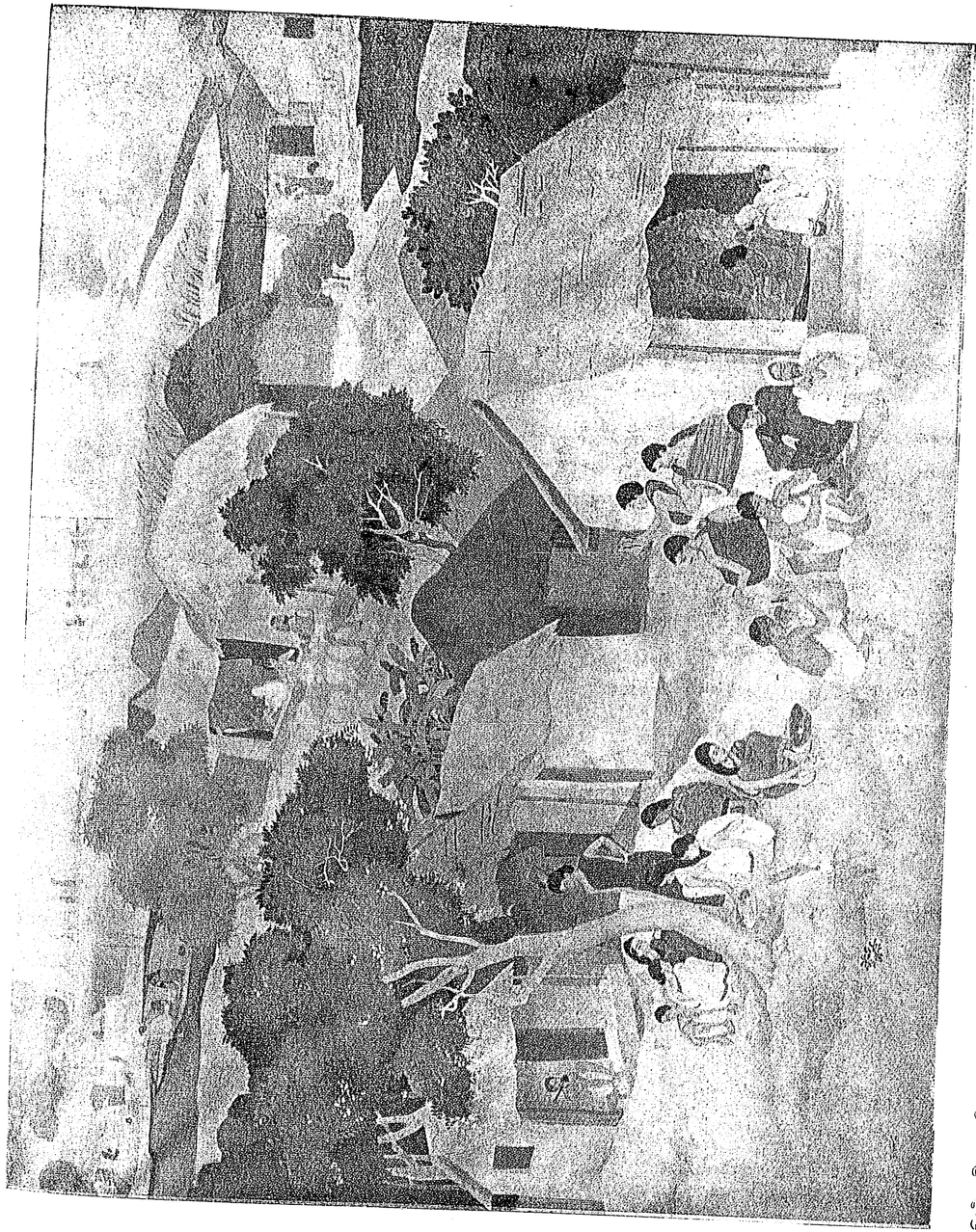

শারদোৎসব

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অনেকক্ষণ চুপ ক'রেই কাট্‌লো। কি-ই বলা যেতে পারে। হয়তো অতি সহজেই কথাটা তোলা যায়, কিন্তু এতদিন পরে এই আত্মীয়তার অভিনয় করতে আমার নিজেরই লজ্জা হ'লো।

—কি ভাব্‌ছো ঠাকুরপো ?

—ভাব্‌ছি, আজ এইখানেই দুটো খেয়ে যাবো কিনা।

বৌদি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো। বল্লাম, বুঝতে পেরেছি : এইটুকুই জান্‌তে চাইছিলাম। একটা অপদার্থের হাতে পড়ে এরকম উপবাস তোমাকে আর কতদিন করতে হয়েছে বৌদি ?

—তুমিও তো কোন খোঁজ নাওনি ঠাকুরপো! হয়তো তিনি এইভেবেই নিশ্চিন্ত আছেন, তুমি যখন আছো একটা উপায় হবেই।

—এ সে ভাব্‌তেই পারে না। তা ছাড়া আমি নাও আস্‌তে পারি, এইটিই তার সর্বাগ্রে ভাবা উচিত ছিলো।

—কি ক'রে ভাববে বল, বন্ধুকে সে কোনদিনই অত ছোট ক'রে দেখেনি।

কথা যাই হোক্, আমার অপরাধও যে সামান্য নয় বৌদির কথায় চৈতন্য হ'লো। বল্লাম, একটা সত্যি কথা ব'লবে বৌদি, ক'দিন তুমি অনাহারে আছো ?

আমার চোখের দিকে চেয়ে বৌদি হেসে ফেল্লে। বল্লে, অতি সামান্যতেই মেয়েদের মত তোমার চোখে জল আসে ঠাকুরপো!

—কিন্তু আমার কথার তো কোন উত্তর পেলাম না বৌদি ?

—আচ্ছা, তুমি চাল-ডাল নিয়ে এসো। তারপর দুজনে একসঙ্গে খেতে খেতে বল্‌বো।

রাজ্যের বাজার মুটের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলেছি, পিছন থেকে যতীন ডাক্‌লে—অত ছুটিস না একটা 'র‍্যাক্‌সিডেণ্ট্' হবে।

বল্লাম, তুমি একটি রাস্কেল। বৌটাকে এমন ক'রে ফেলে যেতে তোমার পৌরুষে বাধ্‌লো না ?

যতীন তেমনি স্বভাব-দৃপ্ত হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো। বল্লে, খাবার কি আমি জোটাই রে! ওর জন্যে ভগবান আছে।

আশ্চর্য ওর কথা! বল্লাম, আমাকে ক্ষমা করিস্ ভাই; আমারই নির্বুদ্ধিতায় বৌদিকে উপোস্ করতে হ'লো। আমিই বৌদিকে ভুল বুঝেছিলাম, ইচ্ছা ক'রেই সংস্রব করেছিলাম ত্যাগ।

যতীন আবার হেসে উঠ্‌লো। বল্লে, মোটরখানা আছে, না বিক্রী ক'রে ফেলেছিস ?

—না, আছে এখনো।

যতীন কি যেন ভাব্‌লে। তারপর বল্লে, তবে আর কি—তুই তো রাজা। যার বাড়ী আর গাড়ী আছে, সেই এ সংসারে টিঁকে গেলো। আমরা তো চিনির বলদ, চিনি ব'য়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দিলাম।

যতীনের কথায় ব্যথা পেলাম। চোখের উপর একটা দুস্থ উলঙ্গ পৃথিবী বীভৎস হ'য়ে উঠ্‌লো। কিল্‌বিল ক'রে বেড়াচ্ছে সব বুভুক্ষু নর-নারীর দল! আর্তনাদ করছে রুগ্না-মায়ের কোলে সদ্যজাত শিশু। একফোঁটা নাই দুধ : শুষ্ক-স্তন টেনে টেনেও পায়না রক্তবিন্দু। বার্লির জলে আর সাবুর কাথে ঘর আলো-করা মাণিকগুলো তাদের পৃথিবীর দিকে প্যাট্ প্যাট্ ক'রে আছে চেয়ে। বল্লাম, বেঁচে থাকার মত পাপ আর নাই—না রে ?

—তোরা বুঝিস এসব কথা ? যতীন হেসে বল্লে।

—বুঝ্‌বো না কেন, ভাগ্যের জোরে একখানা মোটর আর বাড়ী পেয়েছি বই তো নয়।

যতীন হো হো ক'রে আবার হেসে উঠ্‌লো। খুব ভাল লাগে ওর ঐ হাসিটি। এক এক সময় বিস্ময় লাগে, ঐ শরীরে ও অমন হাসে কি ক'রে!

খাওয়ার পর্ব শেষ হ'লে, সেই পুরোণো কথা পাড়্‌লাম। বল্লাম, তোর শ্মশানঘাটের গল্প বল্ যতীন।

—ও আর কতটুকু গল্প রে! তোরা রইলি ওপরে, আমি গেলাম নেমে। কিন্তু কোথায় যাবো ? সব অন্ধকার। চুপ ক'রে ঐ অন্ধকারেই ব'সে রইলাম। তারপর যখন টের পেলাম, তোরা চলে গিয়েছিস তখন ওপরে উঠ্‌লাম। ভাব্‌লাম, বাড়ী গেলেই তো ধরা প'ড়ে যাবো—আর বাড়ীর টানই বা আমার কোথায় ছিলো। বেরিয়ে পড়্‌লাম ঐ একবস্ত্রে। তারপর তো দেখ্‌ছিস, কেটে যাচ্ছে কোনরকমে।

—বুড়ো বাপ আর ছোটভাইটার কথাও কি মনে পড়্‌লো না কোনদিন ?

—কার ভাবনা কে ভাবে। কেউ কি আসে কারো

মুখাপেক্ষী হ'য়ে? জানি, আমিও যেমন ক'রে বেঁচে আছি, তারাও তেমনি ক'রে থাক্‌বে। জানোয়ারগুলো বড় হ'লেই বেরিয়ে পড়ে। কোন 'সেন্টিমেণ্ট'ই ওদের রক্তের মধ্যে নাই। শ্মশানঘাটের গল্প শুন্‌তে চাচ্ছিলি, কিন্তু তার চেয়েও বড় গল্প জমে উঠেছে এখন। একদিন জান্‌তে পার্‌বি।

বল্লাম, কোনদিন কোনকথাই স্পষ্ট ক'রে শুন্‌তে পেলাম না তোর মুখ থেকে। কি ক'রে চল্‌ছে এ জান্‌তে চাইলে হয়তো জোরেই হেসে উঠ্‌বি।

বাধা দিয়ে যতীন বল্লে, একটা বিরাট কারবার ফেঁদে বসেছি। কিছুদিন থেকে লোকসান যাচ্ছে। তবে বড় রকম একটা টোপ ফেলেছি, হয়তো এবার কিছু পেলেও পেতে পারি।

—গল্প পেলে যে আর উঠ্‌তেই চাওনা ঠাকুরপো! আর তোমারও তো বেশ আক্কেল। ঠাকুরপো অবেলায় খেয়েছে, ওকে একটু বিশ্রাম কর্‌তেই দাও। ওঠো, বিছানাটা ক'রে দি। ব'লে বৌদি হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে এলো।

যতীন সত্যিই উঠে গিয়ে বস্‌লো নিজের চেয়ারটায়।

সন্ধ্যেবেলায় যখন ঘুম ভাঙলো, তখন দেখি বৌদি স্টোভ জেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে। বল্লে, ওঠো মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নাও।

—যতীন কই?

—কেন, বন্ধুকে না দেখে কি চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছো? বাবারে বাবা! এত যত্ন করি, তবু আমি যেন কেউ নই। ব'লে বৌদি তেমনি ক'রে মুখ টিপে হাস্‌লে।

—না, না, সত্যি; যতীন কি আবার বেরিয়ে গেলো? —ওঁর কি চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে চলে।

হয়তো চলে না। কিন্তু মনটা খুসী হ'তে পার্‌লো না। এতদিন পরে একটা দিনও কি সে বাড়ীতে থাক্‌তে পারে না! প্রকাশ্যে বল্লাম, এবারও কি কিছুদিনের মত সে গৃহত্যাগ কর্‌লো?

—তাও তো কিছু পূর্বাহ্নে জান্‌বার উপায় নাই ঠাকুরপো!

—থাক্, আর আমার জেনেও কাজ নাই। চা দাও, আমি চলি।

—ইস্, তাই বই কি। আমি যে কষ্ট ক'রে মাংস রাঁধ্‌লাম, খাবে কে?

—কিন্তু যে-লোকটার খাবার সব চেয়ে প্রয়োজন, তাকে তো কই অনুরোধ কর না বৌদি?

—তাকে অনুরোধ ক'রে আট্‌কাতে পারি, এতবড় জোর আমার কই ঠাকুরপো! বল্‌তে বল্‌তে বৌদির স্বর ভারী হ'য়ে এলো।

—তাই জুলুমের সবটুকুই বুঝি আমার ওপর এসে পড়েছে? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাইলাম।

বৌদি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর হেসে বল্লে, দুধের সাধ ঘোলে মিটাই।

রাত্রি বারটায় বৌদির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, আর ও-বাড়ীর ছায়াও মাড়াবো না। মরুক যতীন, আর ঐ যতীনের বৌ। এতবড় পৃথিবী—কে কার সন্ধান রাখে। এইতো এতদিন ওদের কোন সন্ধানই রাখ্‌তাম না। আজো না-হয় না রাখ্‌লাম। স্বামী যদি তার কর্তব্য পালন না করে—আমি কে? আমার এ-দুর্বলতার কি কোন মানে হয়?

সেদিন মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি বাগ্‌বাজারের দিকে। অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে এসে গাড়ীর তেল গেলো ফুরিয়ে। দেখি, আমারই মত অবস্থা হয়েছে রজত রায়ের। বল্লে, তেল ফুরোবার এমন কেন্দ্রস্থল আর দুটি নাই। অতি দুর্লভ বস্তুকেও অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে এখানে দেখা যায়।

—আমিও কি তোমার মতে দুর্লভ?

—আজকাল তো তাই মনে হচ্ছে। দুদিন গিয়েও দেখা পাইনি।

বল্লাম, তা হয়তো সত্যি। কদিন যতীনের বাড়ী গিয়েছিলাম।

রজত প্রকাণ্ড একটা 'হাঁ' ক'রে বল্লে, কে যতীন—যতীন ভট্‌চায? সর্বনাশ! তার পাল্লায় পড়েছো? তার সেই বৌটি আছে তো? ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি তার সেই সর্বগ্রাসী বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছি।

—তুমি একটি স্কাউণ্ড্রেল। যতীন আমার বাল্যবন্ধু। ছি, ছি—নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

উত্তর শুনে রজত শুধু দাঁত বের ক'রে হাস্‌লে। 'গুড্ বাই টু ইয়োর চ্যারিটি, এণ্ড্ উইশ্ ইউ গুড্ লাক্।' বল্‌তে বল্‌তে সে মোটর হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলো।

আমার মাথায় তখন ভূত চেপেছিলো। সোজা এসে ঢুক্‌লাম বৌদির ঘরে। রজত রায় যাই বলুক, আমি দেখ্‌বো—নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শেষপর্যন্ত দেখ্‌বো। তারপর যা ঘটে ঘটুক।

বল্লাম, বৌদি, কদিন রাগ ক'রে আসিনি; কিন্তু আজ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তোমার ওপর রাগ করা যায় না।

—না, রাগ ক'রো না। ছোট্ট একটু কথা, এইটুকু ব'লে বৌদি কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো।

বল্লাম, তোমার মন কি আজ ভাল নাই বৌদি?

—না। উনি রাগ ক'রে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছেন। সঙ্গে একটি পয়সাও নেই, অথচ আজ পাঁচদিন কেটে গেলো।

ব্যাপারটা সত্যিই খারাপ হ'য়ে গেলো। যতীনের এই নিরুদ্দেশ অবশ্য নতুন নয়, কিন্তু তার জন্যে কোনদিনই বৌদিকে এমন বিচলিত হ'তে দেখিনি। ভবঘুরে স্বামীটির প্রতি এতখানি দরদ, জানিনা ওর এতকাল কোথায় লুকোনো ছিলো! বল্লাম, একি তোমার কাছে নতুন বৌদি?

—না। কিন্তু এমন ক'রে যাওয়া বোধ হয় নতুন। বল্‌তে বল্‌তে বৌদির বড় একটা নিঃশ্বাস পড়্‌লো।

স্কাউণ্ড্রেল্—স্কাউণ্ড্রেল্—এই রজত রায়। নিজের মনেই উচ্চারণ কর্‌লাম।

—একটু ব'সো। তোমার চা তৈরি ক'রে আনি।

—না, আমি আজ চা খেতে পার্‌বো না।

বৌদি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর ছোট্ট ক'রে শুধু বল্লে, আচ্ছা।

বাড়ী ফিরে এলাম। যে কাঁটাটা আমার মনের মধ্যে ছিলো বিঁধে, তাকে মুক্তি দিয়ে ঐ ভাগ্যহীনা মেয়েটির উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানালাম।

সকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছে। কোথাও যেন কাজ নাই, এমনি মানুষের দেহ-মনকে দিয়েছে আজ পঙ্গু ক'রে। কি বিশ্রী সেই অলস দিন-যাপনের গ্লানি। মানুষ যেন নিজেরই নিঃশ্বাসভারে হাঁপিয়ে উঠেছে। বেরুতেও ইচ্ছা করছে না, অথচ না বেরুলেও কিছু ভাল লাগ্‌ছে না—মনের যখন এইরকম অবস্থা তখন এলো একটি ছেলে একখানা চিঠি নিয়ে। বৌদি লিখেছে: একবার এসো, বিশেষ প্রয়োজন।

অদ্ভুত যোগাযোগ। মনও যেন ঠিক এইটুকুই চাইছিলো, কেউ এসে তাগিদ দিয়ে আমাকে ঘরের বার করুক। তাই তো বল্‌ছিলাম, বেরুবার ইচ্ছা ছিলো—ছিলো না শুধু তাকে সঞ্চালিত কর্‌বার সম্যক উত্তাপ।

এসে বল্লাম, বৌদি নিশ্চয়ই এই বাদ্‌লা-দিনে উনুনে মাংস চাপিয়ে আমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছো?

বৌদি হেসে বল্লে, হাঁ। বাদ্‌লা দিনেই তো প্রিয়জনকে মনে পড়ে। ঘরে গিয়ে ব'সো, আস্‌ছি।

আজো যতীন নেই। কি বিশ্রী এই পরিবেশ। তার অনুপস্থিতির তিক্ততায় মনটা বিষিয়ে উঠ্‌লেও দিনের পর দিন সেই অপ্রতিরোধ্য বিষ আমাকেই একটু একটু ক'রে উদরস্থ কর্‌তে হচ্ছে মনে হ'লে নিজের কাছেও নিজের লজ্জা হয়। কিন্তু উপায় নেই। অনাবশ্যক আমার পালিয়ে বেড়ানোও যেন এই মেয়েটির কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে ব'লে মনে হ'লো। তবুও আজ অনেক রূঢ় কথা শান-দেওয়া পালিসের মত বৌদির প্রত্যাশায় প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌লাম। কিন্তু তার অপ্রত্যাশিত প্রবেশাভিব্যক্তি আমার সকল সঙ্কল্পকে চুরমার ক'রে দিলে।

—ঠাকুরপো, একবছরের ঘরভাড়া বাকি। এইমাত্র বাড়ীওয়ালা এসে অপমান ক'রে গেলো। লাঞ্ছনার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাই বা হ'তে দি' কেন: আমার এই গয়নাগুলো বাঁধা দিয়ে শ'দুয়েক টাকা এনে দাও। ব'লে বৌদি একটা ছোট্ট পুঁট্‌লি আমার সাম্‌নে রেখে দিলে।

আমার চোখের সাম্‌নে গোটা পৃথিবীটা যেন বন্ বন্ ক'রে ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। এই আমাদের নীড়, আর তাই বাঁধ্‌বার জন্যে এত মায়া! বল্লাম, গয়না তুমি রাখো বৌদি, টাকা আমি দিয়ে যাবো।

—তা হয় না ঠাকুরপো। তুমি হয়তো দিতে পারো, কিন্তু আমি তা নিতে পারি না।

—কেন পার না বৌদি, আমি কি তোমার পর? আর তা ছাড়া এখন সে-সব ভাববার অবসরই বা কোথায়! বাড়ীওয়ালার টাকা মিটিয়ে দিয়ে, তখন না হয় স্থির করা

যাবে আমাদের মধ্যে কে কতটুকু নিতে পারে, আর কে কতটুকু দিতে পারে।

বৌদি আর কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

বল্লাম, যতীন এলে বস্‌তে ব'লো; আমি আস্‌ছি।

—কাকে বল্‌বো ঠাকুরপো, সে তো কদিন ধ'রে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

—পালিয়ে বেড়াচ্ছে! যতীন?

আমার মুখের দিকে চেয়ে বৌদি জোরে হেসে উঠ্‌লো। বল্লে, এবার খানিকটা গালাগাল বেরুবে তো তোমার মুখ দিয়ে?

—কই আর বেরুতে দিলে বৌদি। তোমারই পুণ্যের জোরে ও ভগবানের কাছেও ক্ষমা পেয়ে গেলো।

টাকা নিয়ে এসে দিতেই বৌদি আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরলো। বল্লে, তুমি আমাদের বাঁচালে ঠাকুরপো! কিন্তু আজ তোমাকে ছেড়ে দেবো না। তুমি আমার হাতে মাংস খেতে চেয়েছো: যাও, ভাল দেখে কিছু মাংস নিয়ে এসো। আমার শিরা-উপশিরায় তখন রক্তের নাচন সুরু হয়েছে। বল্লাম, কে আর যেতে চাইছে।

রাত্রির অন্ধকারে যতীন চুপি চুপি এসে ঘরে ঢুক্‌লো। বল্লে, একটা সিগ্রেট্ দে, অনেকক্ষণ খাইনি।

সিগারেটের বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কথা বল্‌বার প্রবৃত্তি আর ছিলো না। কিন্তু যতীন নির্বিকার চিত্তে একটির পর একটি সিগারেট টেনে যেতে লাগ্‌লো।

বৌদি এসে বল্লে, খালি পেটে অতগুলো ধোঁয়া গিল্‌লে, বেলুনের মত ঊর্দ্ধপথে উড়্‌তে থাক্‌বে। ভার চেয়ে খাবে এসো, ভাত দিয়েছি।

যতীন আকণ্ঠ খেয়ে গেলো। যেমন ক'রে সে খাচ্ছিলো এতক্ষণ সিগারেট। কী অপরিসীম ক্ষুধা ওর পেটে! মনে হ'লো, ও যেন একমাস ঐ ভোজ্যদ্রব্যগুলো চোখে দেখে নি!

বৌদি চুপি চুপি এসে ব'লে গেলো, পালিও না কিন্তু। আমরা না হয় তিনজনেই আজ রাত জাগ্‌বো।

সর্বনাশ! রাত জাগ্‌বার এই অহেতুক কল্পনায় হয়তো কিছু রোমান্স থাক্‌তে পারে—কিন্তু তাতে না আছে চরিতার্থতা, না আছে মিষ্ট-অনুভূতি। নিজেকে শক্ত ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌লাম।

—উঠ্‌লে যে? বৌদি বল্লে।

—তাস খেলে রাত জাগবার মত নির্বুদ্ধিতা আমার নাই। ব'লে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ী এসেই মনে হ'লো, খুব অন্যায় ক'রে এলাম। বৌদি আমার জন্যে কি-ই বা করতে পারতো! যতীন তার স্বামী: আমি উপকারী বন্ধু হ'লেও তাকে সে অবহেলা করতে পারে না। বরং করলেই সেটা অশোভন হ'তো। ঠিক করলাম, কাল সকালেই বৌদির কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আস্‌বো। একটি রাত্রির এই লজ্জাকর-ব্যবহার আমাকে যেন দংশন করতে লাগ্‌লো।

কিন্তু সকালে বৌদির ঘরে এসে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। এ কি হয়েছে ঘরের শ্রী! সমগ্র বিশৃঙ্খল সংসারটি কাছে নিয়ে বৌদি কাঠের মত আছে ব'সে! বল্লাম, কি ব্যাপার বৌদি?

বৌদি হেসেই উত্তর দিলে, 'ঝড় হ'য়ে গেছে কাল রজনীতে রজনীগন্ধার বনে।'

বল্লাম, পরিষ্কার ক'রে বল বৌদি, কাব্য তোমার এখন রাখো।

—এত দুঃখেও যদি কাব্য না করবো, তবে করবো কবে বল? চুরি হয়েছে।

—চুরি! কি চুরি হ'লো?

—তোমার দেওয়া বাড়ীভাড়ার দু'শো টাকা, আমার গয়না—সবই।

—যতীন বাড়ী ছিলো না? উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জিগ্যেস্ করলাম।

—হাঁ, ঐগুলো নিতেই তো সে কাল এসেছিলো। ব'লে, বৌদি ক্ষীণ-শুষ্ক একটুখানি হাস্‌লে।

চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম; কি বল্‌ছো বৌদি?

ছোটবেলায় দেখেছি এই যতীনকে, নির্ভীক, সত্যবাদী, একটা উচ্ছল-নদীর মত। বল্লাম, এ যে কল্পনারও অতীত বৌদি!

বৌদি তেমনি ক'রেই ছোট্ট একটুখানি হাস্‌লে। বল্লাম, যাক্, ওসব না হয় পরে হবে। এখন রান্না-বান্নার আয়োজন কর। ওরকম ব'সে থাক্‌লে তো আর পেট মানবে না।

—তুমি বলো কি ঠাকুরপো! এখুনি হয়তো

ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে—এই কি আমার খাবার সময়!

—বাঃ, মন্দ নয়। আমিও বুঝি তোমার সঙ্গে উপোস ক'রে মর্‌বো? আর রাস্তাতেই বা দাঁড়াতে হবে কেন, আমি তো আর মরিনি।

—না, তোমার টাকা আর আমি নিতে পারবো না ঠাকুরপো! স্বামীই যদি এতখানি শত্রুতা করতে পারেন, তবে আমার কিসের সংসার! বল্‌তে বল্‌তে বৌদির স্বর কান্নায় ভ'রে উঠ্‌লো।

একটা বিশ্রী আবহাওয়ার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। জানি, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার স্পর্দ্ধা আমি করবো না; কিন্তু তাই ব'লে এও তোমাকে বল্‌তে দেবো না, একটি লোকের অভাবে তোমার সব শূন্য হ'য়ে গেলো।

বৌদি ফিক্ ক'রে হেসে ফেল্লে। বল্লে, শুনে লোভ হয় বটে। আচ্ছা, কি খাবে বল, রান্না চড়িয়ে দি।

—আজ সম্পূর্ণ সাত্বিক মতে খাবো।

—সেই ভাল। মাছ-মাংসে শুধু উত্তেজনাই আনে।

বৌদির হাতখানা জোরে চেপে ধর্‌লাম। বল্লাম, তোমার গয়নাগুলো গড়াতে দুদিন দেরি হবে, কিন্তু বাড়ী ভাড়ার ঐ দু'শো টাকা আমি এখুনি নিয়ে আস্‌ছি। তুমি স্নান ক'রে রান্নার ব্যবস্থা কর।

উত্তেজনায় সর্বশরীর আমার সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে। নিজের চলৎশক্তির ওপর একটা অখণ্ড বিশ্বাস অর্জন করলাম। ফিরে এলাম মুহূর্তের মধ্যেই।

যতীনের বাড়ীর দরজার কাছে এসেই থম্‌কে দাঁড়ালাম। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হ'লো না। বেশ স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি যতীনের গলা: একখানা সুন্দর মুখ থাক্‌লে এ পৃথিবীতে কি না হয়!—লোকগুলো কি বোকা!

—হাঁ। কিন্তু আর আমি পারবো না: এই শেষ।

—যাই বল, চমৎকার হয়েছে তোমার অভিনয়। সিনেমায় নাম্‌লে, তুমি একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হ'তে।

—লজ্জা করে না? তোমার বন্ধু এলে ব'লো, সে যেন আর এ-বাড়ীতে না আসে।

—খাবে কি এর পর?

—গলায় দড়ি দেবো, সেও ভাল। তুমি আর কি করতে বল আমাকে! এই কি মেয়েদের রূপ! ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—আমায় মুক্তি দাও: আর পারি না, পারি না এমন ক'রে—না, না, আমি আর পারবো না—আর পারবো না আমি। বল্‌তে বল্‌তে বৌদি কান্নায় ফেটে পড়্‌লো।

—যাক্, আরো একসেট্ গয়না হ'লো তাহ'লে। রজত রায়ের একসেট, আর—

আর শুন্‌বার শক্তিও বুঝি আমার লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। টল্‌তে টল্‌তে এসে দাঁড়ালাম, বড় রাস্তার ধারে। কোথাও হাওয়া নাই: একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে পৃথিবীর দম যেন আট্‌কে আছে। বিদায় বন্ধু এবং বিদায় আমার রহস্যময়ী বৌদি! একটা চলন্ত-ট্রামে উঠে বস্‌লাম। কণ্ডাক্টার জিগ্যেস করলে, কোথায় যাবেন?

বল্লাম, জাহান্নমে: যেখানে ইচ্ছা চলুক।

প্রশ্ন

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি মোরে ভুলে যাবে;—আমার স্মরণে
আসেনা এ কথা কভু। জীবনে মরণে
যে প্রেম নিয়ত থাকে পবিত্র অমল,
যৌবন সরসী-জলে শুভ্র শতদল
ফুটে থাকে নিষ্কলুষ কামনার মত
দেয় প্রাণে আনন্দের পরশ সতত।
সে প্রেমেয় প্রতিলিপি হৃদয়ের পরে
চিরস্থায়ী থাকে। কভু ভ্রান্তির গোচরে
আসেনা বলিয়া জানি, তবুও শুধাই
তোমার অন্তরে মোর স্মৃতি কিগো নাই?

অন্ধতার কারণ ও তাহার নিবারণ

ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এফ-আর-সি-এস (এডিন) ; ডি-ও (অক্সন) ;
ডি-ও-এম-এস (লণ্ডন)

অনেকেই বোধ হয় জানেন না বা খবর রাখেন না যে আমাদের দেশে কত লোক অন্ধ।

ভারতবর্ষে প্রায় দশ লক্ষ অন্ধ লোক আছে এবং ত্রিশ লক্ষ লোক আছে যাহাদের একটি চক্ষু নাই কিম্বা কোন চক্ষুরোগ আছে যাহার জন্য তাহারা দৃষ্টিহীন।

এ কথা জানা উচিত যে, উপযুক্ত চিকিৎসাদ্বারা

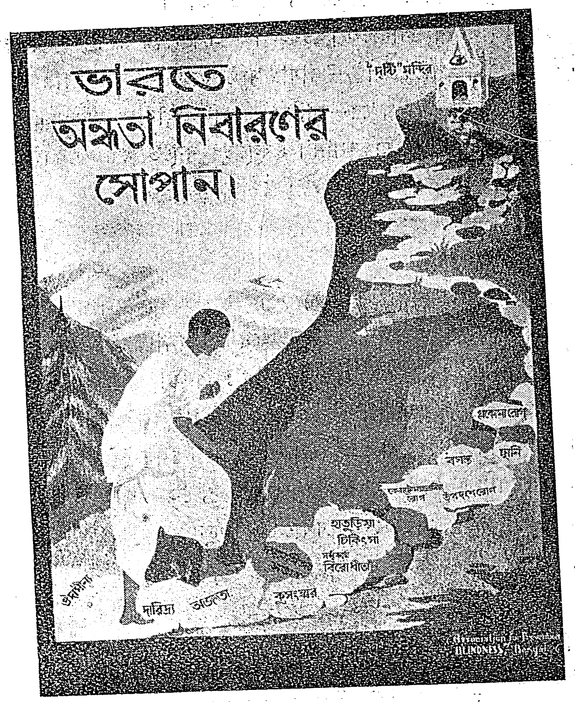

অন্ধদিগের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিতে পারে। যেমন ছানি হইলে অনেকেই দৃষ্টিশক্তিহীন হয়। বিশেষত, যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই এই ছানি রোগ দেখা যায়। ছানি হইলে অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া যদি কোন চক্ষুচিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করা যায় তাহা হইলে সহজেই এই রোগমুক্ত হইয়া দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যায়।

যখন অনেক স্থলেই অন্ধতা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় আছে তখন এত লোকের অন্ধ হওয়া উচিত নয়। সামান্য উপায় দ্বারা দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা যায়। চক্ষুর প্রতি অযত্নের জন্য অনেক শিশু অন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু অতি সহজেই তাহাদের দৃষ্টিলোপ নিবারণ করা যায়। দেখা গিয়াছে যে অন্ধতার প্রধান কারণ এইগুলি :

অজ্ঞতা
অনবধানতা
কুসংস্কার
অসহযোগ
কেরাটোম্যালেসিয়া এবং রাত্র্যন্ধতা
উপদংশ এবং গনোরিয়া (দুষ্ট মেহ)
ট্রাকোমা বা দূষিত ব্রণযুক্ত চক্ষুপত্র
বিপজ্জনক বা উগ্রবীর্য্য ঔষধ সেবন এবং ধূলা ময়লা দ্বারা চক্ষুর উত্তেজনা।
শিশুদিগের চক্ষুব্রণ
আঘাত
বক্রদৃষ্টি এবং অল্পদৃষ্টি
ছানি—অশ্রু থলির স্ফীতি
গ্লকোমা।

কেরাটোম্যালেসিয়া

এই রোগ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিশুদিগের মধ্যে দেখা যায়। ইহা উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে হইয়া থাকে। ইহাতে চক্ষুর শ্বেত অংশটি কৃষ্ণবর্ণ, ধূম্রবর্ণ, শুষ্ক এবং তৈলাক্তের ন্যায় দৃষ্ট হয়। শুষ্কতা ক্রমশ চক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ অংশে চলিয়া যায় ও এই স্থানটি হলদে ব্রণযুক্ত হয় এবং

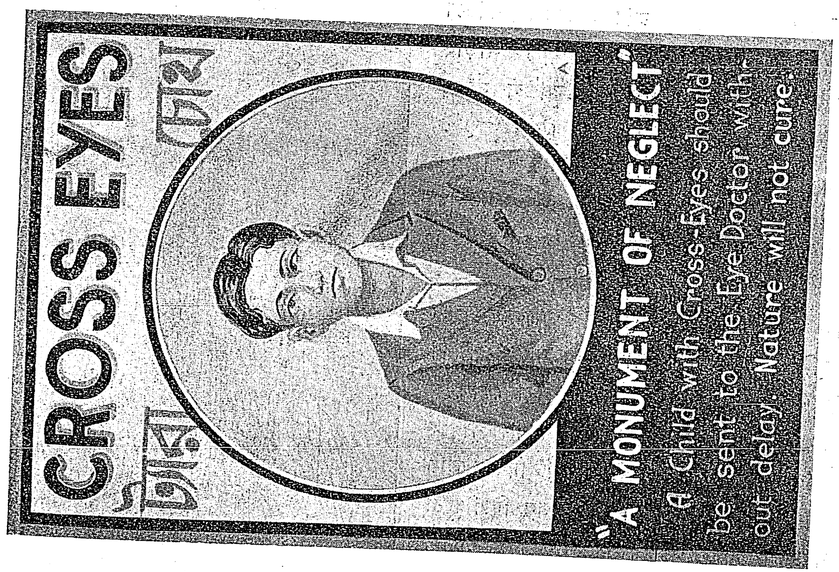

প্রায়ই দৃষ্টিশক্তির লোপ হয়। রাত্র্যন্ধতা আরও সাধারণ রোগ এবং কেরাটোম্যালেসিয়ার ন্যায় ইহা একই কারণে জন্মায়। এই সকল রোগ নিবারণের উপায়—প্রত্যহ আড়াই পোয়া আন্দাজ টাট্‌কা দুধ খাওয়া, কিম্বা দুই আউন্স মাখন খাওয়া, কিম্বা টাট্‌কা শব্জি, গাজর, কপি, টম্যাটো প্রভৃতি খাওয়া। স্তন্যপায়ী শিশুর এই রোগ হইলে এবং শিশুর মাতা স্বাস্থ্যবতী না হইলে শিশুর মাতাকে প্রত্যহ দুইবার করিয়া এক হইতে চারি চামচ কডলিভার অয়েল দেওয়া দরকার।

এই সকল রোগ হইলে কড্‌লিভার অয়েলই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। কড্‌লিভার অয়েল দুষ্প্রাপ্য হইলে পাঁঠা বা ভেড়ার মেটে অল্প মসলার সহিত পাক করিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। কেরাটোম্যালেসিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চক্ষু দুটি পরিষ্কার রাখিতে হইবে। চক্ষু দুইটি দিবসে চারি হইতে ছয় বার বোরিক লোসন্ বা লবণ জল দিয়া ধুইয়া চক্ষুর মধ্যে কয়েক ফোঁটা ক্যাষ্টর অয়েল (খাঁটি রেড়ির তৈল) দিবে। (এক পাঁইট ফুটন্ত জলে দুই চায়ের চামচ বোরিক এসিড পাউডার কিম্বা এক চায়ের চামচ সাধারণ লবণ ফেলিয়া দিয়া জল ঠাণ্ডা হইলে এই লোসন ব্যবহার্য্য)।

(ক) শিশুদিগের পেটের দোষ (পরিপাক যন্ত্রের দোষ) থাকিলে সর্ব্ব প্রথমে ইহার চিকিৎসা করা উচিত।

উপদংশজনিত রোগ

(ক) সিফিলিস্ (সাধারণ লোক যাহাকে গরমি বলে)—ভারতের নানা স্থানে, বিশেষত কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের ন্যায় বড় বড় নগরে উপদংশই বহু লোকের অন্ধতার কারণ। এই কারণে অন্ধতা হইলে বিশেষজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। যত দিন না রক্ত পরীক্ষার দ্বারা বুঝা যায় যে, রোগ সমূলে বিনষ্ট হইল তত দিন চিকিৎসা চালাইতে হইবে। যুবকেরা বিবাহের পূর্ব্বে উপদংশ রোগাক্রান্ত হইলে কোন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে চলা তাহাদের বিশেষ দরকার। উপদংশ রোগে ভুগিয়াছে এমন কোন লোকের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া

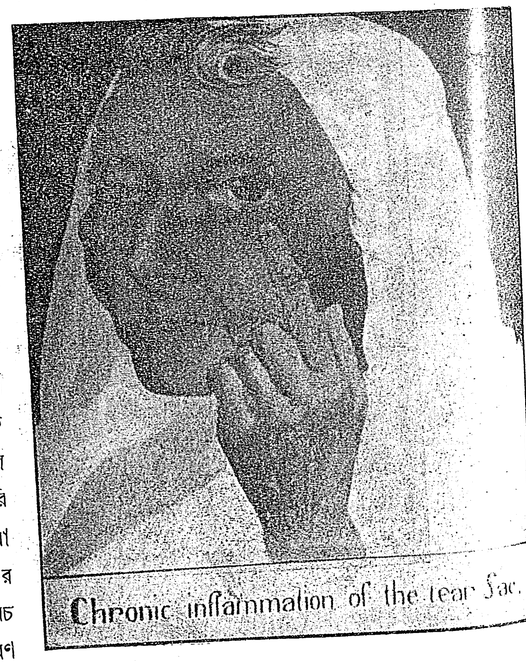

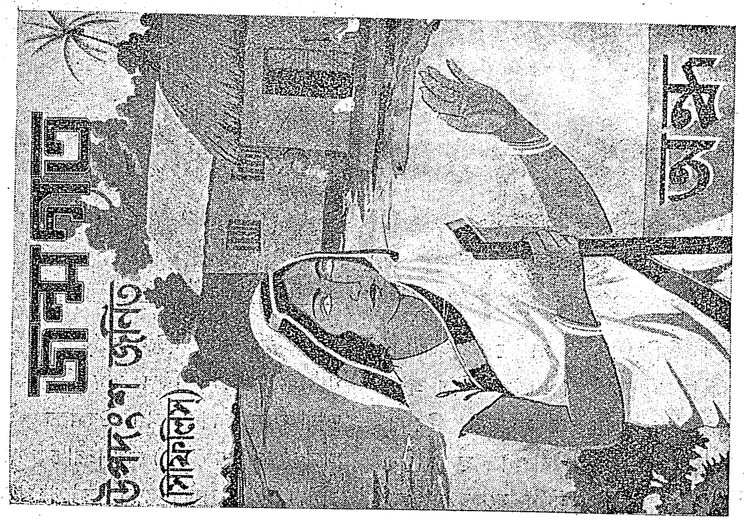

গেলে কিম্বা—চক্ষু লাল ও বেদনাযুক্ত হইলে অবিলম্বে কোন চক্ষু চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া উচিত।

গনোরিয়া

(দুষ্ট মেহ, যাহাকে জনসাধারণ ধাতের ব্যামো বলে) —গনোরিয়ার উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে ভীষণ চক্ষু-রোগ উপস্থিত হইতে পারে। রোগের প্রারম্ভেই যদি ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা না হয় তাহা হইলে চক্ষুর বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে বা চক্ষু দুইটি অন্ধ হইতে পারে। গনোরিয়া আক্রান্ত রোগী যতদিন না সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য

হয় ততদিন তাহাকে চিকিৎসাধীন থাকিতে হইবে। তাহাকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন দূষিত স্রাব কোনরূপে হস্ত বা তোয়ালে বা গামছার সহযোগে নিজের বা অপরের চক্ষু স্পর্শ না করে। গনোরিয়া আক্রান্ত রোগীর চক্ষুরোগ উপস্থিত হইলে অবিলম্বে চক্ষু চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া উচিত।

ট্রাকোমা বা ব্রণযুক্ত চক্ষুপত্র

এই রোগে চক্ষু স্ফীত হয়। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক। ভারতে ইহা খুবই দেখিতে পাওয়া যায় এবং শিশু-দিগের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। অধিকাংশ স্থলে এই রোগ চক্ষুর উপরের পাতার নিম্নভাগ আক্রমণ করে। ইহাতে রোগীর চক্ষুর পাতা ভারি দেখায়। রোগের প্রারম্ভে চিকিৎসা করিলে এই রোগ সারিয়া যায়। কিন্তু যদি সুচিকিৎসা না হয় তাহা হইলে ইহা হইতে কর্নিয়ায় অর্থাৎ চক্ষুর বাহ্যদৃষ্টিতে কাল অংশের উপর ঘা প্রভৃতি হইয়া থাকে এবং ইহাতে চিরকালের মত দৃষ্টিশক্তির হানি হয় এবং অনেক স্থলে রোগী অন্ধ হইয়া যায়।

যদি কোন শিশুর এই রোগ হইয়াছে বলিয়া

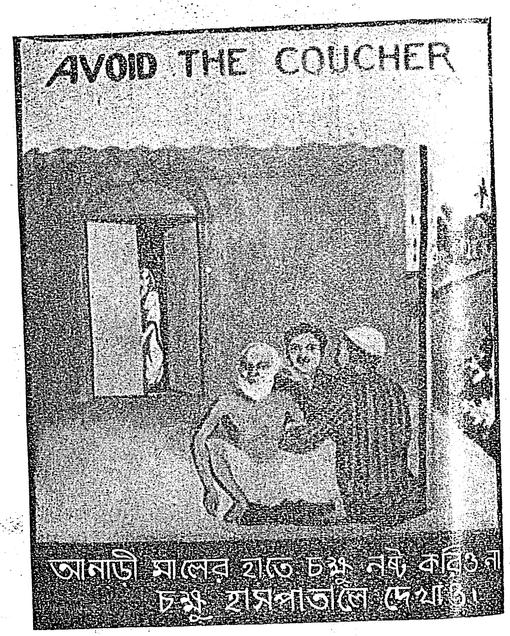

সন্দেহ হয় তাহা হইলে তাহাকে চিকিৎসকের নিকট পাঠাইতে হইবে; কিন্তু যদি চিকিৎসক পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কোন ভাল ঔষধালয় হইতে বিশুদ্ধ ক্যাস্টর অয়েল (রেড়ির তেল) আনাইয়া চক্ষু মধ্যে প্রয়োগ করিলে চলিবে। এই ক্যাস্টর অয়েল প্রয়োগের পূর্ব্বে প্রত্যহ চারি হইতে ছয় বার চক্ষু দুইটি লবণ জলে কিম্বা বোরিক লোসানে ধুইতে হইবে। (এক পাঁইট ফুটন্ত জলে এক চায়ের চামচ সাধারণ লবণ বা দুই চায়ের চামচ বোরিক এসিড পাউডার

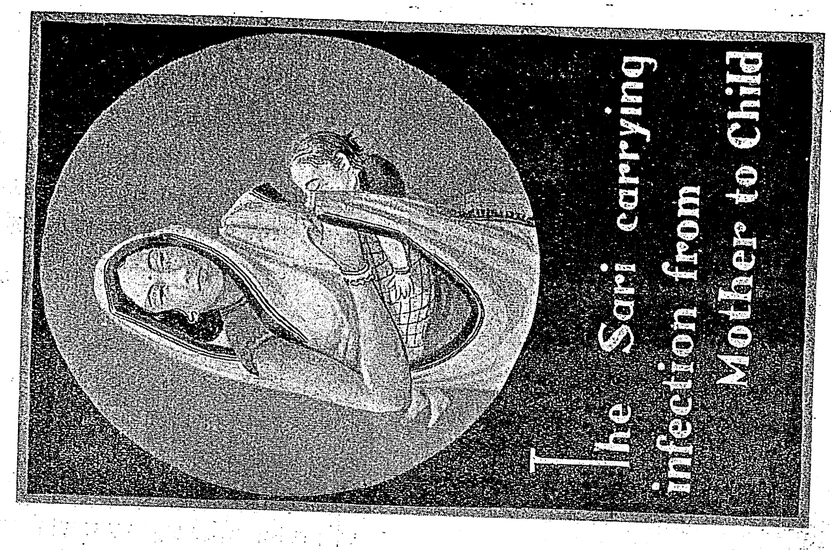

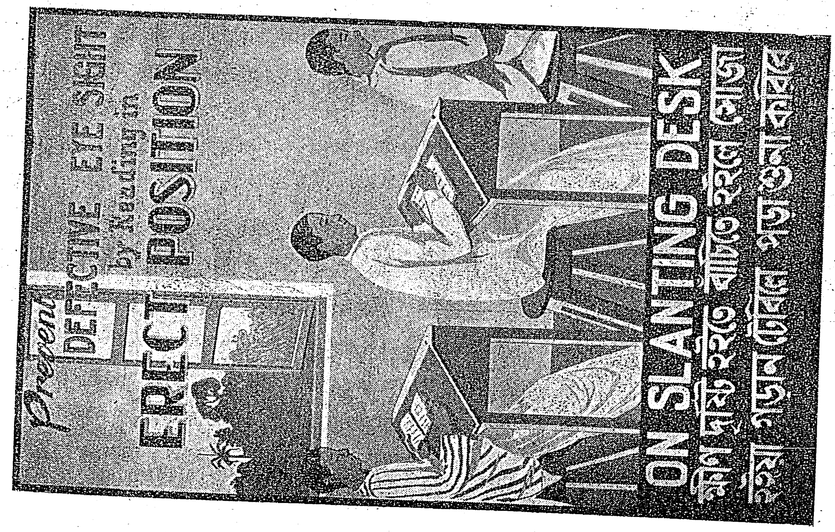

ফেলিয়া শীতল হইলে ব্যবহার করিবে)। তূলা পাঁচ মিনিট উত্তমরূপে জলে ফুটাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা হইলে সেই ভিজা তূলা দিয়া আক্রান্ত চক্ষু মুছাইয়া দিবে। এই রোগে আক্রান্ত শিশুদিগকে নীরোগ শিশুদিগের সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত নয়। সাবান জলে হাত মুখ ধুইয়া পরিষ্কার রাখিলে, অপরের ব্যবহৃত গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি, অন্যের ব্যবহৃত সুরমা, সুরমার কাঠি, কাজল প্রভৃতি ব্যবহার না করিলে এবং (মাছি দুষিত চক্ষু হইতে নির্দ্দোষ চক্ষুতে বিষ বহন

করে বলিয়া) চক্ষুতে মাছি বসিতে না দিলে এই রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। ট্র্যাকোমা রোগী দেখিবার পর কার্বলিক-সাবান ও জল দিয়া উত্তমরূপে হাত ধুইয়া ফেলিবে।

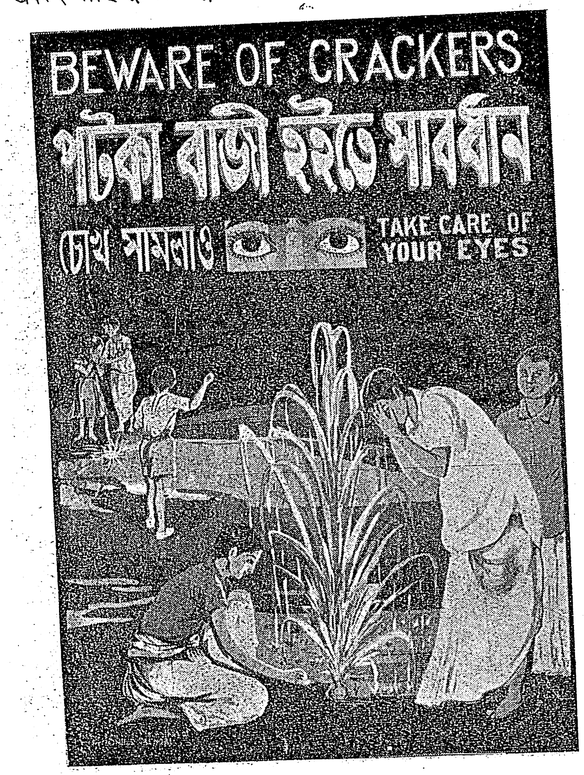

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদিগের মধ্যে যদি কেহ ট্র্যাকোমা আক্রান্ত হয় তাহা দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা হওয়া উচিত। এই রোগাক্রান্ত ছাত্রদিগের সুচিকিৎসা হওয়া উচিত এবং নীরোগ ছাত্র হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখা উচিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা কতদূর প্রয়োজনীয় ইহাও তাহাদিগের শিক্ষা হওয়া উচিত।

বসন্ত

অন্ধতার একটি প্রধান কারণ বসন্ত। প্রত্যেক শিশুকে পুনঃ পুনঃ টিকা দিলে এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। জন্মের অল্পকাল পরে টিকা দিয়া শিশুদিগকে সাত বৎসর অন্তর টিকা দেওয়া উচিত; বিশেষত যে সময়ে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হয় সে সময়ে টিকা দেওয়া দরকার। কোন লোকের বসন্ত হইলে তাহার চক্ষু দুই ঘণ্টা অন্তর গরম লবণ জলে কিম্বা বোরিক লোসনে ধৌত করা উচিত এবং প্রত্যহ রাত্রে একটু বিশুদ্ধ ভেস্‌লিন্ তাহার চোখের পাতায় কাজলের মত দেওয়া উচিত। এই রোগের বৃদ্ধির সময় চোখের পাতা বন্ধ রাখা উচিত এবং ধুইবার সময় কেবল খোলা উচিত। বসন্তরোগে চিকিৎসকের পরামর্শ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এন্‌টারিক জ্বরে, হামে, কলেরায় এবং অপরাপর স্থায়ী রোগে রোগীর চক্ষুর যত্ন লওয়া বিশেষ দরকার।

বিপজ্জনক ও উগ্রবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ

ভারতে হাজার হাজার লোক অচিকিৎসকের (হাতুড়ের) হাতে পড়িয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সকল অশিক্ষিত লোক রোগীকে নানা কথায় মুগ্ধ করিয়া সুচিকিৎসকের আশ্রয় লইতে দেয় না এবং সময় থাকিতেও তাহাদের চোখের চিকিৎসা হইতে দেয় না। এই সকল হাতুড়ে চক্ষুর মধ্যে বিপজ্জনক ও উগ্রবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এবং দুষিত যন্ত্র চক্ষুমধ্যে প্রয়োগ করিয়া চক্ষুর বিশেষ অনিষ্ট করে। ইহারা একই কাঠির সাহায্যে নানা লোকের চোখে সুরমা দিয়া বা একই আঙুলে কাজল দিয়া ট্র্যাকোমার সংক্রমণ বহন করে। চক্ষুরোগ হইলে সুচিকিৎসকের পরামর্শ লইবে, কখন হাতুড়ের কাছে যাইবে না। স্মরণ রাখা উচিত যে চোখ ফুলিলে বা চোখ উঠিলে, উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে দৃষ্টিশক্তি বিশেষভাবে হীন হইতে পারে।

ধূলা বা ময়লার উত্তেজনায় চক্ষু সহজেই ফুলিয়া উঠে এবং ইহা অগ্রাহ্য করিলে কর্নিয়ায় ঘা হইতে পারে

এবং দৃষ্টিশক্তির লোপ হইতে পারে। হাত মুখ দিনে দুইবার সাবান জলে ধুইবে এবং পরিষ্কার রাখিবে। যে সময় ধূলা উড়িতে থাকে সে সময় চক্ষুর আবরণ ব্যবহার করা উচিত। রেল গাড়ীতে চাপিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া এন্‌জিনের দিকে চাহিবে না। চোখে ধূলা কিম্বা ময়লা পড়িলে পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিবে, লবণ জল হইলে আরও ভাল হয়, (কখন চোখ রগড়াইবে না) এবং কয়েক ফোঁটা ক্যাষ্টর অয়েল চোখে দিবে। যদি ইহাতে আরাম না হয়, চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। তোমার মঙ্গলকামী কোন বন্ধুকে অপরিষ্কার রুমালের কিংবা কাপড়ের খুঁট দিয়া ধূলা কিম্বা ময়লা বাহির করিতে দিবে না; ইহাতে অনিষ্টকারী কোন পদার্থ চোখে প্রবেশ করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে।

শিশুর চক্ষুব্রণ

(চোখের ঘা—অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া নিওনেটোরাম): ইহা গনোরিয়া বা ধাতু-পীড়াজনিত চক্ষুর স্ফীতি। নবজাত শিশুর ইহা অতি সাধারণ রোগ। জন্মের সময় শিশুপ্রসবদ্বার হইতে এই বিষ গ্রহণ করে এবং তিন-চার দিন পরে বা এক সপ্তাহের মধ্যে শিশুর চক্ষু হইতে এক প্রকার হল্‌দে স্রাব নির্গত হয় এবং চোখের পাতা ফুলিয়া যায় ও লাল হয়। এই স্রাব অত্যন্ত সংক্রামক এবং অপরের চোখে প্রবেশ করিলে এই রোগ উৎপাদন করে। কোন শিশুর এই রোগ হইলে তাহাকে অবিলম্বে চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাওয়া উচিত। শীঘ্র চিকিৎসা না হইলে চক্ষু নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই ধাত্রী যদি কয়েক ফোঁটা ১% সিল্‌ভার নাইট্রেট্ সলিউসন্ শিশুর চক্ষুতে প্রয়োগ করে তাহা হইলে এই রোগের আশঙ্কা কম হইয়া যায়। গ্রেট্ ব্রিটেন্, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই ফলপ্রদ অথচ নির্দ্দোষ ঔষধ প্রয়োগ এক প্রকার বাধ্যতামূলক হইয়াছে। প্রত্যেক চিকিৎসক ও ধাত্রী ইহা জানেন এবং প্রত্যেক গৃহস্থেরই ইহা জানা উচিত।

দুর্ঘটনা, আঘাত বা অপঘাত :—

যে স্থানে অনেক কলকারখানা আছে, সে স্থানে আঘাত বা অপঘাতে অনেকের চক্ষু নষ্ট হয়। এই সমস্ত কল-কারখানায় যাহারা কাজ করে এবং যাহাদের চক্ষুর বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহাদের চক্ষু রক্ষা করিবার জন্য গগল্ (ঠুলি চশ্‌মা) মুখোস্ প্রভৃতি ধারণ করা উচিত। লাঠি ঘুরাইলে, ঢিল ছুঁড়িলে বা পটকা বাজি লইয়া খেলা করিলে চোখে কিরূপে আঘাত লাগিয়া চোখ নষ্ট হইতে পারে তাহা ছেলেদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ঠুলি চশ্‌মা না পরিয়া ছেলেরা যেন কখন পটকা বাজি লইয়া খেলা না করে।

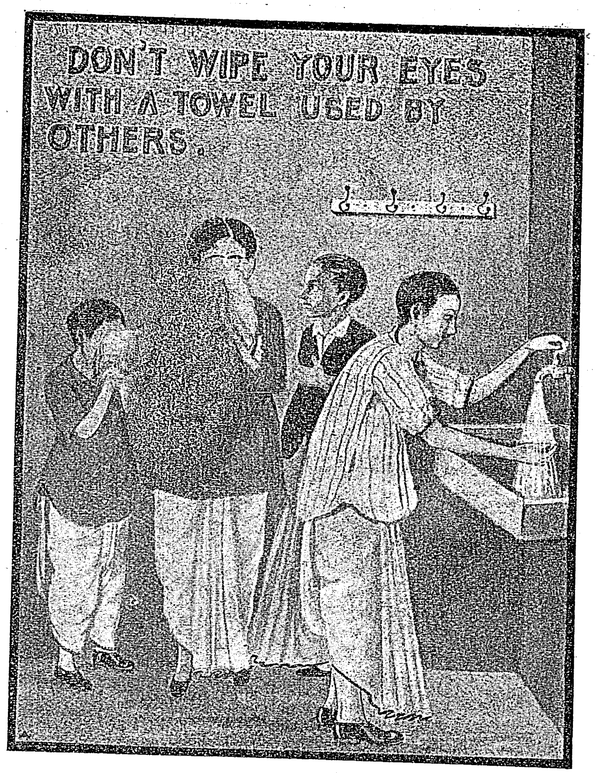

প্রসবের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা যদি চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া জানিতে পারে যে প্রসব সহজ হইবে না অর্থাৎ কষ্টসাধ্য হইবে, তখন প্রসবের সময় সন্তানের চোখে কোনরূপ আঘাত আশঙ্কা করা স্বাভাবিক। এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ থাকে না যদি প্রসবের সময় স্ত্রীলোকেরা হাসপাতালে যায় বা কোন সুদক্ষা স্ত্রী-চিকিৎসকের সাহায্য লয়।

যখন কোন আঘাতে চোখ কাল হইয়া যায় তখন

ঠাণ্ডা জলে চোখ ধুইয়া ফেলিয়া এক টুকরা পরিষ্কার কাপড় বরফ জলে ভিজাইয়া কয়েক পাট করিয়া জল নিংড়াইয়া ফেলিয়া চোখের উপর দিয়া একখানি রুমাল দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। যদি আঘাত সাংঘাতিক হয়, চিকিৎসককে দেখাইতে দেরী করিবে না।

ট্যারা বা গজচক্ষু, মাইওপিয়া বা অদূরদৃষ্টি

ট্যারা বা গজচক্ষু : ট্যারা বা গজচক্ষু সাধারণত তিন

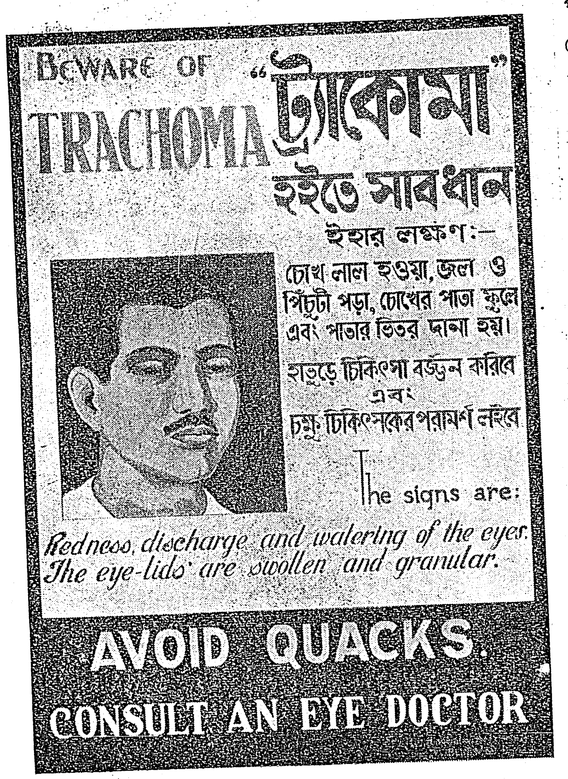

হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে প্রকাশ পায়। যখনই ইহা প্রকাশ পাইবে তখনই শিশুকে কোন চক্ষুচিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইবে। শিশুর বয়স যত কম হইবে আরোগ্যের সম্ভাবনা তত বেশি থাকিবে এবং আরোগ্যও তত অল্প সময়ের মধ্যে হইবে। চিকিৎসা যদি খুব দেরীতে হয় তাহা হইলে ট্যারা চোখটি অকর্ম্মণ্য কিম্বা অন্ধও হইতে পারে।

অদূরদৃষ্টি

যে-লোকের অদূরদৃষ্টি হইয়াছে সে বিশ ফুট তফাতে কোন জিনিষ স্পষ্ট দেখিতে পায় না, ঝাপসা ঝাপসা দেখে; কিন্তু খুব কাছের জিনিষ বেশ দেখিতে পায়। এইজন্য সে কোন বই পড়িতে হইলে বা সূক্ষ্ম কাজ দেখিতে হইলে বইখানি বা সূক্ষ্ম কাজটি চোখের খুব নিকটে ধরে। এই রোগ শৈশবে আরম্ভ হয় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সে শিশু যখন পড়িতে আরম্ভ করে কিংবা কোন সূক্ষ্ম বা মিহি কাজ দেখিতে আরম্ভ করে সেই সময়ে জোর করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে গিয়া এই রোগে আক্রান্ত হয়। যে সময়ে শিশু জোর করিয়া এই ভাবে তাহার দৃষ্টিশক্তি ক কোন জিনিষে নিয়োগ করে সেই সময়ে যদি শিশুর দৃষ্টিশক্তি জোর করিয়া ব্যবহার করিতে না দেওয়া হয় তাহা হইলে এই রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এই সময়ে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা উচিত :

(১) শিশু যে পুস্তক পড়িবে তাহার অক্ষর বড় বড় হওয়া দরকার। শিশুর বয়স যত কম হইবে অক্ষর তত বড় হওয়া চাই।

(২) পুস্তক কিম্বা কোন জিনিষ দেখিতে হইলে চোখ হইতে এক ফুটের বেশি কাছে ধরিবে না।

(৩) আলো মাথার পিছন হইতে একটি কাঁধের উপর দিয়া আসা চাই।

(৪) মাথা খাড়া করিয়া রাখা চাই। শিশু যেন ঝুঁকিয়া লেখা পড়া না করে বা শুইয়া শুইয়া না পড়ে।

(৫) শিশুকে প্রচুর আলোকে পড়িতে বা কাজ করিতে দিতে হইবে। কৃত্রিম আলোক অপেক্ষা দিনের আলোকই ভাল। সাধ্যমত শিশুকে রাত্রে পড়িতে দিবে না। সাদা আলোক অপেক্ষা কোমল হলদে আলোক ভাল।

(৬) ছয়-সাত বৎসরের শিশুকে একসঙ্গে আধ ঘণ্টার বেশি পড়িতে দিতে নাই কিম্বা সমস্ত দিনে দুই-তিন ঘণ্টার বেশি পড়িতে দিবে না।

(৭) শিশুকে খালি পেটে অর্থাৎ প্রাতরাশের পূর্ব্বে পড়িতে দিবে না।

যে সকল শিশুর পিতামাতার অদূরদৃষ্টি রোগ আছে সেই সকল শিশুর চোখের বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত।

যে শিশু বার ইঞ্চিরও বেশি নিকট হইতে বই পড়ে বা কোন কাজ দেখে, কিম্বা দূরের জিনিষ দেখিতে গেলে চোখের পাতা সঙ্কুচিত করে বা ২০ ফুট দূর হইতে বোর্ড দেখিতে পায় না, তাহাকে অদূরদৃষ্টি রোগে আক্রান্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং একজন চক্ষুচিকিৎসকের নিকট তাহাকে পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য পাঠাইতে হইবে।

অদূরদৃষ্টি রোগ (শর্ট সাইট্) ভাল হয় না, কিন্তু চক্ষুচিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে উপযুক্ত চশমা ব্যবহার করিলে ইহার গতি বন্ধ হয়। উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা এবং প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু ও ঘরের বাহিরে ব্যায়ামাদির সাহায্যে রোগীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে। এই সমস্ত অবলম্বন করার পরও যদি রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে রোগীর লেখাপড়া বা চোখের নিকটের কাজ সমস্ত বন্ধ করিয়া দিতে হইবে যে পর্য্যন্ত না রোগের বৃদ্ধির প্রবৃত্তি কমিয়া যায়।

ছানি

বৃদ্ধ বয়সে যখন দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসে তখন

আলোর চারিদিকে রামধনু রং-এর চাকা বিপদের লক্ষণ।

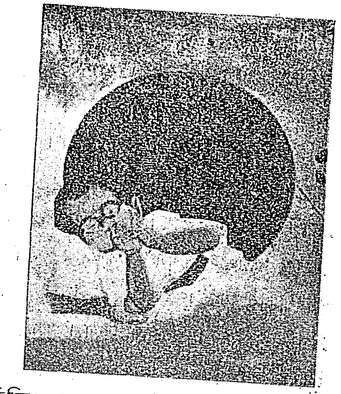

উপায় তাহা চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। হাতুড়ের হাতে কখনও যাইবে না। ছানি হইতে যে অন্ধতা জন্মে সে অন্ধতা চিকিৎসা দ্বারা দূর হয়, কিন্তু হাতুড়ে অনেকের চক্ষু নষ্ট করিয়া দেয়।

গ্লকোমা

এইরূপ হইলেই চক্ষুচিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। অধিক বয়সে বিকালের দিকে মধ্যে মধ্যে মাথা ধরা এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিক দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা কখনও অবহেলা করিবে না।

বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের প্রায় অশ্রুথলির স্ফীতি দেখা যায়। চক্ষুর নাকের দিকের কোণে ভিতর দিকে চাপ দিলে পুঁজ নির্গত হয়। যদি ইহার বিধিমত চিকিৎসা না হয় তাহা হইলে চক্ষু ভীষণভাবে ফুলিতে পারে এবং নষ্টও হইতে পারে।

মরণে জাগরণ

শ্রীসুভদ্রা রায়

একি জাগরণ এ আমার ঘুম
আমি কি আমিই জানি না বুঝি।
স্বপ্ন জীবন ছুটিয়া চলেছে
মরণের ঘোর সুপ্তি খুঁজি॥
অপরূপ লোকে ভাঙ্গিবে সে ঘুম
চির-জাগরণে জাগিব সেথা।
পিছনে পড়িয়া রবে দিগন্ত
অতীতে ডুবিবে অতীত কথা॥
পৃথিবী আমার মদের বোতল
আছি অচেতন চেতনাহীনা।
মরণ আসিয়া ছুঁইলে হাসিয়া
চক্ষু মেলিব চক্ষুহীনা॥
সুখের অধিক দুঃখই হেথা
অবসাদ আছে সুখের মাঝে।
মায়ার মাল্য কাজলের ফুল
দিনের আলোকে মরে সে লাজে॥
ওপারে নাহিরে এ পারের ছায়া
অনিমেষ চোখে পলক নাই।
জাগিব সেথায় আমি অনন্ত
মরণের পারে মুক্তি চাই॥

ভূস্বর্গ-চঞ্চল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

উষা !

তোমার কথা ভূস্বর্গ-চঞ্চলে ইতিপূর্ব্বেই লিখেছি তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও। এবারো তোমাকেই তাগ ক'রে মোচন করি আমার উনশেষ পত্রবাণ। আমাকে তুমি ছুষতে পারবে না, যেহেতু আমি তোমাকে যথাবিধি শাসিয়ে রেখেছিলাম। তাছাড়া, তোমার সঙ্গে আলাপ সেদিনের হ'লেও মনে হয় যেন বহু দিনের বহু বিচিত্র। বিশেষ ক'রে ৺ধরণীদার সূত্রে। জুনে তোমার সঙ্গে শিলঙে আমাদের দেখা আনন্দের উচ্ছল লগ্নে। তারপরো এ পরিচয় তাঁরি তর্পণে পরিণতি লাভ করে তাঁরই বিয়োগ-বেদনার মধ্য দিয়ে—পত্রালাপে। মানুষে মানুষে একটা সুন্দর বন্ধন গ'ড়ে ওঠে নানা পথে। তাদের মধ্যে একটা সেরা পথ হ'ল—যখন দুজনেই দুজনকে ছোঁয় আর একজনের স্নেহমাধ্যস্থের প্রণালীতে। জীবনে 'কমন য়্যাডমিরেশন' বড় সুন্দর জিনিষ। ৺ধরণীদার আনন্দ-সান্নিধ্যের মধ্যে দিয়ে তোমার আমার পরিচয় এইভাবে আরো গ'ড়ে উঠেছিল—তুমি জানো। কেবল তুমি জানো না, তিনি তোমাকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন। স্নেহ করা আমাদের পক্ষে খানিকটা সহজ—তার মালমশলার অনেকখানিই জোগায় আমাদের প্রাণশক্তি। আত্মীয়তা করা আরো সহজ—যেহেতু এর জোগান দেয় শুধু আমাদের সমাজ নয়—আমাদের সমাজপুষ্ট নিশুকে বৃত্তিগুলি। কিন্তু কঠিন হ'ল স্নেহের প্রাণশক্তিকে শ্রদ্ধার আন্তর শক্তি দিয়ে সুসম্পূর্ণ সুসমঞ্জস ক'রে তোলা। এ কঠিন কাজটি ধরণীদা পারতেন তুমি জানো। তোমার সরলতাকে তাই তো তিনি এত বড় ক'রে দেখতে পেরেছিলেন। অমন কর্মকৌশলী হ'য়েও তিনি নিজের স্বভাবের শ্যামলতাকে রেখেছিলেন সতেজ। সরলতা স্বভাব-শ্যামল, শ্যামলতা স্বভাব-সরল। তোমাদের মধ্যে জানাজানি হয়েছিল এই জন্যেই। সরলতা যেন ফুল, শ্যামলতা যেন লতা। এদের মধ্যে মৈত্রী হবে এতে বিস্ময়ের কী আছে? অথচ তুমি বিস্মিত হয়েছিলে অনুভব ক'রে যে, ধরণীদা তোমাকে শাসন করা সত্ত্বেও এত আপনমনে করতেন। আপনমনে করতেন ব'লেই তো শাসন করতেন ভাই। তিনি আমাকে জনান্তিকে বলতেন প্রায়ই: উষা এত বেশি সহজে অন্যকে বিশ্বাস করে যে আমার ভয় হয় ও ঠকবে অনেকের কাছেই। তখন ও ভারি ঘা খাবে।

ধরণীদা উদার লোক ছিলেন, শ্যামল মানুষ ছিলেন, কিন্তু ঠকতে একান্তই নারাজ। তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে কোমলতা যথেষ্ট থাকলেও গাঁথুনি ছিল পাকা। তিনি জানতেন ফুলধনু কাব্য কথা, শুধু ফুল দিয়ে ধনুক গড়া যায় না—যদি না ফুলের নীচে থাকে বাঁকারি। লালিত্য ভালো জিনিষ, কিন্তু নির্ভেজাল লালিত্য দিয়ে কোনো পাকা কাজ হয় না—বনেদের মধ্যে থাকাই চাই কাঠিন্য। তোমার কুসুম-কোমলতায় তাই তিনি সময়ে সময়ে শঙ্কিত হ'য়ে উঠতেন—বিশেষ ক'রে পেট্রিয়টদের বাগ্মিতায়ও তুমি অভিভূত হ'তে ব'লে। (অথচ মনে রেখো পেট্রিয়ট বলতে এখানে আমি খাঁটি দেশভক্ত বুঝছি না) খাঁটি মানুষ যেখানেই দেখি শ্রদ্ধা আসে—যেহেতু সংসারে ভেজালই যে সাড়ে পনর আনা। পেট্রিয়ট বলতে আমি বুঝছি—(কি বলব?) পেট্রিয়ট আর কি। এদের ধরণীদা কোনো দিনও নেকনজরে দেখেন নি। তাই তোমাকে সভ্রূভঙ্গে বলতেন থেকে থেকে (মনে আছে?)—

নিত্তি করে যারা বক্তৃতা—তারা
যা বলে প্রায়ই মেকি।

তাই বলি: "উষা! ভুলো নাকো ভূষা
বাহিরের শুধু দেখি'।

ঠিক এই কথা বলতেন আমার আর এক প্রিয় বন্ধু ৺ধর্মবীর। ধরণীদার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মারা গেলেন—কাগজে পড়লাম এই সেদিন। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য খুব ভালো লোকের তলব হ'ল একই মাসে—এই জুলাইয়ে। অথচ এই সেদিনো এ দুটি মানুষ কত গল্পালাপই করেছে লাহোরে!

ধর্মবীরের কথা ইতিপূর্বে ভূস্বর্গ-চঞ্চলে লিখেছি। আমার মনটা তুমি জানো—যাকে বলে প্রগতিশীল, আমি ঠিক সে ভাবের ভাবুক নই। আমি স্বভাব-বুর্জোয়া একথা স্বীকার করতে একটুও লজ্জা পাই না। আমাকে ভুল বুঝো না। আমি বলি না যে বুর্জোয়া-সংস্কৃতির মধ্যে নিন্দনীয় কিছুই নেই। কোন্ সংস্কৃতির মধ্যে নেই? আমি শুধু বলি যে বুর্জোয়া-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নমুনা যেসব মানুষ, তাদের চরিত্র সব জড়িয়ে মনুষ্যত্বের মুখোজ্জ্বল করেছে একথা অকুতোভয়ে বলা চলে। ধরণীদা ও ধর্মবীরের কথা স্মরণ ক'রে একথা বলতে আজ আরো একটু জোর পাচ্ছি—distance lends perspective to the view ব'লে।

পেশোয়ার থেকে ফিরে যখন ধর্মবীরের ওখানে পুনরায় ভৌতিক আতিথ্য স্বীকার করি তখনো মনে হয়েছিল একথা। ওখানে সমস্ত বড় হিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। শুধু টাকা দিয়ে নয়—(দানেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত—না জানে কে?)—নিজের শ্রম ও স্বাস্থ্য দিয়েও তিনি জনসেবা করতেন অকাতরে। সামান্য অবস্থা থেকে তিনি ধনশালী হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতির মাধুর্য একটুও হারান নি ধনাগমে—যেমন অনেকেই হারান দেখি। এখানে ধরণীদা ও ধর্মবীরের মিল ছিল গভীর। হয়ত বিশেষ ক'রে সেই কারণেই এ দুটি মানুষ প্রথম দর্শনেই পরস্পরের কাছে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল।

এ-বন্ধুত্ব হয় ওদের আরো একটা কারণে। ধর্মবীর ধরণীদাকে ও আমাকে ধরেন—লালা লাজপৎ রায়ের যক্ষ্মা-হাসপাতালের জন্যে একটা জলশা ক'রে কিছু টাকা তুলে দিতে। ধরণীদা তৎক্ষণাৎ রাজি। উমা ও এষা থাকায় আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল, কারণ উমার গানের সঙ্গে এষার নাচ সহজেই জ'মে যেত। কিন্তু হ'লে হবে কি—"গাবে?" প্রশ্নে যেমন শিশুর মুখে তৎক্ষণাৎ জোগায় হাঁ—কোথাও "গান গাইবে?" প্রশ্নে উমার মুখে তেমনি সহজে জোগাত—না। কিন্তু ধরণীদা এসব ক্ষেত্রে ছিলেন নাছোড়বন্দ, বললেন: "হাসি, গান গেয়ে যদি পরের এ হেন উপকার হয় তবে গানের আরো বেশি সার্থকতা।" আর যাবে কোথা? ঝোপ বুঝে আমিও মারলাম কোপ। বললাম ও কে: "হাসি, এ হ'ল লাহোর—বাঘা উর্দুর দেশ, এখানে ভেতো বাংলা চলবে না, তোমাকে গাইতে হবে উর্দু গজল—অমজদের, আরো নিভাও উলফৎকা ইন্দো নাজুকোঁমে সখ্তমুশকিল হয়। চ্যারিটিতে তোমার গজল গাওয়ার হাতে খড়ি হোক।"

ওমা! মেয়ে মূর্চ্ছা যায় কি শুনে!
ছল ছল চক্ষে গদগদ কণ্ঠে বলল আমাকে বেপথুমানা উমা:
এই বিভূঁয়ে গান গাওয়া! আর
চ্যারিটিতে? কাঁপছে গা!

এষা—নৃত্যরতা

তার ওপরে উর্দু গজল!
পা মাটি আর পাচ্ছে না।
মানি—মিঠে উর্দু গজল
কিন্তু—ভেবে রক্ত হিম—
ও গালভরা উচ্চারণে
ফল যদি হয় ঘোড়ার ডিম?
জিভের সাথে ঝগড়া তালুর
দাঁতের সাথে ঠোঁটের হায়!

এক ফোঁটা এই বঙ্গবালার
বেঘোরে প্রাণ বুঝি যায়।

অম্‌নি ধরণীদা ধম্‌কে উঠত :

পারবি যখন বলছে দাদা
গানের গুরু—তবুও তোর
এ কী মিছে ভয় বল্ তো
মনের কেন হয় না জোর ?
রাগাস নে আর আমায় হাসি !
ভয়ে মেয়ের কাঁপছে গা ?
শোন্ কথা—তোর গান নিয়ে কি
বাপ মা মাসিও ভাবছে না ?
উচ্চারণের ক্যাশুয়াল্‌টি
জিভ-তালব্য লড়াইয়ে
না হয় হ'লই দুটো—শেষে
সুর বাঁচাবে—ধরাই এ।

উমাকে এইভাবে অনেক তুতিয়ে পাতিয়ে, আগে থাকতে রাচনিক সান্ত্বনার গন্ধমাদনের জোগাড় রেখে হবু-লঙ্কাকাণ্ডের ফায়ার ব্রিগেডের ব্যবস্থা ক'রে, সারঙ্গি-ওয়ালাদ্বয়ের উৎসাহ-পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণের পরে ওকে দিয়ে তবে তো ঐ উর্দু গজল দুটি গাওয়ানো গেল। এ দুটি গ্রামোফোনেও বড় সুন্দর হয়েছে ওর কণ্ঠলাবণ্যের গুণে। ওস্তাদরা যতই কেন বলুন না উষা, গানে অসামান্য কণ্ঠ-লাবণ্য সময়ে সময়ে অসাধ্যসাধন করতে পারে। নইলে বাঙালি বালিকার গাওয়া উর্দু গজলে হয় কখনো এমনতর হৈ হৈ কাণ্ড ! কারণ বিশ্বাস কোরো, এ একটুও বাড়ানো কথা নয় যে উমার নাইটিংগেল নাম সারা শহরে গেল র'টে। জজ-হাকিমরা সব নিমন্ত্রণ করে আর কি ! ও এ-প্রশংসায় আরো যেন মিইয়ে গেল। আমি মাঝে মাঝে ভাবি উষা, মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি ! প্রশংসার আলোয় কেউ বা পেখম মেলে নৃত্য সুরু করে, কারুর বা বুক ওঠে দুরু দুরু ক'রে। ধরণীদার বিষম ভয় ছিল মেয়ের পাছে মাথা গরম হ'য়ে যায় এত বেশি প্রশংসায়, কিন্তু আমার ভয় ছিল উল্টো দিকে—পাছে আত্মঅবিশ্বাসের বহু-প্রশ্রয়ে ওর অসামান্য প্রতিভার বিকাশপথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। তোমাকে আমি নিত্যই বলতাম না যে, আমি কোনো দিনো এই তথাকথিত বিনয়কে বড় ক'রে দেখি নি ? আমার মনে ধরে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা যে—পারব না পা'রব না বলতে নেই—যে বলে—'আমি বদ্ধ আমি বদ্ধ', সে বদ্ধই হ'য়ে যায় : যে বলে—'আমি মুক্ত আমি মুক্ত' সে মুক্তই হ'য়ে যায়। এই নিয়ে তীর্থঙ্করে শ্রীঅরবিন্দের চিঠিটি পোড়ো। তিনিও বলেন যে, লোকে যাকে বলে "sense of superiority" তার স্বপক্ষেও বলবার নিতান্ত কম নেই। গীতাও বলে নি কি—"ন আত্মানম্ অবসাদয়ে ?"

এ নিয়েও অনেক ভেবেছি উষা। জীবনে ঠেকেছিও কম না—ঠকেছিও যথেষ্ট নিজের অহমিকায়। অবশ্য একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, লৌকিক নম্রতা অন্তঃসার শূন্য হ'লেও বিনয়ের একটা সুষমা আছেই আছে। কিন্তু বোধ হয় মতন বিনয়েরও দুটো রূপ—একটা মৌখিক তথা সামাজিক, আর একটা আধ্যাত্মিক তথা আন্তরিক। যে-বিনয়ের লক্ষ্য "অমায়িক" নাম কেনা, যে বিনয় মনে যা জানে মুখে তারই প্রতিবাদ করে শুধু দস্তুর মেনে, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি। কেন না এ-বিনয় অজ্ঞাতে আমাদের কপটতারই দীক্ষা দেয়—তাই এহেন বিনয়ের চেয়ে আমি সরল জাঁক করাকেই বেশি ভালো বলি। কিন্তু আর এক শ্রেণীর বিনয় আছে—যা শুধু শ্রীমন্ত নয়—গভীর জ্ঞান-সম্ভব। এ-বিনয় নিজের শক্তিকে নিজের মনে করে না, মনে করে ভগবানের দান ; এ-বিনয় হাজার বাহবা পেলেও সে-স্তুতিকে আত্মাদরের ইন্ধনের কাজে লাগায় না, ফিরিয়ে দেয় তাঁর চরণের অর্ঘ্য ক'রে—যিনি প্রতি বিভূতির স্রষ্টা ; এক কথায় এ-বিনয়ের মূল অনুভব দীনতার দৈবী মহিমা—যে দীনতাকে শ্রীঅরবিন্দ বর্ণনা করেছেন তাঁর অপূর্ব গভীর কবিতায় :

Thou who pervadest all the worlds below
Yet sitst above !
Master of all who work and rule and know
Servant of love !
Thou who disdainest not the worm to be
Nor even the clod,
Therefore we know in that humility
That thou art God.

এই দীনতার মর্ম কোনো কবি ঠিক বুঝতে পারেন নি অনুবাদ করবার সময়ে। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের টীকা উদ্ধৃত করি আধ্যাত্মিক দীনতার প্রাণের কথাটি বোঝাতে। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন : "To have no contempt for the clod or the worm does not indicate that the non-despiser is the Divine : Such an idea would be absolutely meaningless and in the last degree feeble. Any yogi could have that equality or somebody much less than a yogi. The idea is that, being omnipotent, omniscient, infinite, supreme, the Divine does not seem to disdain to descend even into the lowest forms, the obscurest figures of nature and animate them with the Divine Presence : that shows his Divinity. The whole sense has fizzled out in the translation."

বলাই বেশি যে, মানুষের পক্ষে এ-দীনতায় পূর্ণসিদ্ধি-লাভ অসাধ্য। কিন্তু দেবতার দিব্যভাবের কিছু ছোঁয়াচ তো মানুষে লাগে—তাই মানুষ এ-দীনতার খানিকটা প্রকাশ করতে পারে দিব্যচেতনায় আরূঢ় হ'লে। তখন সে এই ভাবেরি ভাবুক হ'য়ে ওঠে যে নগণ্যতম জীবকেও অশ্রদ্ধা করতে নেই—যেহেতু নগণ্যতম জীবের মধ্যেও সেই একই ভগবান। এ-চেতনায় আধুনিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও মানুষ নিজের কোনো শক্তির জন্যে আত্মম্ভরী হ'য়ে ওঠে না, ভুলেও মনে করে না—যারা অশক্ত অক্ষম তাদের সঙ্গে পংক্তিভোজনে তার গৌরব-কৌলিন্যের জাত যাবে।

শক্তির ক্ষেত্রে যে-মনোভাব বরেণ্য সেটা হ'ল এই যে, প্রতি শক্তিই ভগবানের বিভূতি—নিজের মধ্যেও, পরের মধ্যেও। তাই অপরের মঙ্গল-শক্তিকেও যেমন শ্রদ্ধা করব, নিজের শক্তিরও তেম্‌নি বিকাশ করব যথাসাধ্য—নিজে বড় হ'তে না, ভগবানের হুকুম তামিল করতে। পরমহংসদেব এই ভঙ্গিকেই বলতেন—প্রতি প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। গীতায় বলেছে যোগঃ কর্মসু কৌশলম্। আমি কিছুই নয়, আমি অক্ষম, আমি ব্যর্থ—এ-ধরণের মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া তাই বাঞ্ছনীয় নয়, যেহেতু একে প্রকৃত বিনয় বলে না—এতে ক'রে ভগবানের দানেরি অমর্যাদা করা হয় যে।

* * * * *

লাহোরে বাংলা গানেরও আদর যথেষ্ট—পঞ্চবিদের মাঝে। এ নিয়ে যদি গৌরব বোধ করি সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না—যেহেতু বড়কে বড় বলাই তো চাই। বাংলার শ্রেষ্ঠ কাব্য-সঙ্গীতের নিজকীয় বিকাশের মধ্যে যে মূর্ত হয়েছে গানের এক নব-ধারা—তাকে শিরোপা না দিলে সেটা হবে পূজ্যপূজাব্যতিক্রম। লাহোরে লালাজির যক্ষ্মা-হাসপাতালের জন্যে চ্যারিটি জলশায় তাই আরো বেপরোয়া হ'য়ে বাংলা গান গাইয়েছিলাম উমাকে দিয়ে। সে সময়ে এতটুকু গোলমাল হয় নি। শুনলাম ওখানে

উমা—"খেয়ালিনী"

শ্রোতারা নাকি গানের সময়ে অনেকেই গোলমাল করে। তাই আরো খুশি হয়েছিলাম বাংলা গানকেও ওরা এমন সমাদর করলে দেখে। এমন কি, উমার সঙ্গে যে দুজন সারঙ্গিওয়ালা বাজিয়েছিল, তারাও উচ্ছ্বসিত ওর "সুরেলি আওয়াজে" গানের "মজা" উপভোগ ক'রে। আমাকে বলল এসে—এত সুন্দর কণ্ঠ ওরা শোনেনি কখনো কোনো ভদ্রগৃহে।

উমার কণ্ঠলাবণ্যের সৌন্দর্যের কথা আমি এত বেশি

বলি জেনেশুনে যে, অনেকের কাছেই এটা বাড়াবাড়ি মনে হবে। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই এ-প্রশংসার দরকার। আমি বহুবার ঠেকে শিখেছি যে, আমাদের দেশের সঙ্গীতানুরাগীরা প্রায়ই গানে কণ্ঠলাবণ্যের খুব বেশি দাম দেন না। মানে, গানে তাঁরা কণ্ঠলাবণ্যের দিকে তেমন কানই দেন না, দেন কণ্ঠকৃতিত্বের দিকে। গানে কণ্ঠ-কৃতিত্বের মূল্য অস্বীকার্য নয়, কিন্তু তাই ব'লে কণ্ঠলাবণ্যকে তার প্রাপ্য মূল্য না দিলে গানের পরমানন্দের অনেকখানিই আমাদের কাছে অগোচর থেকে যাবে। কারণ অন্তরাত্মার স্পন্দন সবচেয়ে সহজে বেজে ওঠে এই কণ্ঠলাবণ্যের লহরী-লীলায়। অথচ মজা এই যে ক্লাসিকাল মাইণ্ডেড ওরফে ওস্তাদী-পন্থীরা এত বড় সহজ কথাটা বুঝেও বোঝেন না। একটা উদাহরণ দেই কী বলতে চাইছি। শিলঙে একদিন উমা গাইল কয়েকজন ওস্তাদপন্থীর কাছে। আমি লাটুকে বলছিলাম—"দেখ, ওরা উমার গানে কী শুনছে।" উমা ধরেছে (খুব ঠায়ে একতালায়) ভীষ্মর শেখানো একটি জৌনপুরী তোড়ির খেয়াল। ওরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে কখন সে শমে আসে। ওদের সমস্ত চেতনাটা নিবিষ্ট কেন্দ্রীভূত ঐ শমের যাথাতথ্যে। যে-ই উমা তান টান দিয়ে শমে ফিরে আসে ওদের আনন্দ আর ধরে না। ওদের ভাবটা :

সূক্ষ্ম সুরের আলোছায়া ওর
কণ্ঠে যে ফোটে হেন—
অপরূপ পিককণ্ঠে যে মিড়
রাঙে জলধনু যেন—
দরদে নিবিড় কণ্ঠে যে তান
ফুল ঢেউ সম ধায়—
সবি ভালো বটে, শুধু আমাদের
ওস্তাদি কান চায়
শমের হিসাব রাগের খাতায়
তাই তো ভাবনা এত
কী ভীষণ হ'ত ভাবো—যদি
শম্-এ বুড়ি ছুঁয়ে ও না যেত !

সত্যি, আমাদের দেশে সব সময়ে না হ'লেও প্রায়ই ওস্তাদীপন্থীরা এই রাগের হিসাব ও শমের ব্যাপারটাকে এত বড় ক'রে দেখেন যে, দুঃখ হয় তাঁদের শ্রুতিভক্তি দেখে—তাঁরা গানের শাঁস ছেড়ে খোলামকুচি নিয়েই এত মাতামাতি করেন দেখে, অথচ হায় রে, "Z-ন্‌তি পারেন না" কণ্ঠলাবণ্য ও দরদী ব্যঞ্জনার দিকে অভিনিবেশ রাখতে না শেখার দরুণ কী ধরণের ঠিকে ভুল হচ্ছে। উমার কণ্ঠ শুনে অনেক ওস্তাদিপন্থীই তেমন মুগ্ধ হ'ল না এই কারণে। তাঁরা জহুরী বটে - কিন্তু শুধু রাগের তালের বা কায়দা গাওয়ার—আসল জিনিষের নয়। এ আসল জিনিষের মধ্যে প্রথম পংক্তিতে ঠাঁই পাওয়া উচিত কণ্ঠলাবণ্যের, আন্তরিকতার, সুরদরদের ও গীতিভঙ্গির স্বকীয়তার। উমার মধ্যে প্রথম তিনটি গুণ রয়েছে অজস্র। শেষ গুণটি ফুটলেই ওকে প্রথম শ্রেণীর গায়িকা বলতে পারা যাবে অকুতোভয়ে। কেবল এই বিকাশের জন্যে সব আগে ওর আত্মপ্রত্যয়। তাই আমি ওর মামুলি বিয়ের এত বিরোধী।

* * * * *

না, একটা কথা আরো বলা হয় নি। গানের যে আবেদন সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দেয় সে আরো গভীর আরো সূক্ষ্ম—বলতে কি সেটা অবর্ণনীয়। কারণ গানে কণ্ঠলাবণ্য, দরদ, সরলতা ও স্বকীয়তা থাকলেও মন ভ'রে ওঠে না—যদি না গানে পাই অন্তরাত্মার স্পর্শ। এ পরশটি যে কী বস্তু তা ব'লে বোঝানো একরকম অসম্ভব, তবে কান পেতে শুনলে এর মহিমা মরমে পশেই পশে—যদি শ্রুতিসাধনায় গভীর সাঙ্গীতিক চেতনা জেগে ওঠে। গভীর সাঙ্গীতিক চেতনা জেগে ওঠার কথা বলছি এই জন্যে যে, অনেকে মনে করেন গানের মিষ্টতা এমন একটি জিনিষ যা সর্বজনবোধ্য ও সংস্কৃতিনিরপেক্ষ। একহিসেবে হয়ত একথা অসত্য নয়। সে হিসেবটা হ'ল এই যে, গীতিনিপুণ হ'লেই যে এ-চেতনা জাগে একথা সত্য নয়। এ হ'ল একটা সহজ স্ফূরণ যার আলো চেতনায় যখন ফোটে—ফোটে আপনিই। শিশুর কণ্ঠেও গানের গভীরতম আলো ঝলকে ওঠে এ আমি প্রত্যক্ষ অনুভবে জানি—যেমন অপরপক্ষে অসামান্য সঙ্গীতবিশারদের কণ্ঠেও লক্ষ্য করেছি আসল জায়গাটাই অন্ধকার। তবু বোধ হয় একথা বলা যায় যে, গানের গভীরতম চেতনা জেগে ওঠে বহুশ্রুতিসাধনায়। আর এ-চেতনা যখন জাগে তখন তার মনে হয়ই হয়—

হোক না সুন্দর স্বরের ভঙ্গি হোক না শুদ্ধ তান ও লয়
গানের সঙ্গে নাইক প্রাণ যার, তাহার সেই গান গানই নয়।

কণ্ঠলাবণ্য বলতে আমি বুঝি না কণ্ঠের সেই সস্তা আবেদন—যাকে চলতি কথায় বলি সুমিষ্ট কণ্ঠ, বুঝছি কণ্ঠের সেই প্রকাশশক্তি, সেই বিভূতি—যার মাধ্যস্থ্যে অন্তরাত্মা সবচেয়ে সহজে নিজেকে জানান দিতে পারে সুষমার রূপায়নে।

* * * *

ওরা চ'লে গেল সবাই—আমাকে একা রেখে লাহোরে। কারণ দিদি—মিসেস ধর্মবীর—ছাড়লেন না। বললেন : "তোমার সঙ্গে এ জলশা, অভিনন্দন, নিমন্ত্রণাদির হট্টগোলে একটা কথাও হ'ল না দিলীপ। অন্তত একদিন থাকো আমাদের কাছে।"

দিদির মতনই কথা। সেই স্নেহ ওঁর এখনো আছে। থেকে গেলাম।

কত কথাই যে হ'ল সুভাষ, ক্ষিতীশ, আরো নানা বন্ধুক নিয়ে। দিদি বললেন ভারি এক মজার গল্প। সুভাষ ছিল ওদের কাছে ডালহৌসিতে ওঁদেরই অতি সুন্দর বাড়িতে। কয়েক মাস থেকে সুভাষ ভাবল—ফিরি। কোথায় ফেরা যায় ! উদ্দেশ্য - বিশ্রাম। কেউ বলল—কার্সিয়াঙে তোমার দাদা শ্রীশরৎ বসুর বাড়িতেই বিশ্রাম পাবে। কেউ বলল—না, তোমার বিশ্রাম হবে না এদেশে, যাও ভিয়েনায়। সুভাষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে লিখল মহাত্মাজিকে—কোথায় যাই ? দিদি তাঁর বালিকাসরল দুষ্টু হাসি হেসে বললেন : "আমি পই পই ক'রে সুভাষকে বললাম—মহাত্মাজিকে জিজ্ঞাসা কোরো না—কোরো না—কোরো না। কিন্তু ও কি জানি কি ভেবে শুনল না আমার বিচক্ষণ উপদেশ—মহাত্মাজিকে লিখল এই দু'জায়গার কোন্‌খানে যাওয়া যায় বিশ্রামার্থে ? বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—তিনি লিখলেন :

"কোথা যাবে ?—এ তো প'ড়েই রয়েছে, ভিয়েনা বিদেশ—
সবাই জানে :
কার্সিয়াঙের আভিজাত্যও সমতল-দেশপ্রেমী না মানে।
যাও তাই এবে ভাই পেশোয়ারে—যেথা আবদুল গফুর খাঁ
পর্ণকুটীরে দেবে 'বিশ্রাম'—যদিও 'আরাম' মিলবে না।"

ব'লে দিদির সে কী হাসি !

* * * *

ওখানে বাঙালিরা আমাকে পরদিন সকালে ধ'রে নিয়ে গেল—সেদিন ছিল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। আমার জীবনের ভারি একটি সুন্দর ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল সেদিন। তিন-চারটি বাঙালি ভদ্রলোকের ঘরে পর পর যেতে হ'ল ও যথাবিধি বহু মেয়ে এসে আমাকে দিল ভাইফোঁটা। আমার নিজের বোন তো নেই আর—তাই হয়ত ভগবান দিলেন এত বাইরের বোন্। সত্যি এই ভাইফোঁটার রীতিটি আমার যে কী ভালো লাগে বলতে পারি না। কারণ হয়ত এই যে, আমার কাছে নরনারীর যত সম্বন্ধ আছে তার মধ্যে

কৃষ্ণভক্ত কবি আবুল হাফিজ জলন্ধরী

সবচেয়ে সুন্দর সম্বন্ধ লাগে ভাই বোনের সম্বন্ধ। কারণ অন্য সব সম্বন্ধের মধ্যেই প্রত্যাশা বেশি আমল পায় কোনো না কোনো ছদ্মবেশে—তা সে হোক না কেন বাপ-মেয়ে, মা-ছেলে বা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু ভাই-বোনের সম্বন্ধে প্রায়ই ফুটে ওঠে অনাবিল স্নেহের দানছন্দ—অধিকারবোধ তেমন উগ্র হ'য়ে উঠতে পারে না এই সম্বন্ধে। আমি জানি আজকের দিনে বহুলোকই একথা বিশ্বাস করে না (ফ্রয়েডের দীক্ষায় !) যে অনাত্মীয়ার সঙ্গে বোনের সম্বন্ধ সত্য হ'তে পারে। কিন্তু মলিন মনের চেতনা নিম্ন চেতনা, তাই তার ব্যঙ্গবিদ্রূপকে হেসে উড়িয়ে দিলে একটুও অন্যায় হয় না।

* * * *

ফের কাছে পেলাম বন্ধু ৺ধর্মবীরকে, যদিও মাত্র দু'দিনের জন্যে। কী সুন্দর চরিত্র ছিল তাঁর! দিদিও কী স্নিগ্ধ যে! ওঁদের মেয়ে লীলাও এত মিষ্ট! সীতাও। একেবারে পর যখন এত আপন হয়, যখন তাদের স্নেহ এভাবে দীর্ঘজীবী হয়—মন চায় যেন কৃতজ্ঞতায় উপ্‌ছে পড়তে, নয়? শিলঙে তোমাদের পরিবারেও এই কথাই মনে হ'ত। তোমার মা ও তোমার ভাইকে কই আমাদের একটুও তো অনাত্মীয় মনে হয় নি। মুখে যতই বলি না কেন ঊষা, যেখানেই কোনো না কোনো মুখোষ প'রে অধিকারবোধ নিজের দখল দাবি করে, যেখানেই স্নেহের রূপটি একেবারে ঢাকা না পড়লেও পারে না তার নির্মলতম রূপে ফুটে উঠতে। তাই না কবি বলেছেন :

"আমার আমার ব'লে ডাকি—
আমার এ, ও, আমার তা
তোমার নিয়ে তুমি থাকো
নিও না কো আমার যা।"

কাশ্মীরে তন্দ্রা দেবীদের পরিবারের সঙ্গে এসেও এম্‌নিই মনে হ'ত, তোমায় বলেছিলাম না? একবারও মনে হ'ত না এঁরা ইংরেজ। যেমন প্যাট্রিক, তেম্‌নি মেরি, তেম্‌নি জোন, তেম্‌নি উইলিয়াম—তন্দ্রা দেবীর তো কথাই নেই। পরে—লাহোর থেকে ফেরবার পথে—দিল্লীতে আলাপ হয়েছিল তন্দ্রা দেবীর স্বামী জন ফোল্ডসের সঙ্গে। এঁর কথা আগে উল্লেখ করেছি। ইনি একজন সত্যিকার সঙ্গীতকার ছিলেন। তাই দুঃখ হয়েছিল যখন শুনলাম, এই সেদিন ইনি হঠাৎ মারা গেলেন। সংসারে যত শোকাবহ ঘটনা আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রতিভার অকালমৃত্যু। ফোল্ডস্ সাহেব ছিলেন ওদের হিসেবে যুবক বই কি। পূর্ণ স্বাস্থ্য, দীপ্ত আনন, জ্বলন্ত উৎসাহ—তার উপরে অসামান্য সঙ্গীতপ্রতিভা। দিল্লীতে এসেছিলেন স্টেশনে। আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্টুডিয়োতে। সেখানে নানান্ ভারতীয় যন্ত্রসহযোগে ইনি গঠন করছিলেন একটি ভারতীয় অর্কেস্ট্রা। কী সুন্দর যে লাগছিল তাঁর রচিত সুরগুলি। নিজে অসামান্য পিয়ানিস্ট—বাজালেন পঞ্চমাত্রিক, সপ্তমাত্রিক তাল—কত কী ভঙ্গিতে। বললেন : "আমার উদ্দেশ্য আপনাদের অপূর্ব ভারতীয় মেলডিকে য়ুরোপীয় সঙ্গীতে তর্জমা করা।" তর্জমা বলতে ইনি বুঝতেন খুব অল্প য়ুরোপীয় হার্মনির সহযোগে আমাদের সুরগুলিকে যেন স্বাধীন প্রেরণায় রচনা করা—to compose the Indian melodies anew with simple harmonic accompaniment."

আমার খুবই ভালো লেগেছিল এঁর রচনাভঙ্গি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এসব ওদেশে প্রচার হ'লে একটা কাজের মতন কাজ হ'ত, আমাদের সঙ্গীতের সাঙ্গীতিক মূল্য খানিকটাও তো বুঝত য়ুরোপের লোকে। উনি ঠিকই বলেছেন—এ হ'ত তর্জমা। কিন্তু এ-তর্জমার মধ্যে ছিল নবরস—তাই একে সৃষ্টির কোঠায় ফেলা চলে। দুঃখ এই, এ-হেন প্রতিভা না ফুটতে ঝ'রে গেল! তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত হবে অন্য কোনো য়ুরোপীয় প্রতিভার হাতে। অবশ্য সেজন্যে চাই তাঁর ভারতে এসে এঁর মতন উৎসাহ নিয়ে আমাদের গান সুর তাল রাগ সবই ঠিক ছাঁদের মতন শেখা। তাহ'লে সঙ্গীতের একটা নতুন আনন্দলোকের দিশা পাবে মানুষ।

* * * *

ধর্মবীরের ওখানে আলাপ হ'ল ওখানকার বিখ্যাত কবি আবুল আসর হাফিজ জলন্ধরীর সঙ্গে। ওখানকার এক কাব্যরসজ্ঞ পণ্ডিত দৌলতরাম প্রথম বলেন আমাকে এঁর কথা। বললেন এমন সুন্দর সরল উর্দুতে লেখেন হাফিজ কবি যে মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। আর শুধু সরলতাই নয়—কী স্বকীয়তায়! মামুলি চালে গজল বা শের ইনি রচনা করেন না। নব নব ছন্দে—নব নব ভঙ্গিতে লেখেন গান কবিতা দুই-ই। কি স্বতঃস্ফূর্তি! আর কী উদারতা!—এঁকে দেখে মনে পড়ত প্রায়ই রাহানার কথা—মুসলমান হ'য়েও কৃষ্ণভক্ত—ভাবো দেখি! এঁর আরো নানা ঔদার্যের কথা বলতে বলতে দৌলতরামের চোখ দুটি উঠত জ্ব'লে। এ লোকটির মতন কাব্যানুরাগী জীবনে কমই দেখেছি। নাছোড়বন্দ্—বললেন এ অদ্বিতীয় উর্দু কবিটির সঙ্গে করতেই হবে আলাপ। কাঙালকে তিনি ভাত খেতে ডাকলেন—একে কবি তার উপর কৃষ্ণভক্ত! সাগ্রহে গেলাম দৌলতরামের বাড়ি।

দেখা হ'ল না সেদিন। খাঁটি কবি তো—অতএব

উদয় হ'তে এত দেরি করলেন যে থাকতে পারলাম না, যেহেতু একটি বন্ধুর ওখানে ছিল গানের নিমন্ত্রণ।

যাহোক কবি এলেন পরে নিজেই ধর্মবীর-সদনে। আমার গানও শুনলেন। সত্যিই গানভক্ত। মীরাবাঈয়ের গান সম্বন্ধে পরে আমাকে কী উচ্ছ্বসিত পত্র যে লিখেছিলেন!

খুব ভালো লাগল লোকটিকে। তাঁর একটি কথা মনে গাঁথা থাকবে। বললেন তিনি দিদিকে, "মিসেস ধর্মবীর! আমি বিলেত গিয়ে আপনাদের সভ্যতার অনেক বিকাশেই মুগ্ধ হয়েছি—আপনাদের স্থাপত্য, আপনাদের দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবস্থা, ডিসিপ্লিন, প্রাণশক্তি—কী নয়? আপনাদের যন্ত্র-সঙ্গীতও আমাকে গভীর আনন্দ দেয়। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে আপনারা এযাবৎ ভুল পথে চলেছেন ব'লেই আমার মনে হয়েছে। আমাদের বহু দোষ, কিন্তু এখানে আমাদের কাছে আপনাদের এইটে শিক্ষা করবার আছে যে, a singer sings only when his soul sings—not his throat."

মিসেস ধর্মবীর রাঙা হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু এ স্পষ্টবক্তা অন্যমনস্ক কবি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ব'লে চললেন : "রাগ করবেন না মিসেস ধর্মবীর। আমি বলছি না আপনারা আপনাদের নিজেদের সঙ্গীতে আনন্দ পান না। নিশ্চয়ই পান। কিন্তু যে-জিনিষে আনন্দ পান সেটা হ'ল voice-production, অন্তরাত্মার আনন্দ-ঝঙ্কার নয়। আপনাদের কণ্ঠ আপনারা বহু সাধনায় তৈরি করেন—কী ক'রে সতেজ হবে, সমৃদ্ধ হবে, স্বরনিপুণ হবে সবই আপনারা বহু যত্নে সাধনা করেছেন। কিন্তু সব মেনেও মানতে পারব না—আপনারা এখনো টের পেয়েছেন what happens when the soul sings and not the throat.

ভাববার কথা বই কি।

* * * *

এ-কবিটির সঙ্গে আলাপ ক'রে ভালো লাগল খুবই। ইনি নিজের গান বেশ গেয়ে শোনাতে পারেন। গায়ক নন—কিন্তু ভালো লাগে। লোকটির মধ্যে ভাবাবেশ সত্য ও অকৃত্রিম। এঁর কয়েকটি গানে আমি সুর দিয়েছি। এর মধ্যে দুটি গান "মুরলীওয়ালে নন্দকে লালে বাঁসুরি বাজায়ে জা" ও "বসা লে আপনে মনমে প্রীত" তোমাদের শুনিয়েছি শিলঙে। প্রথমটি গ্রামোফোনে দিয়েছে উষা, দ্বিতীয়টি আমি। বেরুলে শুনো কিন্তু। বিশেষ ক'রে শেষেরটি ছন্দে মিলে ভাবে প্রেরণায়—সর্বোপরি আধ্যাত্মিক রসালতায় এত ভালো হয়েছে যে অনুবাদ সহ উদ্ধৃত না ক'রেই পারলাম না—এ থেকে বোঝা যাবে এ-কবির ব্যক্তিত্বের দিকটাও। এ গানটি প'ড়ে শ্রীঅরবিন্দ ওঁকে আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছেন।

বসা লে অপনে মনমে প্রীত।
মন-মন্দিরমে প্রীত বসা লে
ও-মূরখ ও ভোলেভালে!
দিলকী দুনিয়া কর্‌লে রৌশন
অপনে অন্দর জ্যোতি জগা লে।

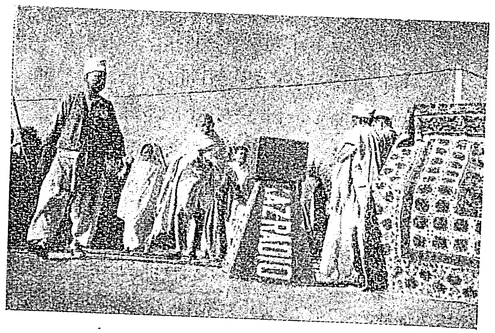

গফুরখাঁর পেশোয়ারি আতিথ্য

প্রীত হয়্ তেরী রীত পুরানি
ভুল গয়া ও-ভারতবালে!
প্রীত হয় তেরি রীত।

ক্রোধ-কপটকা উৎরা ডেরা
ছায়া চারোঁ খূঁট অঁধেরা
শেখ ব্রহমন দোনো রহজন
একসে বঢ়কর এক লুটেরা
জাহির দারোঁকি সঙ্গতমে
কোই নহি হয় সঙ্গী তেরা
মন হয় তেরা গীত।

ভারতমাতা হয় দুখিয়ারী
দুখিয়ারেঁ হঁয় সব নরনারী

তুহি উঠা লে সুন্দর মুরলী
তু হি বন্ জা শ্যাম মুরারি
তু জাগে তো দুনিয়া জাগে
জাগ উঠৈঁ সব প্রেম-পূজারি
গায়েঁ তেরে গীত।

নফরৎ এক আজার হয় প্যারে!
দুখকা দারু প্যার হয় প্যারে!
আ জা, অস্‌লী রূপমে আ জা
তু হী প্রেম অবতার হয় প্যারে
য়ে হারা তো সব কুছ হারা
মনকে হারে হার হয় প্যারে
মনকে জীতে জীত।

দেখ্ বঢ়েঁাকী রীত ন জায়ে
সর্ জায়ে পর্ মীত ন জায়ে
ময় ডরতা হুঁ—কোঈ তেরী
জীতী বাজী জীৎ ন জায়ে
জো করনা হয় জলদি কর্ লে
থোড়া রক্ত হয় বীত ন জায়ে
রক্ত ন জায়ে বীত।

এ গানটির অনুবাদ করেছি আমি মোটামুটি এই ভাবে :

House in thy soul the flickerlesss lamp
of love.
O way-lost dupe, relume the olden flame
In the wistful temple of dream. Nurse
in faith's grove
The memorial rose of peace no thorn
can shame.
Delivered from thy passions' lurid gleams
And shadowing greeds, foes in the guise
of friends,
Know : in the deep of hush the soul
redeems :
She is the vanguard morn to darkness
sends.

Be pledged to noble ways—of the
ancient Sun :
If lose thou must, let it be life, not love.
Shall clouds besiege thy star-dominion ?
"Up ! time is fleeting !"—the clarion
calls above.

Hate never pays, though sorrows purify,
Be poised in thy Self of love : incarnate,
free ;
If she resigns, who shall reveal the sky ?
Soul's night's defeat : her dawn sure
victory.

Her children in gloom, thy Motherland
mourns and sighs,
Play Beauty's flute like Krishna :
thou art He.
If thou wilt wake, the world, aquiver,
shall rise
And mitred priests of love will sing
with thee.

(Translated from the Hindi song of Abul Hafiz Jalandhari—by Dilip Kumar Roy)

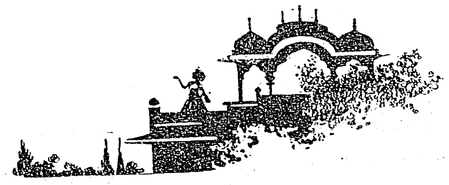

আগমনী

শ্রীমতী শোভা দেবী

জননী তোমার চরণ কমলে
প্রণাম করি ;
লহ মা প্রাণের দীন অর্চ্চনা
হৃদয় ভরি।

তোমার সোনার বাংলাতে আর
নাহি সম্পদ বিত্ত অপার ;
চোখের জলেই মুক্তার মালা
তাই মা গড়ি।
এস গো ভবানী এ দীন ভবনে
করুণা করি।

গরিমা-গরব নাহি এ শরতে
ভারতে আর ;
শক্তিময়ী কি প্রতিমাই শুধু
হবে মা সার ?

সুজলা সুফলা শ্যামলা বঙ্গ
সে কি মা শুধুই গীতির অঙ্গ ?
ফিরে কি দিবে না জননী গো মোর
বিভব তার ?
জ্যোতির্ম্ময়ী কি লবে না ঘুচায়ে
অন্ধকার ?

মহামায়া তব অভয় চরণে
শরণ মাগি ;
কাঁদিছে বঙ্গ কর মা করুণা,
উঠ মা জাগি।

দাও মা মুক্তি, দাও মা শক্তি,
এ অসাড় প্রাণে দাও মা ভক্তি ;
দাও মা কণ্ঠে অভয় মন্ত্র
পূজার লাগি।
জাগো মা ভবানী, ও রাঙা চরণে
শরণ মাগি।

সন্তান তব আগমনী গান
গা'ক মা আজি ;
তোমার পূজায় জ্বলুক
পঞ্চপ্রদীপরাজি।

শ্রীপদে লহ মা কোটি অঞ্জলি,
সার্থক হয়ে উঠুক উজলি।
বরিতে তোমায় শারদলক্ষ্মী
আসুক সাজি।
তব শুভাশীষ করুক মোদের
বিজয়ী আজি।

দুর্গোৎসব

চতুরঙ্গ

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১) ঐতিহাসিক

বাংলা ৯৯০ সাল। স্থান—উত্তরবঙ্গের তাহিরপুর রাজসভা, মন্ত্রণাকক্ষ। সময়—অপরাহ্ন

অর্দ্ধবাংলার সামন্ত মহারাজাধিরাজ কংসনারায়ণ সভাসীন, পার্শ্বে উপবিষ্ট মন্ত্রী দনুজমাধব, সেনাপতি বিশ্বরূপ ভট্ট, কোষাধ্যক্ষ শ্রীকর তলাপাত্র, সভাপণ্ডিত আচার্য রমেশ শাস্ত্রী ও কবি কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাস। শাস্ত্রীজি, মহারাজ কংসনারায়ণ আজ বঙ্গগৌরব সম্রাট তুল্য। তাঁর বিশাল রাজ্য সমগ্র উত্তর ও মধ্যবাংলায় সুপ্রতিষ্ঠ। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে দিল্লীর বাদশাহ পর্যন্ত স্বীকার ক'রে নিয়েচেন। বাংলার সুবেদার ত তুচ্ছ। একদিকে যেমন তাঁর সুবিশাল সুশিক্ষিত সৈন্যবল, তেমনি গুণমুগ্ধ জনবল—অপরিমিত—অফুরন্ত রাজকোষ, কুশাগ্রধী মন্ত্রী ও কর্তব্যনিষ্ঠ বীর সেনাপতিগণ। সম্রাটের যেমন লোকবল, জনবল, অর্থবল ও সেনাবল প্রয়োজন, মহারাজাধিরাজের এর কোনটিরই ত অভাব নেই। তদুপরি সমগ্র পঞ্চগৌড়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আচার্য মহোপদেশক আপনাকে তিনি পেয়েছেন গুরুরূপে, এ সৌভাগ্য—

শাস্ত্রী। আরো বলো কবি, বাদ দিচ্ছ কেন, বলো বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কৃত্তিবাস তাঁর কীর্তিমুখর, বলো এটুকু বাদ দিচ্ছ কেন বন্ধু?

মন্ত্রী। সত্যি শাস্ত্রীজি, কবির প্রত্যেকটি কথাই অভ্রান্ত। কিন্তু তবুও কি মহারাজের এই কামনা-পূরণের কোনো শাস্ত্রসঙ্গত উপায়ই নেই? শাস্ত্রের এমন কোন বিধি কি নেই আচার্য, যাঁর বলে মহারাজের এই বিশ্বজিৎ-লোকযজ্ঞ পূর্ণ হয়?

রাজাকংস। শাস্ত্রীজি, আবাল্য কঠোর ভাগ্যচক্রের সঙ্গে নিত্য যুদ্ধ ক'রে আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সাফল্যের, ঐশ্বর্যের ও প্রতিষ্ঠার সিংহাসনে বসেছি সত্য, কিন্তু সর্বদাই মনে জাগে এই আশঙ্কা, এই ভীতি যে ঐশ্বর্যের এই উন্মাদ কুহক যেন আমার জাতির বৈশিষ্ট্য বংশের গৌরব ভুলিয়ে না দেয়—নষ্ট না ক'রে দেয় আমার বিপ্রত্ব, আমার মনুষ্যত্ব, আমার রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রাণীর প্রতি সুমহান্ কর্তব্য। তাই ঐকান্তিক কামনা—এই ঐশ্বর্যকে বিলিয়ে দিতে সৎপাত্রে, সৎতীর্থে, সৎক্ষেত্রে—যথেচ্ছ—আজীবন। প্রপিতামহ পুণ্যশ্লোক কুলুক ভট্টপাদের রক্ত-ধারা যেন ঐশ্বর্যের মোহে আত্মবিদ্রোহী না হ'য়ে ওঠে—ভোগের দিকে, কামনার প্রেরণায়—দুর্বল মানবের মূঢ়তায়!

শাস্ত্রী। সবই জানি মহারাজ, কিন্তু শাস্ত্র বড় কঠোর, বড় নিষ্ঠুর—আবার পরম কারুণিক। শাস্ত্রে বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারটি মহাযজ্ঞ রূপে কীর্তিত। অশ্ববেধ ও গোমেধ কলিবর্জ্য, সুতরাং অকার্য; আর আপনি স্বাধীন সম্রাট নন, তাই শাস্ত্রীয় বিশ্বজিৎ ও রাজসূয়ের সম্পূর্ণ অনধিকারী।

কৃত্তি। তা হ'লে মহারাজের মনোবাসনা পূরণের কোনো উপায়ই শাস্ত্রে নেই আচার্য! মহাযজ্ঞ না হয় তৎকল্প—তম—তর। আপনি সর্বশাস্ত্রবিৎ ঋষিকল্প, যা হয় একটা বিধান করুন।

মন্ত্রী। আমাদেরও এই একান্ত বাসনা পণ্ডিতজি, মহারাজের মহাযজ্ঞের মহাদানের একটা—শাস্ত্রীয় উপায় আপনার যেরূপেই হোক্ বিধান দিতে হচ্ছে।

শাস্ত্রী। নিরুপায়ের উপায় যিনি দুর্গতিহারিণী—একমাত্র তাঁর চরণ শরণ ব্যতীত আর কোনো উপায়ই নেই মহারাজ! আপনার সদুদ্দেশ্যের কথা অনেক চিন্তা করেছি, মনন সাধন করেছি, কিন্তু শাস্ত্রীয় কোনো মহাযজ্ঞেরই অধিকারিত্ব আপনার নেই। কিন্তু মায়ের প্রত্যাদেশ পেয়েছি—তাঁর শাস্ত্রোক্ত পূজা। মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের সপ্তশতী অংশে আছে—"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে য চ বার্ষিকী—শরৎকালে দুর্গামহাপূজার বিধি। আর দেবীপুরাণও এর সমর্থন করেছেন—"মহাব্রতং মহাপুণ্যং শঙ্করাদ্যৈরনুষ্ঠিতং

কর্ত্তব্যং সুররাজেন্দ্র দেবীভক্তিসমন্বিতৈঃ।" এই মহাপূজা "দুর্গোৎসবে"র অনুষ্ঠান আপনি করুন। কলিতে এই উৎসবই মহাযজ্ঞরূপে কীর্তিত। সত্যযুগে মহারাজ সুরথও এর অনুষ্ঠান করে মন্বন্তরা বিপত্য লাভ করেছিলেন, আর সমাধি বৈশ্য পেয়েছিলেন পরম সমাধি—মুক্তি। আপনি এই "দুর্গোৎসব" অনুষ্ঠান করুন মহারাজ।

রাজা। আনন্দম্, এ উত্তম আদেশ আচার্য। আমি সম্পূর্ণ সম্মত। পূজার আর বেশী দেরী নেই। মন্ত্রী, এই বৎসরই এর অনুষ্ঠান বোধ হয় সম্ভব?

মন্ত্রী। নিঃসন্দেহে মহারাজ, পরম আনন্দে!

রাজা। উত্তম। শাস্ত্রীজি, পূজার বিধান।

শাস্ত্রী। সমস্ত পৌরাণিক গ্রন্থ ও স্মৃতিনিবন্ধ সংগ্রহ দেখে আমি দুর্গোৎসব-বিধি সংস্কার করেছি। আপনি নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখেতে পারেন।

রাজা। আমার দেখবার প্রয়োজন নেই আচার্য্য, বৃহস্পতিকল্প আপনি বিধিবদ্ধ করেছেন—এর আর আমরা কিই-বা দেখব? তা হ'লে এই ঠিক। আগামী আশ্বিনের শুক্লপক্ষে দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানই সংকল্প। মন্ত্রী, খাজাঞ্চি, সেনাপতি, পরিচালকগণ, আপনারা এর যথাবিহিত করবেন। আর আচার্য এর তন্ত্রধারক হতে হবে আপনাকে, শ্রীচরণে দীনের এই নিবেদন।

শাস্ত্রী। আমার যথাসাধ্য সাহায্য পাবেন রাজা।

রাজা। পরম কৃতার্থ!

রাজা। কবি, আজ হ'তে প্রতিদিন দুপ্রহরে আমায় শুনাতে হবে আপনাকে মায়ের গুণমাহাত্ম্য—সপ্তসতী।

কৃত্তি। পরমানন্দে মহারাজ, এ ত মহাসৌভাগ্য।

রাজা। আচ্ছা আজ আপনারা বিদায় নিতে পারেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

তাহিরপুর রাজবাটী পূজামণ্ডপ

দশভুজা দুর্গাপ্রতিমা বিবিধোপচারে অর্চিত, সম্মুখে স্বর্ণকলসাদি উপকরণ। পার্শ্বে যজ্ঞবেদীতে প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি। পট্টবস্ত্রপরিহিত মহারাজ কংসনারায়ণ দণ্ডায়মান, পার্শ্বে রাণী ভুবনেশ্বরী। যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে ভুবনেশ শাস্ত্রী। অদূরে—মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি দণ্ডায়মান। সময় প্রাতঃ।

শাস্ত্রী। মায়ের উৎসব সর্বাঙ্গ শাস্ত্রানুযায়ী সম্পূর্ণ হয়েছে মহারাজ, এইবার পূর্ণাহুতি দিয়ে যজ্ঞশান্তি করি?

রাজা। একটু অপেক্ষা করুন আচার্য! মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখি সমস্ত যথাযথ হ'য়েছে কি-না? মন্ত্রী—

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। আমার নিবেদন, আপনারা যথাসাধ্য যথোপ-যুক্ত করেছেন? এখন মায়ের পূজার পূর্ণাহুতি দিতে পারি?

মন্ত্রী। আপনার আদেশে একমাস পূর্বে সমগ্র বাংলা-দেশের প্রতি গ্রামে ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলাম আমরা। এই তিন দিন তাহিরপুর নগরে সকলকে যথেচ্ছ দান করা হয়েছে। সমস্ত প্রার্থী দীন, দুঃখী আতুর, কাঙাল, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র জাতি-বর্ণ-অবস্থা-বয়সনির্বিশেষে প্রার্থনার পূর্তি লাভ করেছে আপনার এই কাজে।

রাজা। আমার কাজ নয় মন্ত্রী, মায়ের কাজ; আমি দীন নিমিত্ত মাত্র।

মন্ত্রী। মায়ের সেবায় সাত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছি মহারাজ। রাজ্যের একটি নগণ্য প্রাণীও বিফল হ'য়ে যায়নি—সব সুসম্পূর্ণ হয়েছে। এবার মায়ের যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতে পারেন আচার্য।

রাজা। মায়ের দক্ষিণা—

মন্ত্রী। স্বর্ণপাত্রে দক্ষিণার দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ঐ আচার্যের সম্মুখে রেখেছি।

শাস্ত্রী। এইবার পূর্ণাহুতি দেই মহারাজ?

রাজা। পূর্ণাহুতি! পুত্র কি মায়ের পূজার পূর্ণাহুতি দেবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে পারে কখনো আচার্য?

শাস্ত্রী। যজ্ঞীয় সংস্কারাঙ্গ পূর্ণাহুতি—

রাজা। একটু বিলম্ব হবে আচার্য, রাণী প্রস্তুত হও—ঠিক করে ধর ত পাত্রটি।

রাণীর ঘৃতপূর্ণ স্বর্ণপাত্র রাজার সম্মুখে ধারণ ও রাজার খড়্গে বক্ষের কতকটা মাংস ছিন্ন করে পাত্রে প্রদান ও উভয়ে অগ্রসর হয়ে যজ্ঞে প্রদান।

শাস্ত্রী। এ কি—এ কি মহারাজ!

রাজা। এ আমার সংকল্পের পূর্ণাহুতি, মায়ের দুধে পুষ্ট দেহের কণিকা মাত্র—মাকে নিবেদন। রাজা সুরথ দিয়েছিলেন "নিজ গাত্রা স্বগুক্ষিতম্"—সপ্তশতী বলেছেন, আমাদের কি সে প্রাণ সে শ্রদ্ধা আছে? আচার্য, আপনি এবার যজ্ঞপূর্ণ করুন।

শাস্ত্রী। মহারাজ কংসনারায়ণ, আপনার এই শাস্ত্র ও দেবতার প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস, ভক্তির দান মা গ্রহণ করেছেন—আশীর্বাদ করি, আপনার এই অনুপম মাতৃ-উৎসব আজ থেকে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অনুষ্ঠিত হোক্—মায়ের সাধক বাঙালী আবার মাকে জানুক, মানুষ হোক্, আপনার এ কীর্তি অক্ষয় হোক্!

রাজা। আচার্য, আপনার এ মঙ্গলেচ্ছা দাস মাথা পেতে নিচ্ছে।

কৃত্তিবাস। আপনি মানুষ নন মহারাজ, শাপভ্রষ্ট দেবতা।

রাজা। মায়ের নাম নেও কবি। মানুষের এই কর্ণপ্রিয় কথাগুলো মায়ের মন্দিরে উচ্চারণ ক'রে এর পবিত্রতা নষ্ট করো না। মায়ের মন্দিরে রাজা-প্রজা দীন-দুঃখী—সবাই সমান। আনন্দময়ী মাকে ডাকো, আনন্দ করো, বলো—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

(২) দুর্গোৎসব—অতীত

বাংলা—১২৮০, সময় প্রাতঃকাল—সাড়ে নয়টা

পূর্ববঙ্গের আশী বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ জমিদার মহারাজ রামকান্ত রায়ের অন্তঃপুর দালানের অলিন্দ। জমিদার রামকান্ত একটি কেদারায় অর্দ্ধ-শায়িত, হাতে ফড়সির নল, তামাক সেবন করিতেছেন; অদূরে ষোড়শী পৌত্রী মহামায়া, সিঁড়িতে দেওয়ান রঘুনাথ মজুমদার অলিন্দে উঠিতেছেন।

রাম। ও কেডারে, ও কেডা আইচে নতুন বৌ, কার য্যান্ পায়ের শব্দ শুন্‌চি না?

মহামায়া। নায়েব জেঠামশোয় আইচেন ঠাকুদ্দা, আপনি তাক্ সকালে ডাক্‌চিলেন না।

নায়েবের আগমন ও প্রণাম

রাম। কে রঘুনাথ নাক্‌হি? বাইচা থাকো। ক্যামন আছ? বইস—বইস। এই শালী, বস্‌বার দিছিস তোর জ্যাঠাক্?

রঘু। আজ্ঞা আমি বইচি।

মহামায়া। গাইল্ পারো ক্যা ঠাকুদ্দা, আমাক্ যে শুধাশুধি গাইল্ পারো, আমি আর তোমার তামুক লাগাইয়া দিমু না কইল্। তখন মজা টের পাইবা নি।

রাম। আরে না না, 'শালী' কি আবার একটা গাইল হইল নাকি? ওতো নতুন বৌর আদর রে—শা—। ওহুঁ—আচ্ছা, তুমিই কও না রঘুনাথ, এডা কি য়্যাক্‌টা গাইল নাকি?

রঘু। (হাসিয়া) আজ্ঞা না, অমন তো আমরাও নাতনীগোরে বইলা থাকি।

রাম। শুনচিস্‌নি শা—না না, নতুন-বৌ, রঘুনাথও তার 'নূতন-বৌ'রে এই কইয়া থাকে—রাগ হইলো নাকি? এদিক আয়, শোন্ শোন্। অ নতুন-বৌ এদিকে কাছে আইস। বুড়ামানুষ, ভালো চোখে-টোখে দেখি না।

মহামায়া। থাইক্‌গা, আর আদরের কাম নাই ঠাকুদ্দা। বিনা আদরেই ভাল আছি—কানা ঠাকুদ্দা উচ্‌বগ্—বুড়া। (ঠাকুরদ্দার নিকট গমন)।

রামকান্ত। রঘুনাথ, (নাতনীকে আদর ক'রে মাথায় হাত দিয়ে) বুইড়া কিন্তু নূতন-বৌর—আমার প্রতি বেজায় টান্, কেমন রঘুনাথ, তাই না? তোমার কি মনে হইচে?

মহামায়া। আবার ঠাকুদ্দা, তাহ'লে আমি এই চৈল্‌লাম।

রামকান্ত। না, না, আচ্ছা, এইবার রঘুনাথের সঙ্গে আলাপ করি—তুমি তোমার জায়গায় যাও। (মহামায়ার নিজ স্থানে গমন) তা তোমাদের বাড়ীর সব ভালটাল আছে ত? বুইড়া হইয়া গেচি, যাইবারও পাই না—দেখ্‌বারো পাই না। তোমার পোলাপান ঝি-বউ ভাল ত?

রঘুনাথ। আজ্ঞা ঈশ্বর ভালই রাখ্‌চেন মহারাজ।

রামকান্ত। দেখো রঘুনাথ, তোমাগোর কতবার কইয়া দেখ্‌চি, যে ঐ যে একটা কি চক্রান্ত কইর‍্যা তোমরা আমার নামের সঙ্গে জুইড়া দিচ মইরা* বল্‌দের ঘারে জুয়ালের মতো ওটা তোম্‌রা ফাইলা রাখো—তা না, কেবল মহারাজ মহারাজ। মহারাজ, কিসের মহারাজ হইমু আমি—রাজা মহারাজা হওয়া মুখের কথা কি-না? কইলেই হইলো, আর কি। ও তোমাগোর কত্তাবাবুরে কওগা, বেশী কইলে বক্‌শিসও মিল্‌বার পায়। যারা সাহেব পূইজা কইয়া মহারাজ হইচেন—তাগরে কইও, আমাক্ না।

* মইরা—মুমূর্ষু

মহামায়া। তুমি ত সত্যি সত্যি মহারাজ ঠাকুর্দা, এই ত সেদিন ম্যাজিস্টর্ সাহেব তোমাকে মহারাজা কইরা গেলেন—

রামকান্ত। থাম্ শালী, রাগাইস্ না। আমি মইলে তোর বাবাক্ না মহারাজা কইরা তোরা রাজকুমারী হৈস্—হঃ—তারা মা! রঘুনাথ, তোমারে ডাক্‌চি ক্যান্ তা নি জানো। মা'র পুইজা তো আইসা গ্যাচে, সব জোগাড় তোমার নি ঠিক রাইখ্‌চ? বয়স ত হইচে—আরো পূইজা যে দেখ্‌মু তার ভর্‌সা কি? তাই, এবার একটু জুত কইরা পূইজা কর্‌বার চাই। ফর্দ্দটর্দ্দ কর্‌চ নাকি? আমি ত আর দেখবারো ভাল পাই না—তোমাগোর উপরি ভরসা। একটা মাত্র ছাইলা, তা তো মেলেচ্ছই হইয়া গ্যাচে, ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাসটিশ্বাস নাই। এই আমি যে কয়দিন আছি—তার পর ত তোমরা মায়ের মণ্ডপে ম্যাম্ সাহেব পূজা করবা। তোমাগোর কর্তাবাবুর য্যামন তানিগোর উপর শ্রদ্ধা ভক্তি!

রঘু। আজ্ঞে, সবই ঠিক মতই হৈচে—আগের মতোই সব। ক্যাবল—খাওয়ানদাওয়ান কিছু কমাইবার ইচ্ছা বাবু বল্‌চেন। সেদিন অতোগুলো টাকা খরচ হইয়া গেল আপনার উৎসব—

রাম। থামো, হৈচে। আমি কিন্তু চৈট্‌বার লাগ্‌চি। রাগাইও না আমাক্—মহারাজ পূইজায় টাকার ছেরাদ্দ করছ, তাই মায়ের পুইজায় খাওয়ান বন্ধ করবার চাও? ক্যান্, কে কইচিলো মহারাজ পূইজা কইর্‌বার তোমাগোর? মায়ের পূইজার যা বরাদ্দ আছে, তার উপর এবার আমার এলাকার সব রাইয়তগোর আমি খাওয়ামু, আর জীবনে কুলাইবো কি-না য়্যাক্‌বার শেষ দেইখা যাই। শুন্‌চনি? পাঁচ হাজার টাকা বেশী ধরোগা—এতেই হইবো।

রঘু। কিন্তু কর্ত্তাবাবু এতে মোটেই মত দিবেন কি-না সন্দে হয়। তাঁর মত, দুই হাজারের বেশী খরচ না করা। গত সনের চেয়ে এবার বছরো ভালো না। গত বছর চাইর হাজার ফর্দ্দো উট্‌চিলো', এবার সাড়ে তিন হাজার ধর্‌চি। তিনি দু হাজার ক'ইরবার বল্‌চেন। এখন আপনি যা বল্‌লেন তাতে কম পক্ষে দশ হাজার—

রাম। দশ হাজার না হয় বিশ হাজার লাগ্‌বো। তোমাগোর বড়লাটের 'ফণ্ডে' না কিসে যদি তোম্‌রা পঞ্চাশ হাজার দিয়া মহারাজ হৈবার পাও—আমার মার পূইজায় আমি দশ হাজারও খরচ করবার পারমু না। ক্যান্, আমি আর কয়দিন? শরীরের যা অবস্থা আর তোম্‌রা যা দিন দিন করবার লাগ্‌চ, তাতে গ্যালেই ত বাচি। কিন্তু মা বেটী তো কানের মাথা খাইচে। যাও ফর্দ্দ ধরোগা, শুন্‌চ না?

রঘু। আজ্ঞে, এক্‌বার কত্তাবাবুকে জিজ্ঞাসাটা করি।

রাম। না; তুমিও তারই দলে ভিরচ দেখ্‌চি। আরে এ সম্পাত্তিটা কার তা জানোনি? এডা আমারই 'বামুন' বাপ-দাদার—তোমাগোর কত্তাবাবুর বাবা মহারাজের না। তানাগোর মণ্ডপে আমি যদ্দিন বাঁচ্‌মু—তানাগোর মতই এসব কর্‌মু। তার পর তোম্‌রা যা কইর্‌বা সে ত দেখ্‌বারই পাই। আমার ছেরাদ্ধের পিণ্ডি দেওয়াইবা ওই জজ্ মাজিষ্টর দিয়া। বাইচা থাক্‌তেই ত মহারাজা কইরা পিণ্ড দিয়া থুইচ। যাও, আর রাগাইও না—কইও তোমার বাবুরে, সম্পাত্তি আমার বাবার—তার বাবার না। তানাগোর মত আমি সবই কর্‌মু। হঃ—সব মেলেচ্ছ, তারা মা—দুখহরা কাইল ঠিক ঠিক ফর্দ্দ কইরা আইনো জ্যান্। ওসব কত্তাটত্তা আমি মইলে তার পর জিজ্ঞাসা কইরো। যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মায়ের মন্দির, নবমী পূজা, মায়ের পূজা শেষ, পুরোহিত যজ্ঞান্তে পূর্ণাহুতি দিয়ে শান্তির জন্য কর্ত্তাকে ডেকেছেন—নাতনীর হাত ধ'রে জমিদার রামকান্তের মায়ের মন্দিরে আগমন ও প্রণাম।

রাম। নতুন-গিন্নি, আজ য়্যামন তোমর হাত ধইরা মন্দির আস্‌তেচি, তোমার ঠাকুমার হাত ধইরাও য়্যাকদিন য়্যামনি আইচিলাম—তোমার ঠাকুমার বয়স তের আর আমার তখন বয়স বিশ। ওঃ—সে আজ যাইট্ বছরের কথা—তারা মা, দুখহরা, তারিণি!!

মহামায়া। এইখানেই বসেন ঠাকুদ্দা, ওদিক সব বন্ধ আছে।

রাম। হঃ, এই বস্‌চি, ভটচায্ মশোয়, মার পূইজা নির্বিঘ্নে হইচে তো—ভোগ হইয়া গ্যাচে নাকি?

পুরোহিত। আজ্ঞে, এই ত ভোগ হ'ল।

রাম। ভোগ হইচে, বেশ। বেশ পূর্নাহুতিও দিচ নাকি?

পুরোহিত। দিচি।

রাম। বেশ, ও নতুন-বৌ, কৈ গো, ছাও ত তোমার পুরুত-কাকাকে আমার সেই পেন্নামীটা।

মহামায়া। এই নিন পুরুত-কাকা (দশটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

রাম। ভট্চায, এবারকার বিশেষ দক্ষিণা। মার পুইজার কি আবার দক্ষিণা হয় নাকি? তবে তোমাগোর শাস্ত্রে আছে তাই। মার কাচে ভালো কইরা জানাও ভট্চায, মায়ের কোলে জ্যান শীগগীর কইরা জায়গা পাই। আর না, এসব অনাচার আর দেইখ্‌বার ইচ্ছা নাই। নায়েব আছো না? রাইয়তগোর খাওয়ান দাওয়ান ত সব ঠিক মতো হইচে?

নায়েব। রাইয়তেরা আনন্দে মহারাজের গুণ—

রাম। থামো। হইচে। নতুন-বৌ, তোর বাবা কইরে? শান্তি নিলো না? তোর মা?

মহামায়া। মা ভোগ-দালানে আছেন, ঐ আস্‌চেন। বাবা তো খেয়েদেয়ে ঘুমাইচেন।

রাম। খাইচেন—ঘুমাইচেন! বেশ বেশ, মার ভোগ হয় নাই, পুইজা শেষ হয় নাই, তানি খাইচেন—ঘুমাইচেন! মহারাজার ব্যাটা কি-না? ভাল শিক্ষা দিচিলাম যে। সাহেব রাইখ্যা পড়াইছিলাম, এম্-এ পাশ করাইচিলাম—তারা মা—তারা মা—

পুরোহিত। এই মার প্রসাদ ও শান্তিজল নিন।

রাম। আর শান্তি, ছাও—শান্তি হইবো মার কোলে, তার আগে না। ভট্চায, এ মেলেচ্ছের রাজ্যে না। তা পার্‌চি কই, মা বেডি ত পাষাণী, বুড়ার কথা কানেই যায় না। ভট্চায, একটা কথা মার কাছে বলো, ভাল কইরা বলো তো—তোমরাইতো বলার ক্ষ্যামতা রাখো—আমার এই নতুন-বৌর জন্যে একটা ময়ূর-ছাড়া কাত্তিকের মতো বর নি জুটাইয়া ছায়। তা হ্যাঁ—তোমাগোর একালের ঐ কোচা-ছাড়া বুট পায়ে নবাব কাত্তিক না, আমাগোর জুয়ান কালের কাত্তিক—"ছাব্‌তা" কাত্তিকের মতো হয়। কেমন নতুন-বৌ, সে কাত্তিকের ময়ূর না হইলে চইল্‌বো না—?

মহা। ঠাকুদ্দা, আবার মন্দিরেও তুমি আমার রাইসে লাগচো। আমি চৈল্‌লাম, থাকো তুমি (রাগে প্রস্থানোদ্যত)।

রাম। ও নতুন-বৌ, শোন্, শোন্, রাগ কর্‌লি নাকি সত্যি সত্যি? আরে তুই রাগ কর্‌লি, বুড়াডার উপায় কি হইবো? এডারে কে ছ্যাখ্‌বো, আরে মার আশীর্বাদ ডা লইয়া যা, আচ্ছা কাত্তিক না হয়, ঐ গণ্‌শার মত শুড়ওয়ালা লাল টুক্‌টুকে বর হৈব। শুড় দিয়া জড়াইয়া আদর কইর্‌ব—কান দিয়া বাতাস কইরব। ছাও ভটচায, মায়ের শান্তি—(শান্তি জল গ্রহণ) আঃ—তারা মা, দুঃখহরা—দুর্গা!

(৩) দুর্গোৎসব

বর্ত্তমান—১৩৪৬ সাল

আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমী। প্রাতঃকালে জমিদার-বাড়ীর মণ্ডপে মায়ের প্রতিমার রং হচ্চে। পার্শ্বে ঠাকুরদালান, অলিন্দে বিধবা বর্ষীয়সী জমিদারপত্নী পূজোর জোগাড় করছেন। পার্শ্বের দালানে জমিদারপুত্রের গৃহের মধ্যে কৌচে শায়িতা অধ্যয়নরতা শিক্ষিতা পুত্রবধূ। অলিন্দের সামনে ছড়ি হস্তে ভ্রমণ প্রত্যাগত যুবক পুত্র।

গৃহিণী। বাবা কমল, সত্যি তা হ'লে তোরা পূজোতে বাড়ী থাক্‌ছিস্‌নে? বাড়ীতে আনন্দময়ী মা আস্‌ছেন। কোথায় তোরা সবাই মিলে আমোদ-আহ্লাদ করবি, তা নয় আমার দাদুদের নিয়ে বিদেশে বিভূয়ে ঘোরা। ওরে শুন্‌ছিস্, আমার বড্ড প্রাণে লাগ্‌বে রে—আজ পঞ্চমী—আর চার-পাঁচটা দিন; এ কটা দিন থেকে যা, বিজয়ার দিন যাস্। বৌমাকে বুঝিয়ে বল্‌গে লক্ষ্মী বাপ আমার।

কমল। আমার ত তেমন আপত্তি ছিল না মা, কিন্তু ওঁর শরীরটা আজকাল মোটেই ভাল যাচ্ছে না, মাথার অসুখ লেগেই আছে—পূজোতে ঢাকের শব্দ, লোকজনের চীৎকার, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হবে তাই যেতে চাচ্ছেন। একটু স্বাস্থ্যকর স্থানে চ্যাঞ্জে গেলে যদি শরীরটা আবার সারে। বাড়ীও ঠিক করা হয়েচে—মধুপুর, অর্দ্ধেক ভাড়াও দিয়ে দিয়েছি। পুরুত মশাই বল্‌ছিলেন, কাল প্রাতে দিনও ভালো, তাই কাল যাবার কথা একরকম ঠিক ক'রে ফেলেছি কি-না?

মা। তাতে আর কি হ'লো, আমি নায়েবকে ডাকিয়ে সব বলে দিচ্ছি। বিজয়ার দিন গেলে যাত্রার দিনও দেখ্‌তে হবে না। তোরা কেউ বাড়ী থাক্‌বিনে, দাদু দিদিরা থাক্‌বে না, আমার মা-লক্ষ্মীটিও না, আমি কি মন দিয়ে মাকেই ডাক্‌তে পারব দুদণ্ড?

কমল। আমি ত তোমাকে বলেছিই মা। ওঁর যদি আপত্তি না থাকে, আমি অমত কর্‌বো না—তুমি ডেকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে দেখো না।

মা। বৌমা ছেলেমানুষ। তার আবার মত কি নেবো রে? কিই যে বলিস্—তোদের ভাব বোঝাই আমার দায় হয়েচে।

কমল। তা মা, এ নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমি এখন ঝগড়া কর্‌তে পার্‌ব না। শেষে আবার মাথার অসুখ বেড়ে গেলে ডাক্তার ডাকার পাল্লায় পড়্‌বে কে? প্রাতঃকালেই আমি একটা তেমন ফ্যাসাদে পড়ি—এই তোমার ইচ্ছে নাকি?

মা। বালাই, ষাট্। তা কেন? তোরাই ত আমার সুখ-আনন্দ—সবই রে। তোদের বাদ দিয়ে কি আমার সুখ-আহ্লাদ কিছু আছে নাকি? আচ্ছা, ডাক্ দেখি বৌমাকে। (অদূরে নাতনী পটুকে লক্ষ্য করে) এই পটু, তোর মাকে একবার ডাক্ ত।

পটু। মা ত ঐ দরজার পাশেই বসে পড়ছেন ঠাক্‌মা। ওমা, শুন্‌চ, ঠাক্‌মা ডাক্‌ছেন।

মা। (অগ্রসর হইয়া) বৌমা, লক্ষ্মীটি আমার, তোমরাই আমার সব—তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। বল্‌চি কি, বাড়ীতে পূজো, মা আস্‌ছেন। তোমরা এ ক'টা দিন থেকে যাও, বিজয়ার দিন যেয়ো। এত দিনই রয়েছ, আর তিন-চারটা দিনে তোমার শরীর এমন বেশী কিছু খারাপ কি হবে মা? মা'র চরণে পুষ্পাঞ্জলি দাও—আশীর্বাদ নাও, সব ভাল হ'য়ে যাবে মা। কেমন রাজি?

বধূ। ওহ্ সিলী আইডিয়া, নন্‌সেন্স! তা আমি ত কাকেও বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি না মা, আপনার ছেলে থাকুক না বাড়ীতে। আমার দাদাকে আজই তার ক'রে দিচ্ছি—তিনি এসে আমাদের নিয়ে যাবেন। তবে খোকা-খুকীকে ফেলে রেখে যেতে আমি পারব না—শেষে অসুখ-বিসুখ কিছু এই ক'দিনের অনিয়মে হ'লে আমাকেই ত ট্রাব্‌ল্ দেবে।

কমল। শুন্‌চ, মাত্র পাঁচটা দিন থেকে গেলেই মা'র—

মা। না বাবা, কাজ নেই, আমারই ভুল হয়েচে। যাও মা, তোমার স্বামী—তাকে আমার জন্য কেন রেখে যাবে? তোমার শরীর শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভালো হ'য়ে উঠুক, আশীর্বাদ কর্‌চি। আমার সাধ-আহ্লাদ সে ত কর্ত্তার সাথেই সব চিতায় শেষ ক'রেছি। বাবা কমল, তোমরা কালই যাও—আমি আর বাধা দেব না—আমার শ্বশুরের ভিটের পূজো আমিই করব। মা ভগবতী তোমাদের মঙ্গল করুন!

(৪) দুর্গোৎসব

(ভবিষ্যৎ—)সন—১৩৭৫

৩০শে ভাদ্র—১৩৭৫—প্রাতঃকাল। কলিকাতা ৮নং আমহার্ষ্ট রো, পত্রিকাপাঠনিরত পেলবপ্রসূন দে—বন্ধু নলিনীলোভনরে'র প্রাতঃভ্রমণ অন্তে আগমন।

নলিনী। গুড্ মর্নিং কম্‌রেড্ পেলব ডে, "প্রগতি" পড়্‌ছেন, খবর কি?

পেলব। গুড্ মর্নিং কম্‌রেড্ রে, খবর? ডক্টর আইভি চৌড্রির বিলটা ভোটে পাশ হয়ে গেচে।

নলিনী। গুড্ নিউজ্ ইন্‌ডিড! সেই "দুর্গোৎসব নিরোধ" বিলটা? আরে ওটা ত পাশ হবেই, হওয়া উচিতও। পড়ুন, পড়ুন কি লিখেছে।

পেলব "দৈনিক প্রগতি" পত্রিকা পাঠ করিতে লাগিলেন

গত কল্য বঙ্গীয় শাসনপরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা কুমারী ডক্টর আইভি চৌড্রির আনীত "দুর্গোৎসব নিরোধ" বিলের আলোচনা আরম্ভ হয়। ডক্টর চৌড্রি বিলটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন—"দুর্গোৎসবকে যাঁরা জাতীয় উৎসবরূপে স্বীকার করেন তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বিশাল ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এই উৎসবের কোন অস্তিত্ব বর্ত্তমানে নাই। ত্রিশ বৎসর পূর্বে দু-এক স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে এর অনুষ্ঠান হ'ত, পুরাতন পত্রিকাতে দেখা যায়। কিন্তু ঐ সকল প্রদেশে কংগ্রেস-শাসন প্রবর্ত্তনের পর উহা ক্রমশ বঙ্গীয়তা প্রচারক জন্য প্রাদেশিক শাসকগণ কর্তৃক বন্ধ হয়। বর্তমান যুগে বাংলার সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ধর্মগত জীবনে এমন কিছু থাকাই সঙ্গত নয় যার উদ্দেশ্য নিখিল-ভারতীয় জাতীয়তা ও ঐক্যসাধনের বিরোধী। দুর্গোৎসব বাংলা দেশের, উহা সমগ্র জাতির উৎসব কোনো দিনই ছিল না। সীমাবদ্ধ গোড়া হিন্দু ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই উহার প্রচার, সুতরাং ইহাকে আভিজাত্যেরই একটা প্রকাশ-রূপ মনে করা অসঙ্গত নয়। প্রকৃত শিক্ষিতদের মধ্যে উহা কোনো দিনই

ছিল না। কিন্তু এই উপলক্ষে হিন্দু ও অহিন্দু ভাইদের মধ্যে একত্র আহার ও মন্দির-প্রবেশ নিয়ে আর মুসলমান ভাইদের সঙ্গে বিগ্রহ বিসর্জ্জন নিয়ে এই সময় বিশেষ অজাতীয় মনোভাবের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এই বিবাদের কারণটি আইন দ্বারা বন্ধ করলে বিশাল ভারতের জাতীয় মুক্তি ও সম্মেলনের বাধা দূর হবে।

দ্বিতীয়ত, এই উপলক্ষে বহু দোকানদার ও ব্যবসাদার অযুক্তরূপে দ্রব্যাদির মূল্য অল্প কয়দিনের জন্য বৃদ্ধি ক'রে বহু লোককে ন্যায়ত প্রতারিত করে। শ্রেণীগত ব্যবসায়ী-স্বার্থের মোহে সমষ্টির ও সমাজের স্বার্থহানির সুযোগ বন্ধ করা সামাজিক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

তৃতীয়ত, সব চেয়ে গুরুতর প্রয়োজনীয়তা বিলটির এই যে, দুর্গোৎসব মূর্তিটির উদ্দেশ্য রূপকের সহায়তায় বর্ণভেদ ও ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের খড়্গে শ্রমিক ও অনুন্নত শ্রেণীর পরাভব চিত্রের পূজা। সিংহ অশিক্ষিত—অনুন্নত কৃষকশ্রেণীর দ্যোতক, অসুরটি অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত বর্ণহিন্দু। দুর্গামূর্তিটি বর্ণ ও ধনিক শক্তি—নাগপাশটি আর্থিক পরবশ্যতার প্রতীক। অশিক্ষিত কৃষক ও অনুন্নত শ্রেণীর পিঠে চড়ে ও সহায়তায় সিংহ বলে বলী হ'য়ে অর্থের নাগপাশে বন্ধ ক'রে বর্ণহিন্দুর অল্প শিক্ষিত অসুর শক্তির পরাজয় হচ্ছে ধনিক ও শিক্ষিত শক্তির হস্তে। লক্ষ্মী ধনশক্তি, সরস্বতী বিদ্যাশক্তি, গণেশ গণশক্তি, কার্তিক সামরিক শক্তি—সমস্তই ধন ও আভি-জাত্যের সহায়।—এই যে মূর্তি পূজার মধ্য দিয়ে সমগ্র অখণ্ড ভারতের জাতীয়তার বিরুদ্ধ মত প্রচার বাংলাতে করা হচ্ছে কয়েক শতাব্দী ধরে'—প্রত্যেক জ্ঞানী শিক্ষিত ভ্রাতাভগ্নীরই এর সমূলে উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। কুমারী ডক্টর চৌড্রির এই উক্তি কংগ্রেস দলের প্রধান চাবুক ব্যারিস্টার প্রসূনেশমঞ্জুল সেন সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সমর্থন করেন এবং ডক্টর চৌড্রীর এই মহৎ কার্য্য সমগ্র ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি পত্তন ও মিলনের এভেনিউ ব'লে গণ্য হবে আশা করেন। ল' মেম্বার স্যর এস্তাম্বুল কাদিরও এর যুক্তি-যুক্ততা ও সারবত্তা স্বীকার করেন। কেবল বর্ণাশ্রমীদের মধ্য হ'তে পণ্ডিত পাতঞ্জলি মুখোপাধ্যায় বিরুদ্ধে বলেন—দুর্গোৎসব বাংলার জাতীয় উৎসব—মহাযজ্ঞ—সুদীর্ঘ পাঁচ শত বৎসরের জাতীয়তা এর স্মৃতিতে জড়িত। ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রের বন্দেমাতরম্ গানের মধ্যেও এর বিশিষ্ট উল্লেখ পূর্বে ছিল, সুতরাং এর প্রতিরোধে আইন করা শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুর প্রাণে গুরুতর আঘাত দান—অত্যাচার, জাতীয়তার, বাঙালীত্বের ধ্বংসসাধন। এরূপ আইন বাংলার শাসন-পরিষদে সমর্থিত ও পাশ হ'লে বাংলার জাতীয় সর্বনাশেরই কারণ হবে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে প্রেসিডেণ্ট খান বাহাদুর স্যর এবাদতালী বিষয়টি ভোটে দেন। বিলটির স্বপক্ষে ৩১০ ও বিপক্ষে ৪০টি মাত্র ভোট গৃহীত হয়। প্রবল আনন্দধ্বনির মধ্যে বিলটি পাশ হয়।

নলিনী। একটা আপদ গেল বল্‌তে হয়। এই ত একমাস পরেই পূজোর তত্ত্বের চোটে অস্থির হ'তে হ'ত। পূজোই গেল তার আবার তত্ত্ব। বরং সেই টাকা ক'টা দিয়ে এবার পুরী কি মধুপুর চেঞ্জে যাওয়া যাবে। ই. আই, আর. ত চমৎকার কন্‌সেসনও দিচ্ছে।

পেলর। যা বলেছ, ডক্টর চৌড্রীকে আমি প্রাণ খুলে কংগ্রেচুলেট্ করছি। দুর্গোৎসব না ত গরীবের দুঃখোৎসব। এর তাগাদা, ওর তাগাদা। পূজো-টুজো এ যুগে যত না থাকে ততই ভাল। যত সব য়্যান্টিকোয়েটেড্ ফুলিশ ডগ্-ম্যাটিজম্ য়্যাণ্ড ব্লাইণ্ড হিপোক্রেসি, মানুষ পূজো করেই নিশ্বাস ফেলবার উপায় নেই, তা আবার এই সব আইডিয়ে-লিজম্-এর পূজা। ও সব স্যাভেজ্ বারবেরিজ্‌ম্-এর অড্ ব্রিট্‌ল্ রেম্‌নেণ্ট—যত যায় ততই ভাল।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

পেন্সিল সংগ্রহের হবি

খ্যাতনামা ব্যক্তির স্বাক্ষর, ডাকটিকিট, দেশলাইয়ের খোল, প্রাচীন কালের মুদ্রা সংগ্রহ প্রভৃতিকে পুরাতন হবি বলা চলে।

সাগর পারে কেবল ছেলে মেয়ে নয়, বুড়োদের ভিতরও এ সব সংগ্রহের সখ আছে। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের কাছে এ জিনিষটী একেবারে অপরিচিত নয়।

কিন্তু ব্যবহৃত পেন্সিল সংগ্রহের হবি একেবারে নূতন। টেক্সের ফোর্টওয়ার্থে ই এইচ কাশবার্ণ নামক এই ভদ্রলোকের পেন্সিল সংগ্রহের হবি আছে। তাঁর কাছে খ্যাতনামা ব্যক্তির ব্যবহৃত পেন্সিল আছে ১,০০০,০০০। এই সংগ্রহের মধ্যে একত্রিশটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারী কার্য্যে, গভর্ণর কর্ত্তৃক ব্যবহৃত পেন্সি-লের নাম উল্লেখযোগ্য।

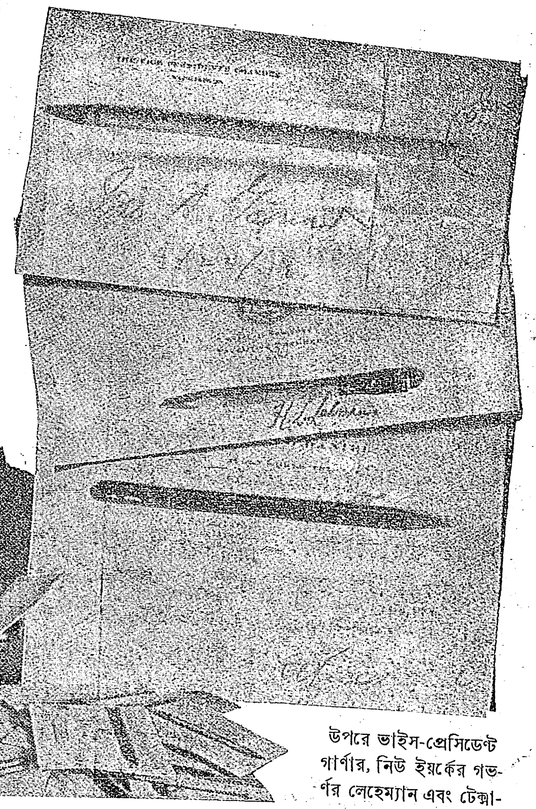

কতকগুলি পেন্সি-লের ইতিহাসও আবার রহস্য পূর্ণ। সংগৃহীত পেন্সিলের মধ্যে একটি ডবলিউ আরভিল বেল কর্ত্তৃক তাঁর নিজের মৃত্যু-নিদর্শন পত্রে (Death Certificate) স্বাক্ষরের নিমিত্ত ব্যবহৃত হ'য়েছিল। ঘটনাটি রহস্যপূর্ণ : মিঃ বেল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শোচনীয় পীড়ায় আক্রান্ত হন, একদিন সকাল দশটায় তাঁর জীবনের অবসান ঘটল। মৃত্যু যে নিশ্চিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। তাঁর মা পুত্রের মৃত্যু-নিদর্শন পত্রে স্বাক্ষর করলেন ; সামাধি স্তম্ভ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের আদেশও দিলেন। কিন্তু এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল। ঐ দিনই মিঃ বেল বেলা চার ঘটিকায় পুনর্জীবন লাভ করলেন। শয্যা-পার্শ্বে নিজের মৃত্যুনিদর্শন পত্র দেখতে পেয়ে মিঃ বেল কৌতুক উপভোগের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে সেই পত্রে নিজের নাম স্বাক্ষর করে দিলেন।

ই এইচ কাশবার্ণ

উপরে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট গার্ণার, নিউ ইয়র্কের গভর্ণর লেহেম্যান এবং টেক্সাসের ও' ডানাইলের ব্যবহৃত পেন্সিল ও হস্তাক্ষর

দীর্ঘকাল ব্যাপী পেন্সিল সংগ্রহ করে মিঃ কাশবার্ণ কয়েকটি তথ্য আবিষ্কার করেছেন। বিভিন্ন লোকের স্বভাব এবং ব্যক্তিত্ব তাদের ব্যবহৃত পেন্সিল পরীক্ষা করে তিনি বলতে পারেন।

তাঁর মতে সাধারণত মানুষ হল্‌দে রংয়ের পেন্সিল ব্যবহার করে। তাঁর সংগৃহীত একত্রিশটি বিভিন্ন গভর্ণরের ব্যবহৃত পেন্সিলের মধ্যে উনত্রিশটি হল্‌দে রংয়ের। মেয়েরা নানা রংয়ের পেন্সিল পছন্দ করে। আর তাদের ব্যবহৃত পেন্সিলগুলি প্রায় দাঁত দিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়। ছোট ছেলেমেয়েরা সকল রংয়ের পেন্সিলই চায়।

পেন্সিল সংগ্রহ ছাড়া বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির হস্তাক্ষর সংগ্রহও তাঁর এক বাতিক।

পুরাতন মোটর হর্ণ

মোটর হর্ণ এতদিন অসাবধানী পথিককে সতর্ক ক'রেই এসেছে। কিন্তু ইংলণ্ডে খরিদ্দাররা পুরাতন মোটর

দোকানদারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পুরাতন মোটর হর্ণ

হর্ণ সাহায্যে পোল্‌টি ফার্ম্মের কর্ম্মব্যস্ত দোকানদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হর্ণের আওয়াজে খরিদ্দার যে ডিম কিনতে এসেছে তা' দোকানদার বুঝতে পারে। সাধারণের সুবিধার জন্য পোল্‌টি ফার্ম্মের নিকটস্থ বৃক্ষে পুরাতন মোটর হর্ণগুলি লাগান থাকে।

বৃক্ষের সবুজ পত্র

বৃক্ষের জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটনে বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যের জন্য ডাঃ আর্ল এস জনষ্টোন একটি নিখুঁত যন্ত্রের আবিষ্কার

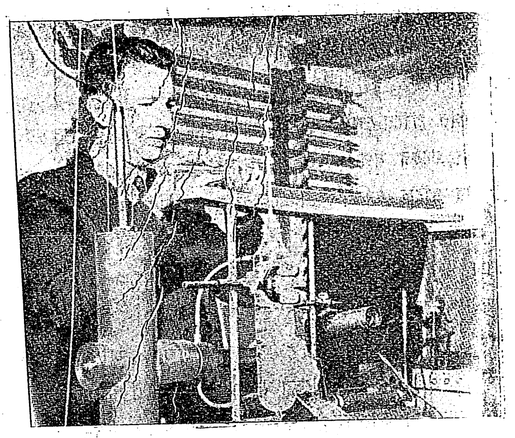

যন্ত্র দ্বারা বৃক্ষের ক্লোরোফিলের ঘনীভূতকরণ পরীক্ষা

ক'রেছেন। এই যন্ত্রটি বৃক্ষে যে ক্লোরোফিল নামক প্রাণদায়ক সবুজ দ্রব্য বিদ্যমান থাকে তার ঘনীভূতকরণ পরিমাপ করে। বৃক্ষ হ'তে নিষ্কাশিত আলোক-পোষণকারী ক্লোরোফিলের মধ্যে আলোকমালা সঞ্চালন দ্বারা উহার ঘনীভূতকরণের ওজন নিরূপণ করা হয়।

পরিপাক ক্রিয়ার যন্ত্র

আমাদের পাকস্থলী মধ্যস্থ খাদ্য কিরূপে পরিপাক হয়

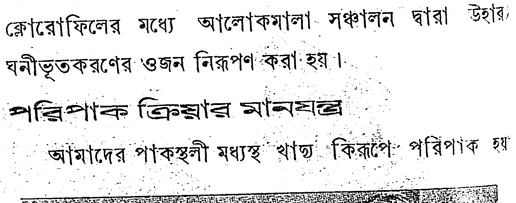

যন্ত্র সাহায্যে পরিপাক ক্রিয়া পরীক্ষা

তার রহস্য বর্ত্তমানে ফিলাডেলফিয়া কলেজে এক যন্ত্র সাহায্যে উদ্‌ঘাটন করা হ'য়েছে। এই পরীক্ষার নিমিত্ত চিত্রে একজন মহিলাকে রবার টিউবের শেষাংশের Electrode গলাধঃকরণ করিয়ে খাদ্য ভক্ষণ ক'রতে দেওয়া হ'য়েছে। এই টিউব মধ্যস্থ একটি তার বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত থাকায় পাকস্থলী মধ্যে যে পরিপাক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তার বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত কলেজের জনৈক উৎসাহী ছাত্র 'antimony gastric electrode' গলাধঃকরণের জন্য প্রতিবার দু' ডলার পারিশ্রমিক পেত। তা ছাড়া বিনা মূল্যে কলেজ হোষ্টেলে তার আহারেরও ব্যবস্থা ছিল।

আমাদের দেশে এইরূপ যন্ত্রেরও বালাই নাই আর সে রকম উৎসাহী ছাত্রই বা কোথায়?

টাইপ রাইটারে ছবি

মিঃ রোসাইরি জে বেলাঙ্গার নামে একজন বিচক্ষণ টাইপিষ্ট টাইপ রাইটারে বহু সুন্দর ছবি এঁকেছেন। প্রথমে সাদা কাগজের উপর মনোমত পেন্সিল স্কেচ্ ক'রে টাইপ রাইটারের বিভিন্ন চিহ্নে ছবিটির আউট লাইন এবং যথাযথ স্থানে সেড্ দেওয়া হয়। ছবিটি আঁকা শেষ হ'লে কিছুদূর থেকে কার্পেটের কাজ বলে সকলেই ভুল করেন।

মিঃ বেলাঙ্গার অবসর সময়ে এইরূপ ছবি এঁকে আনন্দ পান।

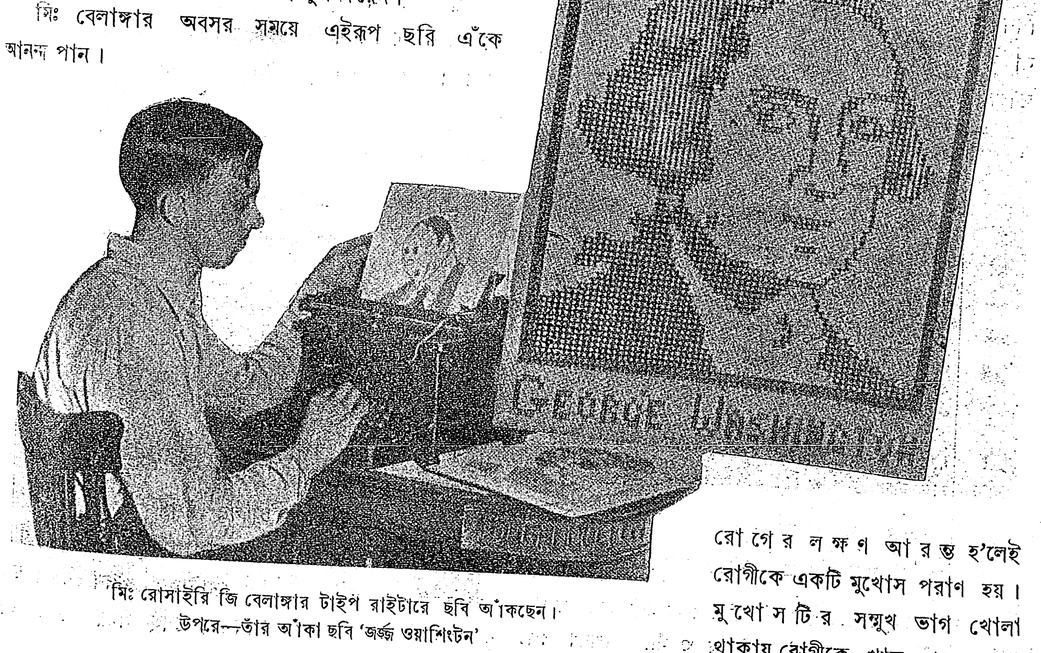

মিঃ রোসাইরি জি বেলাঙ্গার টাইপ রাইটারে ছবি আঁকছেন।
উপরে—তাঁর আঁকা ছবি 'জর্জ্জ ওয়াশিংটন'

সামুদ্রিক পীড়ার চিকিৎসা

ডাঃ ওয়ালটার বোথবাইয়ের গবেষণায় অক্সিজেন চিকিৎসার সাহায্যে বর্ত্তমানে সামুদ্রিক পীড়া আরোগ্য হ'চ্ছে।

সামুদ্রিক পীড়ায় চিকিৎসা

রোগের লক্ষণ আরম্ভ হ'লেই রোগীকে একটি মুখোস পরাণ হয়। মুখোসটির সম্মুখ ভাগ খোলা থাকায় রোগীকে খাদ্য গ্রহণে এবং

কথারার্তায় অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয় না। একটি রবারের নলের সাহায্যে নাকের ভিতর দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হয়।

কৃত্রিম চক্ষুর সাহায্যে দৃষ্টির ক্ষীণতা নিরীক্ষণ

যানবহুল রাস্তায় সুশৃঙ্খলভাবে যান পরিচালনের নিমিত্ত যে সকল সঙ্কেত-চিহ্নের ব্যবহার হয় সেগুলি Astigmatism এ আক্রান্ত মোটর চালকদের চোখে কিরূপ বিকৃতভাবে দৃষ্ট হয় তা ফ্রেড্‌রিক হ্যামিলটন কৃত্রিম চক্ষু সাহায্যে অনুকরণ করেছেন। এই পরীক্ষার নিমিত্ত দুটী সমান প্রোজেক্টার সাহায্যে পর্দ্দার উপর একটি মূর্ত্তিকে উপস্থিত করা হয়। ইহার পর বিশেষ কাচ সাহায্যে দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তির চক্ষু যেরূপ কোন বস্তুর প্রতিবিম্বিত রূপ সম্মুখ মস্তিষ্কে (cerebrum) সঞ্চালন দ্বারা বিকৃত করে সেইরূপভাবে কৃত্রিম উপায়ে ছবিটিকে বিকৃত করা হয়।

দৃষ্টিশক্তিহীন মোটর চালকদের মোটর চালনা কতখানি বিপদজনক তা' এই যন্ত্রটি প্রমাণ করেছে। চশমা ব্যবহার না ক'রে এই অবস্থায় সতর্ক-সঙ্কেত চিহ্নের কিয়ৎ অংশই তাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

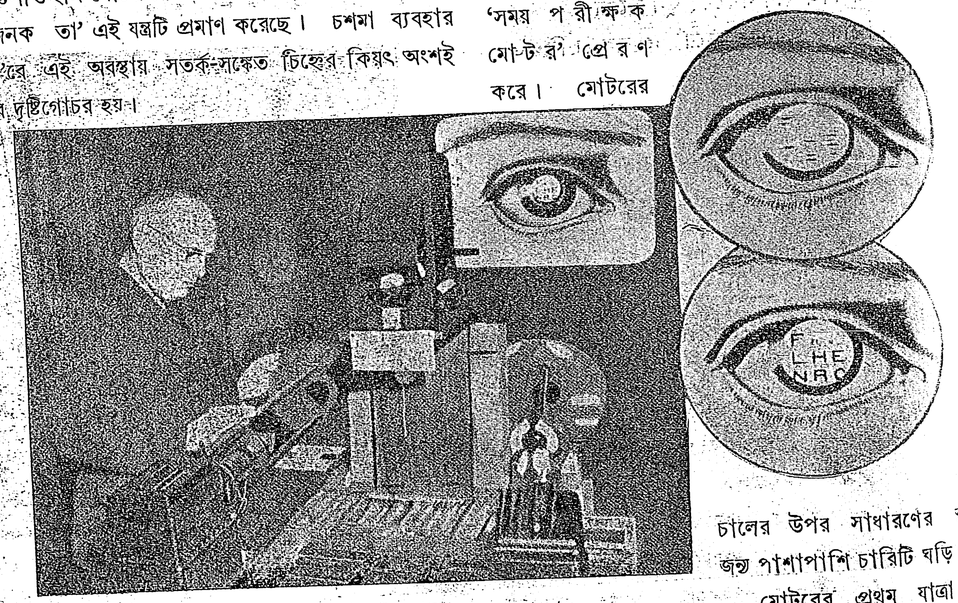

কৃত্রিম চক্ষু সাহায্যে ক্ষীণ দৃষ্টি শক্তির দোষ অনুকরণ। ডানদিকের উপরে দৃষ্টি শক্তিহীন চোখে অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব ও নীচে সাধারণ চোখে স্পষ্ট অক্ষর

সময় নির্দ্দেশক মোটর

লণ্ডন সহরে যানবাহনের ভীড় অত্যধিক হওয়ায় উহারা গন্তব্য স্থানে সময়ে পৌছতে পারে না। বিলম্বে

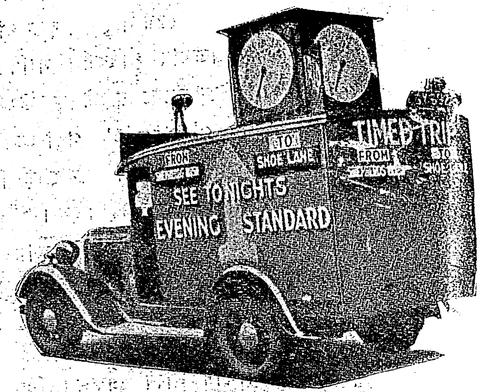

সময় নির্দ্দেশক মোটর

পৌছানর সঠিক কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত 'লণ্ডন ইভনিং নিউজ পেপার' প্রতিদিন সহরের যে সকল স্থানে মোটর চালকদের এই দুর্ভোগ ভোগ ক'রতে হয় সেই সকল স্থানে 'সময় পরীক্ষক মোটর' প্রেরণ করে। মোটরের চালের উপর সাধারণের সুবিধার জন্য পাশাপাশি চারিটি ঘড়ি থাকে।

মোটরের প্রথম যাত্রা স্থানের নাম ও সেই সময় এবং গন্তব্য স্থানের নাম উল্লেখ থাকে। গন্তব্য স্থানসমূহে পৌছতে কতসময় লাগে তার ফলাফল কাগজের পরবর্ত্তী সংস্করণে মুদ্রিত হয়। জনসাধারণ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির অসুবিধা দূরকরণের নিমিত্ত এইরূপ ব্যবস্থা!

গোলকটিকে ছাতার মত গুটিয়ে স্বচ্ছন্দে হাতে রাখা হয়েছে

পৃথিবীর গোলক

সাধারণত পৃথিবীর যে গোলক (Globe) পাওয়া যায় তাকে এক স্থান থেকে অন্য যায়গায় নিয়ে যাওয়া অসুবিধাজনক। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য বর্ত্তমানে এক অভিনব গোলকের আবিষ্কার হ'য়েছে। গোলকটিকে ইচ্ছা অনুযায়ী ছাতার মত গুটিয়ে স্বচ্ছন্দে হাতে করে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় সময়ে হাতলের উপরিভাগস্থ আংঠাটী উপরদিকে ঠেলে তুললেই গোলকের আকার ধারণ করে। মজবুত কাপড়ের উপর গোলকটি মুদ্রিত। ইউরোপের ছাত্রমহলে এই অভিনব গোলকটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ ক'রেছে।

গুটান ছাতাটি গোলক আকার ধারণ ক'রেছে

আলোক-সঞ্চারী থলে

লাল মাছের সখ অনেকেরই। বাজার থেকে লাল মাছ কিনে আনার অসুবিধাও অনেক। বেশীর ভাগ

আলোক-সঞ্চারী থলের মধ্যে লাল মাছ

সময়েই মাছগুলি মারা পড়ে। সম্প্রতি একটি থলে তৈয়ার করা হ'য়েছে। থলেটিতে মাছগুলি বহুক্ষণ জীবিত থাকে।

সেলুলয়েড জাতীয় দ্রব্য থেকে থলেটি তৈয়ার হওয়ায় থলি মধ্যস্থ মাছগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায়।

যন্ত্র সাহায্যে রাত-কাণা পরীক্ষা

রৌদ্র থেকে কোন ছায়াচিত্র গৃহে প্রবেশ ক'রলে সকলেই কিছুক্ষণের জন্য চক্ষে অস্পষ্ট দেখেন। যাঁদের এ অস্পষ্টভাব প্রায় দশ মিনিট কাল বিদ্যমান থাকে তাঁরা রাতকাণা রোগে আক্রান্ত হ'য়েছেন বুঝতে হবে। চোখের এইরূপ অবস্থার কথা রোগীও সকল সময় বুঝতে পারে না।

সম্প্রতি এক নূতন যন্ত্র সাহায্যে রাতকাণাকে পরীক্ষা করা হ'চ্ছে। রোগীকে প্রথম একটি উজ্জ্বল আলোর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রতে দেওয়া হয় পরে এক অস্পষ্ট—তীরের গতিবিধি লক্ষ্য করতে বলা হয়। রাত-কাণার কারণ 'এ' ভিটামিনের অভাব। আহারের কিছু পরিবর্ত্তনে এই রোগ হ'তে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করা যায়।

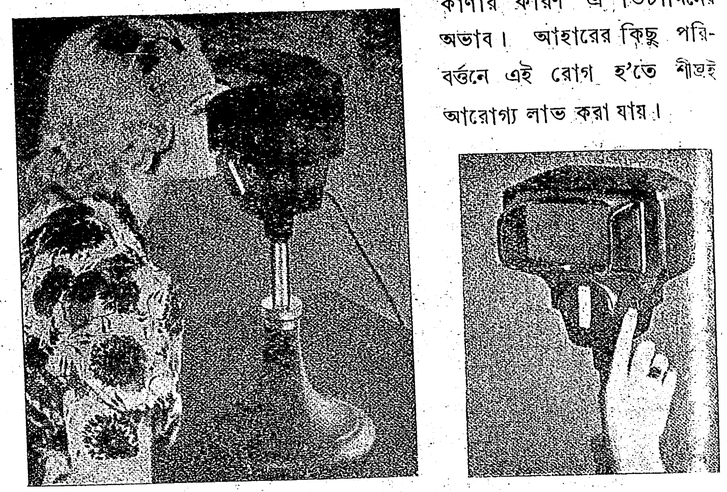

বামদিকের উজ্জ্বল আলোতে রোগীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা শেষ হ'লে ডানদিকের যন্ত্রটিতে রোগীকে একটি তীরের গতি পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়

শরতে

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

আজি প্রভাতের নির্ম্মল নীল আকাশ ভরিয়া মাধুরী হাসে—
তরুণ রবির স্বর্ণ-কিরণে নিখিল ধরণী পুলকে হাসে !
শিশির-সিক্ত শুভ্র শেফালী
যতনে সাজায় অর্ঘ্য-সমালী ;
বনে উপবনে তরু ও লতায় শোভে রাশি রাশি বিকচ ফুল,
হরষে মাতিয়া আগমনী কার গাহিছে মধুর বিহগ কূল !
সুরভিত, মৃদু, স্নিগ্ধ পবন-পরশে আজিকে জুড়ায় প্রাণ,
আকাশে-বাতাসে ঝঙ্কারি' ওঠে সুমধুর কা'র বীণার তান !
নাহি বান ভরা তটিনীর বুকে,—
বেয়ে চলে মাঝি তরী মহাসুখে ;
বর্ষা-ধৌত শ্যাম প্রকৃতির শোভা যেন আর নাহি রে ধরে—
গভীর দীঘির কালো জলে আজ শত শতদল নৃত্য করে !
সবুজ-সোনালী ধান্যের ভার শীর্ষ লুটায় মাঠের বুকে—
যেন কমলার স্নেহ-পারাবার উদ্বেলিয়া ওঠে শতেক মুখে !
রাঙা পায়ে কা'র পড়িতে লুটিয়া
লাল জবা কত উঠেছে ফুটিয়া ;
রসের প্রবাহে, রূপে ও গন্ধে বিশ্ব আজিকে গিয়াছে ভরি,
চারিধারে এত সমারোহ ওরে কাহারে লইতে বরণ করি ?

বেহিসাবী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বলরাম ভদ্র পূজার ফর্দ্দ করিতেছিল। পূজার এখনও মাসখানেক দেরী আছে। আরও একটা মাসের মাহিনা পাওয়া যাইবে। কিন্তু এক মাসের মাহিনাতে সমস্ত জিনিস কেনা সম্ভব নয় বলিয়া এই মাসের মাহিনা হইতেও সে কিছু কিছু কিনিয়া রাখিতে চায়। খরচটা দুই মাসের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলে পূজার মাসের উপর চাপ কম পড়িবে। পূজার সময় জিনিসপত্রের দামও কিছু চড়িয়া যাইবে। আগে হইতে কিনিতে পারিলে সেদিক দিয়াও কিছু সস্তা হইবে।

শনিবারের সন্ধ্যায় মেসে লোক থাকে না বলিলেই হয়। সকলেই প্রায় বাড়ী যায়। বলরামের ঘরের অপর দুইটি বিছানা গুটানো। তাহারা বাড়ী গিয়াছে। দুই নম্বর ঘরে বুড়াদের পাশার আড্ডা এবং ছয় নম্বর ঘরের ছোকরাদের তাসের আড্ডাও নীরব। বলরামও প্রতি শনিবারে বাড়ী যায়। রবিবারে বাজার করিবে বলিয়াই এ শনিবারে বাড়ী যায় নাই।

গত সপ্তাহে বাড়ী হইতে একটা ফর্দ্দ সে লইয়া আসিয়াছে—মায়ের দেওয়া ফর্দ্দ। তাহাতে ছোট খোকার ভেলভেটের সুট হইতে আরম্ভ করিয়া বধূমাতার জর্জ্জেট শাড়ী পর্য্যন্ত সমস্তই আছে। কেবল নিজেরই জন্য বিশেষ কিছুর উল্লেখ ছিল না। বলরাম কলিকাতা পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মায়ের ত্রুটি সংশোধন করিয়া গৃহিণী পত্র লিখিয়া জানাইয়াছে, মায়ের জন্য রাঙ্গাপাড় গরদের শাড়ী একখানি নিতান্তই চাই। অন্য সকল খরচ কমাইয়াও তাহা যেন আনা হয়।

বলরাম মায়ের ফর্দ্দখানি সামনে রাখিয়া নূতন একখানি ফর্দ্দ করিতেছিল :

মায়ের গরদের শাড়ী	১২৲ টাকা
গৃহিণীর জর্জ্জেট শাড়ী	১২৲ "
বাবার লংক্লথের পাঞ্জাবী	১৲ "
ছোট খোকার সুট	৬৲ "

বলরাম মনে-মনে একবার টাকার অঙ্কটা যোগ দিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, বাবা !

চট করিয়া আর একখানা চিরকুট লইয়া বলরাম এদিকের হিসাবটা করিতে লাগিল :

সিটভাড়া	৩৸৵০
খাওয়া	১১৷৶১০
ধোপা, নাপিত ইত্যাদি	২৷০
তিনবার বাড়ী যাতায়াতের ট্রেন ভাড়া	৭৷০
জলখাবার	৩৷০
ট্রাম	২৲
সিগারেট, পান	২৲

বলরাম এই হিসাবটা মনে-মনে যোগ দিয়া আর একবার বলিল, বাবাঃ ! বেচারা ষাট টাকা মাহিনা পায়। মহামুস্কিলে পড়িল। নিজের একজোড়া জুতা না কিনিলেই নয়। বর্ষার নাম করিয়া অচল ছেঁড়া জুতাজোড়া দুই মাস চালাইয়াছে। এখন তাহা যে-কোনো মুহূর্ত্তেই সত্যাগ্রহ করিতে পারে। বলরাম হিসাব দুইটা আবার পর্য্যবেক্ষণ করিতে বসিল :

মায়ের গরদের শাড়ী কাটা চলিতেই পারে না। জীবনে কখনও তাঁহাকে একটা ভালো জিনিস দেয় নাই। পূজা-আহ্নিকেরও তাঁহার অসুবিধা হইতেছে। গৃহিণীর জর্জ্জেট শাড়ী ? সর্ব্বনাশ ! অত আশা দিয়া এখন জর্জ্জেট না কিনিলে তাহার কাছে মুখ দেখানো যাইবে না। অত আগে হইতে তাহাকে আশা দেওয়া ঠিক হয় নাই। একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নিজের শক্তি-সামর্থ্য বিবেচনা না করিয়াই দিয়া বসিয়াছে। বলরাম এখন তাহার জন্য অনুতপ্ত। কিন্তু অনুতাপ করিয়া তো ফল হইবে না। শাড়ী তাহাকে কিনিতেই হইবে।

বাকি ছোট খোকার সুট। ছোট খোকার কথা ভাবিতেই বলরামের চিত্ত কোমল হইয়া আসিল। বৎসরে এই একটিবার দেওয়া। বাপ হইয়া সে তাহার জিনিস

বাদ দিবে কি করিয়া? মা এবং গৃহিণীই বা কি বলিবেন? সে হয় না। বরং সে নিজের মেসের খরচ কমাইবে।

কিন্তু কোন্‌টা? বলরাম স্বচ্ছন্দে তাহার বাড়ী যাতায়াতের খরচের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ছাঁটিয়া দিতে পারে। আর পারে তাহার জলখাবারের খরচের কিয়দংশ ছাঁটিয়া দিতে। কোন্‌টা বাদ দেওয়া অপেক্ষাকৃত কম ক্লেশকর বলরাম তাহাই ভাবিতে বসিল।

সাড়ে নয়টায় নাকে-মুখে দুটি গুঁজিয়া আপিসে যায়। দুইটা বাজিতে না বাজিতেই জঠরগুহায় মুষিকের নৃত্য আরম্ভ হয়। সে সময় যাহা সে খায় তাহার পরিমাণ কোনো দিনই দুই আনার অধিক নয়। তাহাও বাদ দিলে সে টিকিবে কি করিয়া? ওদিকেও মাসে চারিটি তো মাত্র রবিবার। এই চারিটি দিনও যদি গৃহসুখ ভোগ করিতে না পায় তাহা হইলে জীবনে আনন্দ বলিতে থাকে কি?

বলরাম অনেক চিন্তা করিয়া এবং অনেক অঙ্ক কষিয়া স্থির করিল, এই দুইটা মাস জলখাবারের পরিমাণ দুই আনা হইতে এক আনায় নামাইবে এবং গৃহসুখ চারিদিনের জায়গায় দুই দিন করিবে। তাহাতে মাসিক প্রায় সাত টাকা বাঁচিবে। এই ব্যবস্থা করিয়া সে রাত্রে সে অনেকটা সুস্থ হইয়া আহারাদি সমাপন করিল।

আহারান্তে বলরাম কেবল বিছানায় গা গড়াইয়াছে এমন সময় মশ্‌ মশ্‌ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে দীনবন্ধু প্রবেশ করিল।

—ঘুমিয়ে গেলেন নাকি?

—না—বলরাম চোখ মেলিয়া চাহিল।

—এঁরা সব শনিবার করতে গেছেন বোধ হয়। আপনি যাননি যে বড়?

বলরাম হাসিল।

—হুঁ। এসব ভালো কথা নয়, ভালো কথা নয়। মাইনে তো কাটা যাবেই, তা ছাড়াও বোধ হয় শাস্তি আছে। কি বলেন?

—আছেই তো।

—তবে আপনি গেলেন না কেন?

—পূজোর বাজার কিছু করতে হবে।

—পূজোর বাজার!—দীনবন্ধু চমকিয়া উঠিল—পূজো তো এখনও অনেক দেরী।

—দেরী মানে একটা মাস। কিন্তু আমাদের মতো মাছি-মারা কেরাণী দু'মাসে নইলে কুলিয়ে উঠতে পারে?

—পারে না? এত কি কিনবেন শুনি? খানকয়েক শাড়ী, আর খানকয়েক ধুতি, আর কি?

দীনবন্ধু হাসিল। তারপর গম্ভীরভাবে বলিল, পূজোর দিন একটি একটি ক'রে এগিয়ে আসছে, আর বুকের রক্ত জল হচ্ছে। এ মাসেও ত্রিশ টাকা ধার হয়েছে, তার উপর মেসের টাকা দিতে পারিনি।

—কিন্তু মাইনে তো পান দুশো টাকা। একটা বিয়ে পর্য্যন্ত করেননি। কি হয় টাকাগুলোর?

—শ্রাদ্ধ, মানে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। খেতাম সিগারেট, বিড়ি ধরেছি। বোধ করি কৌপীনবন্ত না হ'লে আর ভাগ্যবন্ত হতে পারছি না।

—কি করেন?

—কি করি? শুনুন বলি: দুটি বোনের বিয়ে দিয়েছি। সেই যে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার করেছিলাম, তার জের এখনও মেটেনি। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর সেই ঋণের টাকা কেটে নিয়ে আফিস থেকে দেয় একশো কুড়ি টাকা তিন আনা। তার মধ্যে বাড়ীতে পাঠাতে হয়, একটি ভাই এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে তাকে পাঠাতে হয়। বোনেদের ছোট-খাটো দাবী লেগেই আছে। এর ওপর, একান্নবর্ত্তী পরিবার—খুড়তুতো, জাঠতুতো ভাই-বোনও আছে। মাইনে পাওয়া মাত্রই নেই।

বলরাম বিরক্তভাবে বলিল, কিন্তু আপনি যা পারবেন, তাই তো করবেন। তার বেশী···

দীনবন্ধু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা নেই তাই বলছেন। এর মধ্যে আর পারা-পারি নেই, পারতেই হবে। শুনুন তবে: আমার জ্যাঠামশাই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। গোটা পরিবার বাসুকীর মতো তিনিই ঘাড়ে ক'রে ছিলেন। অনেক বয়সে তাঁর ছেলে হয়। আমিই থাকতাম তাঁর কাছে কাছে।

—তিনি নিশ্চয় অনেক টাকা রেখে গেছেন?

—টাকা? কি ক'রে রাখবেন? যেমনভাবে তিনি নিজে

থাকতেন, দেশে যাঁরা থাকতেন তাঁদেরও ঠিক তেমনিভাবে রেখেছিলেন। যদি জ্যাঠাইমার জন্যে একখানা গহনা গড়িয়েছেন তো সব বৌ-এর জন্যেই সেই গহনা গড়িয়েছেন।

—তাঁর আর ভাইরা কিছু করতেন না?

—কি করতে করবেন? ব'সে খেতে পেলে কে পরের দোরে খাটতে চায় বলুন।

—এ ভারি অন্যায়!

—অন্যায়। জ্যাঠাই-মা এ নিয়ে কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু আমার জ্যাঠামশায়ের মুখে কোনো দিন হাসি ছাড়া কিছু দেখিনি। এই পূজোয় তাঁর যে কত খরচ হ'ত আমি ভাবতেও পারি না। তখন তিনি দেশে যেতেন। বড় দালানে আমরা খেতে বসতাম। তিনি বসতেন দুই সারের মাথায়, মধ্যেখানে, যেখান থেকে দুই সারের প্রত্যেককে দেখা যায়। অত বড় দালানের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত লম্বা সার। আমাদের ছেলেদের প্রত্যেকের গায়ে এক রঙের জামা, এক পাড়ের কাপড়। মেয়েরা যাঁরা পরিবেশন করতেন তাঁদেরও তাই। জ্যাঠামশাই চেয়ে চেয়ে দেখতেন, আর আনন্দে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। তাঁর সেমুখ আমি এখনও কল্পনা করতে পারি।

দীনবন্ধু চোখ বন্ধ করিয়া বোধ করি তাহাই কল্পনা করিতে লাগিল।

বলরাম একটু থামিয়া বলিল, কিন্তু তাঁর পক্ষে যা আনন্দ ছিল আপনার পক্ষে তা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—দাঁড়িয়েছেই তো। গেল বারে হ'ল কি জানেন?—দীনবন্ধু একটা ঢোঁক গিলিল,—হিসেব ক'রে দেখলাম, ছেলের একখানা ক'রে ন্যাকড়া কিনে দিতে গেলেও দুশো টাকা লাগে। আমি একশো টাকা ইন্সিওরে পাঠিয়ে দিয়ে এইখানেই ব'সে রইলাম। যা খুশি কর তোমরা।

বলিয়া এমন এক আশ্চর্য্য ভঙ্গিতে হাসিল যে, বলরামের বুকের ভিতর পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠিল।

হাসি থামাইয়া দীনবন্ধু বলিল, আপনি বলবেন কাপুরুষতা। কিন্তু বাড়ীর সবাই কাপড় পেল না এ কি চোখে দেখা যায়?

বলরাম কিছুই বলিল না। দীনবন্ধু চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার চোখে ঘুম নামিল না। থাকিয়া থাকিয়া তাহার সেই আশ্চর্য্য হাসি মনে পড়ে আর পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ বিস্বাদ হইয়া যায়।

কাপড়-চোপড় কিনিতে এ মেসে হরিহরের জোড়া নাই। কোন্‌ মিলের কত নম্বরের কাপড় কোথায় এক পয়সা সস্তায় পাওয়া যায়, তাহা পর্য্যন্ত সে বলিয়া দিতে পারে। দোকানে গিয়া যখন সে কাপড়ের ফরমাস করে, দোকানদার বুঝিতে পারে ইহার কাছে চালাকি চলিবে না। তাহাকে না লইয়া এ মেসের কেহ কাপড় কিনিতে যায় না।

বলরামের ইচ্ছা ছিল, কাপড় কেনার হাঙ্গামটা সকাল বেলাতেই চুকাইয়া লইবে। কিন্তু কি একটা কারণে সকালে হরিহরের সময় হইল না। স্থির হইল, খাওয়া-দাওয়ার পরে দুপুরে দুজনে বাহির হইবে। ক'খানাই বা কাপড়! ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হইয়া যাইবে।

স্নান করিবার সময় হরিহর উঁকি দিয়া দেখিল, বলরাম কি একখানা পত্র মনোযোগের সঙ্গে দেখিতেছে।

হরিহর বলিল, স্নান করতে যাবেন না?

বলরাম প্রথমটা ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল। তারপর যেন চমক ভাঙ্গিয়া বলিল, হাঁ চলুন।

হরিহর দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, কিছু দুঃসংবাদ আছে নাকি?

বলরাম হাসিয়া বলিল, দুঃসংবাদ? সে তো থাকবেই।

—অসুখ-বিসুখ?

—না। পূজোর ফর্দ্দের ক্রোড়পত্র।

মুখে একটা ফুৎকার দিয়া হরিহর বলিল, ও! ও অনেক আসবে মশাই। চাপা দিয়ে রাখুন।

—চাপা দিয়ে রাখব কি মশাই! ছোট বোনের ফর্দ্দ! বছর দুই হ'ল বিয়ে হয়েছে।

—কি লিখছে?

—লিখছে, এবারে যেন পূজার তত্ত্ব গেলবারের চেয়ে ভালো হয়। ধুতিটা আরও দামী হওয়া উচিত। গেল বারে মটকার পাঞ্জাবী দেওয়া হয়নি। সেটা যেন এবারে দেওয়া হয়। সে শুনেছে, তার বৌদির জন্যে জর্জ্জেট কেনা হচ্ছে। সেজন্যে নিজের দাবী আর চড়ায়নি। শুধু লিখেছে যে, তার বৌদির জন্যে যে রকম শাড়ী কেনা হবে, তাকেও তাই দিলেই হবে।

—তাহ'লেই তো গেছেন!

—হাঁ। মুস্কিল হয়েছে কি জানেন। এই বোনটি সব চেয়ে ছোট, কাজেই মায়ের আদরের। তার উপর

এর বিয়েতে পাত্র পক্ষ নগদ একটি পয়সাও নেয়নি। তাদের অবস্থাও ভালো। গেল বারের তত্ত্বে যে খুব বেশী খরচ করতে পারিনি তাও সত্যি। জানেনই তো ছোট খোকার আমাশয়ে কি ভোগালে। তাই ভাবছি…

—কই দেখি আপনার ফর্দ্দ ?

বলরাম পকেট থেকে ফর্দ্দটা বাহির করিয়া দিল।

হরিহর ফর্দ্দ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল: করেছেন কি মশাই! এ তো পোষাকী। এর পরে আটপৌরেও আছে নিশ্চয়!

—আছে বই কি।

—আর বোন নেই ?

বলরাম হাসিল। বলিল, একটি দিদি আছেন। তাঁর আবার দুঃখ শুনুন। জামাইবাবু ভালো চাকরী করতেন, রিট্রেঞ্চমেণ্টে সেটি গেছে। এখন গ্রামের ইস্কুলে মাস্টারী করেন। যখন চাকরী ছিল, আমাদের জন্যে যথেষ্ট করেছেন এবং যথেষ্ট দিয়েছেন। অত্যন্ত স্বল্পভাষী মানুষ। এবং অত বড় আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আর কখনও দেখিনি। আজকে তাঁর দুঃখের শেষ নেই। কিন্তু কোনো দিন একটি ছুঁচের ফরমাসও করেননি। না তিনি, না দিদি।

—গেল বারে তাঁদের কিছু দেননি ?

কুণ্ঠিতভাবে বলরাম বলিল, সে না দেওয়ারই মধ্যে। শুধু দিদির জন্যে একখানা আটপৌরে শাড়ী পাঠিয়েছিলাম। তাতেই কত আশীর্ব্বাদ যে করেছিলেন, তার ইয়ত্তা নেই।

হরিহর চিন্তিতভাবে বলিল, হুঁ।

—কোত্থেকে দোব ? এই ক'টি টাকা তো মাইনে। দিতে কি আর ইচ্ছে হয় না ?

হরিহর আবার বলিল, হুঁ।

—কি ভাবছেন ?

—ভাবছি, বাজার করা আজ থাক বলরাবাবু। খেয়ে-দেয়ে এসে দু'জনে মিলে একটা ফর্দ্দ করা যাবে। তারপরে ধীরে সুস্থে কিনলেই হবে। কি বলেন ?

বলরাম শশব্যস্তে বলিল, না না, টাকা রাখা চলবে না। কিনতে এখন থেকেই হবে। নইলে হাতে টাকা থাকবে না। সে আর একটা বিপদ হবে।

হরিহর হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, খেয়ে-দেয়ে আসি তো। তারপরে দেখা যাবে।

হরিহর যে ফর্দ্দ করিয়া দিল তাহা দেখিয়া বলরামের বাজার করিবার আনন্দ আর রহিল না। ফর্দ্দের মধ্যে সিল্কের একটা টুকরা পর্য্যন্ত নাই। সমস্ত মিলের ধুতি ও শাড়ী, ধোলাই করিলে তাহা নাকি রূপার পাতের মতো ঝক ঝক করিবে। ছেলেমেয়েদের জামাও সমস্ত আটপৌরে। ওদের গায়ে নাকি আবার সিল্ক দেয়! দুই দিনে ধূলায়-বালিতে আর জলে ন্যাকড়া বানাইয়া তুলিবে। তার চেয়ে মোটা পুরু কাপড়ের জামা দিলে ঠাসিয়া মারিয়া পরিলেও রাজার হালে একটা বৎসর চলিয়া যাইবে। ষাট টাকার মধ্যে সমস্ত পরিবারের মায় দিদি-জামাইবাবু এবং তাঁহাদের ছেলেমেয়েগুলির পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া হরিহর দিগ্বিজয়ীর মতো সোজা হইয়া বসিল।

বলিল, ষাট টাকা মাহিনার কেরানীর এর চেয়ে বেশী বাজার করা উচিত নয়। করা ক্রিমিনাল, বুঝলেন ?

বলরাম বুঝিল, কিন্তু তাহার মনটা প্রসন্ন হইল না। হরিহর ছা-পোষা গৃহস্থ; পাকা লোক। তাঁহার যুক্তি দুর্ভেদ্য। বলরামের পক্ষে পূজার বাজারে ষাট টাকার বেশী খরচ করা অন্যায়, হয়তো ক্রিমিনালই। কিন্তু সংসারে হিসাব করিয়া চলাটাই কি একমাত্র সত্য পদার্থ ? বেহিসাবী চলার আনন্দও কি একেবারে উপেক্ষার বস্তু ?

দুই বৎসর ধরিয়া বলরাম তাহার স্ত্রীকে রীতিমত ভোগা দিয়া আসিতেছে, একখানা জর্জ্জেট দিবে। কিন্তু বলরাম মনে মনে জানে, তাহা ভোগা নয়, তাহার মধ্যে চাতুরীর বিন্দুমাত্রও ছিল না। দিতে পারিলে তাহার নিজের চেয়ে বেশী কৃতার্থ আর কেহই বোধ করিত না। এই অক্ষমতার গ্লানি আর একজনের না-পাওয়ার দুঃখের চেয়ে যে কত বেশী, তাহাও একমাত্র তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন।

বলরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

হরিহর চমকিয়া বলিল, কি হ'ল ?

—কিছুই না। ভাবছি, মানুষ কত অসহায়! যত বড় তার সাধ, সাধ্য এবং আয়ু তার তুলনায় কতটুকু ?

বলরাম হরিহরের তৈরী ফর্দ্দটার উপর চোখ বুলাইতে লাগিল। নিখুঁৎ ফর্দ্দ। অভিজ্ঞ হরিহর কোথাও ত্রুটী রাখে নাই। মূল্য যাহা ফেলিয়াছে, বলরাম জানে তাহারও একচুল এদিক-ওদিক হইবে না। কিন্তু গায়ের গরদের শাড়ী ? ছোটখোকার ভেলভেটের সুট ? গৃহিণীর জর্জ্জেট ? হরিহর ফর্দ্দের মধ্যে এমন অনেক নূতন জিনিস ফেলিয়াছে, যেমন লাল-নীল দেশলাই, তারাকাঠি; তাহা বলরামের মাথায় আসিতই না। কিন্তু ছোট বোনটি যে মুখ ফুটিয়া আবদার করিয়াছে, তাহার ব্যবস্থা কোথায় ?

হরিহর পাটোয়ারী মানুষ। এত কথা বুঝিল না। কেবল ইহাই বুঝিল যে, এত কষ্ট এবং এত হিসাব করিয়া যে ফর্দ্দ সে তৈরী করিল তাহাতে বলরাম প্রসন্ন হয় নাই। সে বলরামকে তাহার ভাগ্যের উপর ফেলিয়া দিয়া বিরক্ত-ভাবেই চলিয়া আসিল। যে মানুষ নিজের ভালো বুঝিবে না, তাহাকে সে কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। সে বিড়ম্বনা সহ্য করিবার পাত্র হরিহর নয়।

দিন যেন পাখায় ভর দিয়া উড়িতে উড়িতে মহালয়ায় আসিয়া পৌছিল। হরিহর বলরামকে সাহায্য করে নাই। সেও চাহে নাই। নিজের চেষ্টাতেই সে একটি দু'টি করিয়া অনেকগুলি প্যাকেট জড় করিয়াছে। কাপড় সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই তাহার নাই। কিন্তু জ্ঞান সে সঞ্চয় করিল কিছু শো-কেসের সাজান কাপড়-জামা দেখিয়া, কিছু সঞ্চরণশীল নর-নারী দেখিয়া।

সে মাসাধিক কাল হইতেই জলখাবার খাওয়া বন্ধ করিয়াছে। সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি ধরিয়াছে। ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া জুতাজোড়ার আর কিছু নাই। কেহ সেদিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বলে, পূজায় জুতার দাম যা চড়িয়াছে, পূজা কাটিয়া না গেলে উহার আর অবসর মিলিবে না। সময়াভাবে দাড়ি পর্য্যন্ত নিয়মিত কামাইতে পারে না।

গত দুই বৎসর তাহাদের আপিস বোনাস দেয় নাই। এবারে শোনা যাইতেছে, এক মাসের মাহিনা বোনাস দিবে। সংবাদটা শোনামাত্র বলরাম দুই হাত তুলিয়া বড় সাহেবকে এবং সেই সঙ্গে ভগবানকেও অজস্র আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। যেটুকু দুশ্চিন্তা ছিল এ সংবাদের পর তাহাও আর অবশিষ্ট রহিল না। দুই বেলা সে জনস্রোতের ঢেউএ-ঢেউএ ঘুরিয়া বেড়ায় আর টুকিটাকি যাহা পারে কেনে। ছোট-ছোট প্যাকেটে এবং বড়-বড় বাণ্ডিলে তাহার জীর্ণ মলিন কক্ষের একটি কোণ বোঝাই হইয়া উঠিল।

চতুর্থীর দিন মেসের প্রাপ্যের তাগাদা আসিল। বলরামের মন তখন সোনালি আলোয়, শানাইএর মিঠা সুরে পালকের মতো উড়িতেছিল। যেন একটা ধাক্কা খাইয়া মাটিতে নামিল। যে কয়টা টাকা তাহার কাছে অবশিষ্ট আছে, তাহাতে তাহার যাতায়াতের ট্রেন ভাড়া আর পূজার কয়দিনের বাড়ীর খরচ কোনো রকমে চলিতে পারে।

বলরাম ম্যানেজারকে বহু অনুরোধ করিল, টাকাটা সে পূজার পরে দিবে। কিন্তু ম্যানেজার কোনো অনুরোধই শুনিল না। ঠাকুর-চাকরকে মাহিনা দিতে হইবে, একখানা করিয়া কাপড়ও দিতে হইবে। যাহারা ছুটি পাইবে না, মেসেই থাকিবে, তাহাদের জন্যও ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে। অন্য সময়ে তাহাকে অনুরোধ করিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এখন অনুরোধ শুনিবার উপায় নাই।

বলরাম রাগ করিয়াই তাহাকে টাকাটা দিয়া দিল। দুই-একটা প্রসাধনের দ্রব্য তখনও তাহার কিনিবার ছিল। সে চুলায় যাক, কয়েক বাক্স লাল-নীল কাঠির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহা আর হইবার নয়। বলরাম হিসাব করিয়া দেখিল ট্রেন ভাড়া বাদ দিয়া তাহার হাতে আর একটি টাকা মাত্র রহিল। তাহাতে পূজার কয়দিনের সংসার-খরচের কি হইবে, তাহাই এক চিন্তার বিষয়।

বলরাম যখন বাড়ী পৌছিল তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে।

এক মাসের উর্দ্ধকাল সে বাড়ী আসে নাই। কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথ হইতে পল্লীর এই সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথে পা দিয়া তাহার মনে হইল, নীচু-নীচু খড়ের ঘরগুলি বুঝি এখনই তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িবে। স্যাকরার দোকানে তখনও ঠুকঠুক করিয়া কাজ চলিতেছিল। গুড়ের ভিয়ানের গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। বাঁশবনে জোনাকীর মেলা বসিয়াছে। চৌধুরীদের পূজার দালানের সামনে একদল ছেলে হৈ হৈ করিয়া খেলা করিতেছিল। ভিতরে মালাকার নিবিষ্ট মনে ঠাকুর সাজাইতেছিল। গোটা চার-পাঁচ কুলীর মাথায় মোট চাপাইয়া বলরাম নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কলরব উঠিল। বাবা আসিলেন, মা আসিলেন, ছেলেরা আসিল, পাড়া-প্রতিবেশী একটি-দুইটি করিয়া জুটিতে লাগিল, নিতান্ত নিস্পৃহভাবে গৃহিণীও একবার মোট-ঘাটের স্তূপের পাশ দিয়া চলিবার সময় গুণ্ঠনের ফাঁক দিয়া অপাঙ্গে সেদিকে চাহিয়া গেল। কেবল বলরামের মুখে হাসি নাই।

—আহা! ট্রেনে বড় কষ্ট হয়েছে। যা পূজোর ভিড়!

বলরাম কথা কহিল না, শুধু কপালের ঘাম মুছিল।

—কত কাপড় এনেছিস? অত আনতে হ'ত না।

বলরাম বুঝিল, মা ভিতরে ভিতরে গৌরবে ও আনন্দে কতখানি পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। গৃহিণীর চোখে এক সময়ে চোখ পড়িতেই দেখিল, কাপড়ের আনন্দে তাহারও চোখ ঝকমক করিতেছে।

—কই গো, ছেলে কি কাপড় আনলে দেখাও।

বলরামের বুক পকেটে মনিব্যাগের মধ্যে বেতন ও বোনাসের ধ্বংসের শেষ একটিমাত্র রজত মুদ্রা থাকিয়া থাকিয়া কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করিতেছে। পূজার কয়দিন কি করিয়া চলিবে সেই দুশ্চিন্তা কালো ধোঁয়ার মতো মাথার মধ্যে তাল পাকাইতেছে।

তবু তাহাকে উঠিতে হইল। সকলের সসম্ভ্রম ও সপ্রশংস দৃষ্টির সম্মুখে এক একটী করিয়া পোঁটলা খুলিয়া দেখাইতে হইল, মায়ের টকটকে লাল পাড় গরদের শাড়ী, গৃহিণী ও ছোট বোনের জর্জ্জেট, ছোট খোকার ভেলভেটের সুট, দিদির চমৎকার দেশী শাড়ী, তাহার ছেলেমেয়েদের বিবিধ বর্ণের জামা-কাপড়, শান্তিপুরের ধুতি, আরও কত কি ··

বলরাম উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, সমস্ত মুখ লেপিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

রূপায়ৎ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাঠক পাঠিকে মনে যেন শুধু রয়
ওমর খৈয়ম তর্জ্জমা এটা নয়।
টঙ্কা সাগর-কাঁকড়ার মত
কামড়াতে মোরে আসে
মোরে ভয় করে, আমি ভীত তার ত্রাসে।
বাঁকা বাঁকা তার দাড়া ভীতিময়
বসুধার বসু আঁকড়িয়া রয়,
দূর হতে আমি সম্ভ্রমে নমি
যারা তারে ভালবাসে।

২

কীর্ত্তি তাহার বিশ্ব জুড়িয়া
অসীম্ শক্তিশালী,
মেকীতে খাঁটির গুরুত্ব দেয় ঢালি।
তাহার রূপালী তার গিল্‌টিতে,
চিনি মোড়া তার বিষ পিন্‌টীতে,
ফাঁপা মস্তকে জড়োয়ার তাজ
মিথ্যার ফুলডালি।

৩

রস-রসিকের ভাবের সায়রে
ভবের বাঁধানো ঘাটে,
এই কাঁকড়াই সুতা ও বড়শী কাটে।
ছিপ্ ত ইহার পায় না নাগাল,
করে না ক কিছু করে উল্‌চাল,
শুধু তোড়জোড়ে দিবস ফুরায়
রবি ঘুরে বসে পাটে।

৪

নেত্র জুড়ানো এই যে উগ্র
কাঁকড়ার কাট্‌লেট,
পাতালপুরীর নরাধিপ চায় ভেট।
ভক্তি এবং দিলে অনুরাগে,
শ্যামার পূজায় লাগিলেও লাগে,
নিরামিষাশীর পাতায় পড়িলে
করে তার মাথা হেঁট।

সর্পের শ্রবণশক্তি

ডাক্তার বারজেস্ বার্‌নেট্

Victoria Memorial Park
September 3rd., 1938.

Dear Dr. Kundu,

I have extended my letter about the hearing power of snakes into what I hope will oneday be part of a chapter on snakes in a Loo Book I have had on hand for some time.....here it is.

I doubt whether, with the war news, any editor will want to publish it at the present time, but please make any use of it you like. I must call it "first serial rights," however, so that I can use it myself later.

* * * * *

Yours sincerely,
Sd/ Burgess Barnett.

সাপেরা শুনতে পায় কি-না, এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে 'হাঁ' বা 'না' বলা যায় না। যে সব স্পন্দনকে আমরা শব্দ নামে অভিহিত করি, তার কতকগুলি সাপেরা গ্রহণ করতে পারে কয়েকটি বিশেষ অবস্থায়। ঐ শব্দগ্রহণ যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় এ মনে করা অসঙ্গত নয়।

আমি দেখেছি সাপেরা বায়ুবাহিত শব্দ (air-borne sound) অথবা দু'শো পঞ্চাশের অধিক স্পন্দনবেগসম্পন্ন পরিবাহিত শব্দ (conducted sound) শুনতে পায় না। আমি দুটি ক্ষুদ্র নির্ব্বিষ সাপকে একটি পিয়ানোর মাথার উপর রেখে পিয়ানো বাজাতে সুরু করলাম। যখন উঁচু পর্দ্দায় আঙুল চলতে লাগল তখন সাপেরা বাজনা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হ'ল না, কিন্তু যেই আমি সি পর্দ্দার নীচে বাজাতে সুরু করলাম অমনি সাপ দুটির মধ্যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম। সাপ দুটি নড়াচড়া না ক'রে এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল, আর মাথা উঁচু ক'রে চারিদিকে যেন অনুসন্ধিৎসুভাবে তাকাতে লাগল ও জিভটা ঘন ঘন বার করতে লাগল। আমার মনে হয়—যদিও এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই—খাদের পর্দ্দায় উচ্চতর শব্দে সাপেরা অস্বস্তি বোধ করে এবং মৃদু গম্ভীর শব্দে আনন্দিত হয়। শেষে আমি পিয়ানোর দু-তিনটে চাবি একসঙ্গে টিপলাম এবং একটি সাপ আস্তে আস্তে এগিয়ে পিয়ানোর ভিতরকার তারের মধ্যে ঢুকে পড়ল—যেন সে ঐ শব্দের কারণ অনুসন্ধান করতে উৎসুক! সেই সাপটিকে তারের ভিতর থেকে ছাড়িয়ে আনতে মিনিট কয়েক লাগল।

সাপ দুটিকে যখন কার্পেট-ঢাকা মেঝের উপর সরিয়ে রাখা হ'ল তখন আমার মনে হ'ল যে, পিয়ানোর শব্দ তারা আর মোটেই শুনতে পাচ্ছে না। দরজাটা জোরে বন্ধ করলে বা মেঝেতে জোরে পায়ের শব্দ হ'লে তারা চম্‌কে ওঠে বটে, কিন্তু পিয়ানোর বাজনার দিকে তাদের আর খেয়াল নেই। বেহালার সাহায্যে অনুরূপ কয়েকটি পরীক্ষার পর আমি বুঝতে পারলাম, আমার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত নয়। মৃদুস্পন্দনবিশিষ্ট শব্দই সাপেরা শুনতে পায় এবং সেটা সম্ভব হয় যখন শব্দ ও সাপের মধ্যে একটি সুবিস্তৃত পরিবহন-ক্ষেত্র থাকে।

একবার এক বহু-বিজ্ঞাপিত বেতার সেটের প্রচার-বিভাগের কর্ত্তা লণ্ডনের চিড়িয়াখানার সাপের ঘরে একটি চমকপ্রদ কৌতুক (stunt) দেখাবার অনুমতি চাইলেন। ঘরের সিমেণ্ট-করা মেঝের উপর একটি সুদৃশ্য বড় রেডিও গ্রামোফোন বসানো হ'ল, সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানরা আমন্ত্রিত হ'লেন এবং যখন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল তখন কয়েকটি কোব্‌রা এবং ছোট ছোট পাইথনকে সেটের কাছে রেখে এলাম। বেতার সেটওয়ালাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের যন্ত্রের উৎকর্ষ দেখানো—বাজনা শুনিয়ে সাপদের মুগ্ধ ক'রে। প্রথম বাজানো হ'ল একটি কন্‌সার্ট—তারপর একজন ভারতীয় সাপুড়ের বাঁশীর রেকর্ড বাজতে সুরু করল। কোব্‌রা বা পাইথন বাঁশীর সুরে মোটেই আকৃষ্ট হ'ল না। মনে হ'ল যেন বাঁশীর শব্দ তাদের কানে আদৌ পৌঁছচ্ছে না—খানিক পরে যখন একটি সাপকে উত্ত্যক্ত ক'রে ফণা ধরতে বাধ্য করা হ'ল তখনই কোনরকমে একখানি ফটো তোলা হ'ল সাধারণের সন্দেহ দূর করবার জন্য। পরে যখন ঐ সাপগুলিকে একটি একটি ক'রে বেতার সেটের উপর রাখা হল, তখন কিন্তু কয়েকটি বাজনার দিকে আকৃষ্ট হ'ল।

সাপ ধরবার সময় প্রায়ই আমি লক্ষ্য করেছি, খালি পায়ে গাইড্ সাপের যত নিকটে যেতে পারে, ভারী বুট পায়ে দিয়ে আমি তত নিকটে যেতে পারি না—অথচ সে বেশ চেঁচিয়ে আমায় ডাক দিতে পারে সাপকে সচকিত না ক'রে।

কিন্তু এটা কি ঠিক যে স্পন্দন (vibrations) সাপেরা শুনতে পায়, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কোন স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব ক'রে না ?

সম্পূর্ণ না হ'লেও প্রায় তাই বটে। সাপের স্পর্শানুভূতি ও যাতনাবোধ খুব কম এবং এ-কথা বলার কোন আবশ্যকতা নেই যে, শব্দতরঙ্গ (sound-waves) সে স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করে, যখন বেশ বোঝা যায় তার দেহের অভ্যন্তরে এমন শ্রবণযন্ত্র (auditory mechanism) আছে যার শক্তি নিতান্ত কম নয়। এটা সত্য যে, বাইরে তার কোন কান নেই—স্পন্দন তার দেহের ভিতর দিয়ে তার ভিতরকার কানে (inner ear) গিয়ে পৌঁছয় আর তার দেহটা হচ্ছে একটি স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন মাধ্যম (elastic medium) বিশেষ—যা উচ্চতর শব্দগ্রামকে মন্দীভূত করে।

সাপের পূর্ব্বপুরুষদের অবশ্য দেহের বহির্ভাগেই শ্রবণেন্দ্রিয় ছিল এবং তারা শুনতে পেত অন্যান্য প্রাণীর মতো। যখন ও যে কারণে তারা পা হারিয়েছিল ঠিক সেই সময় ও সেই কারণেই তারা কান হারায়। অবস্থার চাপে তাদের মাটির নীচে আশ্রয় নিতে হয়—তাতে পা তাদের অনাবশ্যক বোঝা হয়ে ওঠে আর কানের গহ্বর অনবরত বুজে যায় বালি ও মাটিতে। সাপের চোখের উপরে যে একটা স্বচ্ছ আবরণ আছে তাও তার চোখকে ধূলা মাটি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃতির দান।

এ সমস্ত অনুমান মাত্র নয়। পেরুর মরুময় প্রদেশে ঐরকম অসুবিধার ফলে গিরগিটির দেহেও অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিলাম। তার কানের গহ্বরের সামনে একটি ক্ষুদ্র দন্তবিশিষ্ট ঝালর (denticulated fringe) আছে এবং তার চোখের পাতায় ছোট ছোট স্বচ্ছ ছিদ্র আছে যাতে ক'রে চোখ বুজলেও সে ঐ ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে খানিকটা দেখতে পায়। শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য সে নরম বালির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং যতক্ষণ না শত্রু প্রস্থান করে ততক্ষণ সে লুকিয়ে থাকে বালির ভিতরেই। আত্মরক্ষার এই কৌশল অবলম্বন করার ফলে তার চোখ ও কান বালুকণায় নষ্ট হয়ে যেত যদি প্রকৃতি তাকে সাহায্য না করতো ঐ দুটি ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করতে। ওদের অন্তর্ধানের এই কৌশল জানবার আগে অনেক সময় আমি লক্ষ্য করেছি, ওরা হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু যখন এই কৌশল আমি টের পেলাম তখন গিরগিটির পায়ের ছাপ যেখানে মিলিয়ে গেছে সেইখানকার খানিকটা বালি তুলে ফেলে অনায়াসে ঐ ক্ষুদ্র যাদুকরকে ধরে ফেলেছি।

মাঝে মাঝে এমন কথাও অনেককে বলতে শুনেছি যে, সাপেরা শোনে জিভের সাহায্যে। কিন্তু এ-কথার তাৎপর্য্য তেমন বুঝি না। হয়তো একথার অর্থ এই যে, শব্দতরঙ্গ তাদের মস্তিষ্কে পৌঁছয় স্বাদগ্রাহী স্নায়ুর (nerves of taste) ভিতর দিয়ে—কান অথবা শ্রাবণী স্নায়ুর (auditory nerves) সাহায্যে নয়। অথবা তাঁরা হয়তো বলতে চান, সাপের জিভ সূক্ষ্মস্পর্শানুভূতিসম্পন্ন ষ্টেথোস্কোপের মতো। কিন্তু আমার মনে হয়, সাপের জিভ শব্দ-পরিবহনের (sound conduction) বিশেষ উপযোগী নয় এবং যে-বোধ কানের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু জিভের দ্বারাই পরিবাহিত তাকে 'শ্রবণ' আখ্যা দেওয়া চলে না।

তথাপি জিভ সাপের কী প্রয়োজনে আসে—এ এক-কটি সমস্যা এবং এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

প্রথমে সাপের খাঁচা থেকে তিন-চার গজ দূরে, আমি গোপনে ভ্যালেরিয়ান তৈলের একটি বোতলের ছিপি খুললাম এবং ফল কি হয় দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক মিনিটের মধ্যেই সাপটি সজাগ হয়ে উঠল এবং জিভ বার করতে সুরু করল। নতুন খাঁচায় সাপকে স্থানান্তরিত করলে সে অনবরত জিভ দিয়ে সব কিছু স্পর্শ করে তার নতুন পরিবেষ্টনীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে, কিন্তু এখন সে কিছুই স্পর্শ করলে না। নাসিকা তাকে যে খবর দিয়েছে সে হয়তো সেই খবরটা ভালো ক'রে জানতে চায় জিভের সাহায্যে।

এর পর আমি সাপের জিভ পাতলা কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত ক'রে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, ওর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্গ্যান্ আছে যা দেখতে স্বাদ-কোরকের (taste-buds) মতো। ঐগুলি আমি দেখালাম আমার

এক সহকর্ম্মীকে যিনি আমার চেয়ে দক্ষ হিস্টোলজিষ্ট (সূক্ষ্মশারীরদর্শী)।

সহকর্ম্মী বললেন, "হাঁ, ঐগুলি স্বাদ-কোরকই বটে।"

আমি তখন তাঁকে সঙ্গে ক'রে সাপের ঘরে এনে ভোজনরত একটি সাপকে দেখালাম। সাপটি খাচ্ছে বটে, কিন্তু জিভ সে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে একটি খাপের মধ্যে—খাবার সময় যাতে কোন অনিষ্ট না হয় জিভের। খাদ্যের সঙ্গে জিভের সংস্পর্শ ঘটছে না মোটেই এবং মনে হচ্ছে খাওয়ার তৃপ্তি পাওয়া দূরের কথা, সাপটি যেন একটা দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করছে।

স্বাদ-কোরক তবে সাপের কী প্রয়োজনে আসে—এই মনে ভাবি।

সাপের ঘরে আটটি সাপের বাচ্ছা ছিল। তারা নিয়মিত আহার করত স্বচ্ছন্দে। আমি তাদের নিয়ে এলাম আমার পরীক্ষাগারে। চারটির মুখ আস্তে আস্তে ফাঁক ক'রে কুইনিন অভ সালফেট ছিটিয়ে দিলাম, তারপর আমি আটটি সাপকেই তাদের সাপ্তাহিক খাদ্য—ব্যাঙ—পরিবেশন করলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রত্যেকটি সাপই আহার সমাপ্ত করলে। কুইনিনের তিক্ত আস্বাদ—যা চারটি সাপের উপলব্ধি করা উচিত ছিল—তাদের ক্ষুধা নষ্ট করতে পারেনি—এমন কি, তারা যে ঐ স্বাদটি পেয়েছিল তারও কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

এক সপ্তাহ পরে, আমি পুনরায় ঐ পরীক্ষাটি করলাম, কিন্তু এবার কুইনিন না দিয়ে কয়েক ফোঁটা দারুচিনির জল (cinnamon water) প্রয়োগ করলাম। এবার যে সাপগুলিকে দারুচিনির জল দেওয়া হয় নি (এদের দূরে পৃথক একটি খাঁচায় রাখা হয়েছিল) তারা পূর্ব্বের মতোই আহার করতে লাগল, কিন্তু যাদের মুখে দারুচিনির জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা আর ব্যাঙ খেলে না—সারাদিন উপবাসী থাকার পরও।

কুইনিন—যার তিক্ত আস্বাদ আছে, কিন্তু গন্ধ নেই—সাপের অনুভূতির বাইরে, কিন্তু দারুচিনি—যার আস্বাদ ও গন্ধ দুই-ই আছে—সাপের আহারের স্পৃহাকে নষ্ট করে।

আর একবার একটি পরীক্ষায় সাপের ঘ্রাণশক্তির পরিচয় পেয়েছিলাম। চিড়িয়াখানার বড় বড় সাপগুলি যাতে তাদের ঘরে সিমেণ্ট-করা মেঝের উপরেই বাচ্ছা পাড়তে পারে সেজন্যে আমি শুক্‌নো ব্র্যাকেন (এক জাতীয় ফার্ন) মেঝের উপর ছড়িয়ে দিতে বললাম। ব্র্যাকেন দেখতে খড়ের চেয়ে সুন্দর, কিন্তু এর একটা গন্ধ আছে, যদিও তা বিরক্তিকর নয়। এই নতুন গন্ধটি ঘরে ছড়িয়ে পড়ার পর কোনো সাপই ছয় সপ্তাহ আহার করলে না।

সাপের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে আমরা যা জেনেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই : মাটিতে অবস্থানকালে তাদের দৃষ্টির সীমা সঙ্কীর্ণ, কারণ সামান্য একগাছি তৃণও তাদের দৃষ্টি ব্যাহত করে এবং খোলস ছাড়ার আগে কয়েকটি দিন তারা মোটেই দেখতে পায় না। তাদের শ্রবণশক্তি পরিবাহিত শব্দের একটি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ—অবশ্য মানুষের কান যে স্তরের শব্দ শুনতে পায় তার চেয়ে নিম্নস্তরের শব্দ তারা শুনতে পায় না এটা যদি ধরে নেওয়া যায়। স্বাদ-গ্রহণের শক্তি তাদের আছে কি-না জানা যায় না, তবে থাকলেও ঐ শক্তির ব্যবহার তারা সম্ভবত করে না। তাদের স্পর্শবোধ এত কম যে, তাদের গায়ে ইঁদুর কামড়ালেও তারা বুঝতে পারে না। তাদের একমাত্র বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় যার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি এবং যার শক্তি কতকটা উপলব্ধি করতে পারি, সেটি হচ্ছে তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

এটা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, সাপেদের অন্য কোনো উপায় আছে যার সাহায্যে তারা বহির্জগতের পরিচয় পেতে পারে—কারণ এত কম শক্তিসামর্থ্য নিয়ে কোন জীবই বাঁচতে পারে না। যদি তাদের এমন কোন ইন্দ্রিয় থাকে যা আমাদের নেই, তবে তা কোন দিনই আমরা হয়তো বুঝতে পারব না—অন্ধ যেমন বুঝতে পারে না রঙের বৈচিত্র্য। তবু যখন আমরা সাপকে জিভ বার করতে দেখি তখন এটা বেশ বুঝতে পারি যে, সে নিশ্চয়ই আমাদের ভেঙচি কাটছে না জিভ বার ক'রে, অশিষ্ট ছেলেরা যেমন করে। এ চিন্তা স্বতই আমাদের মনে জাগে, ঐ জিভের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গোপন শক্তির রহস্য লুকানো আছে।

কখনো কখনো মনে প্রশ্ন জাগে, ওদের কি তাড়িত শক্তিসম্পন্ন কোন ইন্দ্রিয় (electrical sense) আছে ?

সেটা কি জিভের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দুটিকে কেন্দ্রস্থল (focus) রূপে ব্যবহার ক'রে অনুভূত বস্তুর দূরত্ব নির্ণয়ে সাপকে সাহায্য করে ?

কিন্তু এখানেই আমার নিরস্ত হওয়া উচিত। আশা করি, একদিন হয় তো আমার চেয়ে শক্তিশালী কোনো বৈজ্ঞানিক ঐ প্রশ্নের সমাধান করবেন।*

* অনুবাদক—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়ের সর্প প্রবন্ধের সর্পের শ্রবণশক্তি সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ হয়। প্রতিবাদের উত্তরে প্রবন্ধলেখক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক-দের লিখিত মত উল্লেখ করিয়া দেখান যে সর্প বুঝিতে পারে। বর্ম্মার হারকোর্ট বাট্‌লার ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডাক্তার কামাখ্যাপ্রসাদ কুণ্ডু বিলাতের বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ ডাক্তার বার্‌জেস্ বার্‌নেটকে সর্পবধির কি-না ঐ বিষয়ে তাঁহার মতামত জানাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। ডাক্তার কুণ্ডুরও ধারণা সর্পের বহির্ভাগে কোন শ্রবণযন্ত্র না থাকিলেও ইহাদের bony ear আছে। ডাক্তার বার্‌নেটের লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। সর্প সম্বন্ধে ডাক্তার বার্‌নেটের অভিজ্ঞতা বিশ্ববিখ্যাত।

—সম্পাদক

বৈরাগ্য

শ্রীকালিদাস রায়

দেশে দেশে যুগে যুগে করেছেন ঘোষণা প্রচার
বৈরাগ্যের মহাবাণী,—বলেছেন 'সংসার অসার',
যত ধর্ম্মগুরুগণ। সন্ন্যাসের মহিমা কীর্ত্তন,
করিয়াছে কত শাস্ত্র। কত জন সমগ্র জীবন
বৈরাগ্যসাধনে রত। সাহিত্যেরও শেষ অর্থখানি
মহাপ্রস্থানের পথে ক'রে যায় বৈরাগ্যের বাণী ;—
শুনিয়াছি বহুবার। জরা আর্ত্তি ব্যাধির চীৎকার,
মৃত্যুর হুঙ্কার-ধ্বনি—শোকার্ত্তের ক্ষুব্ধ হাহাকার
শুনিয়াছি। মর্ম্মে কই পাইনি ত বৈরাগ্যের সাড়া !
সংসার-সংগ্রামে ভীরু, শক্তিহীন পলাতক যারা
তারাই বৈরাগী হয়,—বার বার হইয়াছে মনে।

দেহে মনে শক্তি যত ক'মে আসে আজি ক্ষণে ক্ষণে
মনে হয়—মিথ্যা নয়, ভ্রান্ত নয় বৈরাগ্যের বাণী,
বৈরাগ্য সহজ ধর্ম্ম। আজি তারে মর্ম্মে মর্ম্মে জানি,
মানি তারে সত্য বলি'। বাহিরের কোন উদ্দীপনা,
প্রেরণা দেয়নি বলি' নহে তাহা অলীক কল্পনা।
যে উৎসে জনমে রাগ সে উৎসেই বিরাগও জনমে,
সর্ব্ব রস শান্তরসে পরিণত হয় ক্রমে ক্রমে
উষ্ণ বাষ্পে পরিণত গ্রীষ্মে যথা বাসন্ত স্বপন,
ইহাই জীবন-ধর্ম্ম। দাবানলে দগ্ধ যবে বন
বিহঙ্গ ত্যজিয়া নীড় উড়ে যায় দূর নীলাকাশে,
পাথারে ঘরের চাল নৌকা হ'য়ে দরিয়ায় ভাসে,
একান্ত স্বভাবধর্ম্মে। দিন শেষ হ'য়ে আসে যত
দেখি এ মনের রঙ হইয়াছে গেরুয়ার মত,
দেহে মনে মিল নাই। মন মোর মাগিছে বিদায়
দেহ বলে 'শিরে তুমি সাধ ক'রে নিয়েছ কি দায়
ভেবেছ তা ? সে দায়িত্ব ফেলে আজ কোথা
যাবে চ'লে ?'

মনে হয় এ সংসারে নিতান্তই খেলা পাতি ব'লে,
তবু তাহাতেই মাতি—মাঝে মাঝে পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
স্বপ্ন ব'লে মনে হয় জীবনের উৎসব-উল্লাস।
টানিয়া চলিতে হয় নিত্য কর্ম্মপদ্ধতির ধারা,
ভুল হয় পদে পদে, লুকাইয়া তপ্ত অশ্রুধারা
সকলি সাধিতে হয়, পদে পদে ঘটে অপরাধ,
তুচ্ছ নিয়ে মারামারি, কাড়াকাড়ি বাদ-বিসংবাদ
দ্বেষ, দম্ভ, স্তুতি, নিন্দা—এ সকলে আজি হাসি পায়,
সকলের কাছে মন কৃতাঞ্জলি যেন ক্ষমা চায়।

দেহ জীর্ণ হ'য়ে আসে তবু আজো সে ঘোর সংসারী,
গোপনে গোপনে মন গুটাইছে তার পাততাড়ি।
কড়িতে ভরিতে থলি দেহ মোর শ্রমে মুহ্যমান,
নিভৃতে পারের কড়ি মন মোর করিছে সন্ধান।

মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

অপ্রিয় হইলেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ইংরেজী-শিক্ষিতগণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়কে কোন দিনই শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করেন নাই। অবশ্য ইহা সত্য যে, কোন কোন বিশিষ্ট ইংরেজী-শিক্ষিতও পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার অকুণ্ঠ-অকৃপণ ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন কিন্তু তাহা সর্ব্বক্ষেত্রেই যেমন ব্যতিক্রম আছে—সেই ব্যতিক্রম মাত্র। এই কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, এখানে আমরা 'বামুনপণ্ডিত'-এর কথা বলিতেছি না, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত"এর কথাই বলিতেছি।

আমরা যে ইউরোপকে ডাকিয়া বলি—তোমরা যখন অসভ্য বর্ব্বর অবস্থায় বনে বনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতে, তখন আমরা এই হিন্দুজাতি সভ্যতার আলোকে দশ দিক উদ্ভাসিত করিয়াছিলাম ; প্রমাণ—আমাদের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও জ্যোতিষ ; প্রমাণ—আমাদের ষড়্‌দর্শন, ব্যাকরণ, আয়ুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র, কাব্য ও নাটক। কিন্তু আমাদের সভ্যতার প্রমাণ-নিদর্শনস্বরূপ এই সকল গ্রন্থের উল্লেখ করিবার সময় আমরা কি একবারও মনে করি, এই গ্রন্থসমুদয় কাহাদের চিন্তায় ও সাধনায় রচিত হইয়াছে ? শুধু রচনা নহে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অগণিত বৈদেশিক আক্রমণ এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের মাঝেও কাহারা উহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—কাহারা উহার চর্চ্চা রাখিয়াছিল বলিয়া আজ আমরা উহার অর্থ অনুধাবন করিতে সমর্থ হইতেছি—জগৎসভায় আপনাদিগকে সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিয়াছি !

আমেরিকার চিকাগো নগরীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-ধর্ম্ম মহাসভায় অনাহূত বিবেকানন্দ যেদিন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মেঘ-মন্দ্রিত কণ্ঠে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা বিঘোষণা করিলেন এবং যাহা শুনিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিনিধিগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল—"It is foolish to send missioneries in India." বিবেকানন্দের সেই বাণী যে ভারতে পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরই জ্ঞান-তপস্যাজাত বেদান্ত-দর্শনের মূল সূত্র মাত্র, একথা কি আমরা একবারও ভাবিয়া দেখিব না—এই ঐতিহাসিক সত্যকে একেবারে অস্বীকার করিব !

অন্য কিছুর জন্য না হউক—সহস্র সহস্র বৎসরের পরপদানত জাতি আমরা, যাঁহাদের সাধনার উত্তরাধিকার-সূত্রে আজ বিশ্বের বিবুধ-সমাজে আপনাদিগকে সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছি, অন্তত তাহার জন্যও প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার স্রষ্টা, ধারক ও বাহক এই "ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত"সম্প্রদায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ যদি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি তবে তাহা যে একটুও অহেতুকী হইবে না—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এখানে আজ আমরা যে মহাপুরুষের প্রসঙ্গ আলোচনা করিব, সেই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম বর্ত্তমানযুগে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার একজন শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক, প্রকৃত "ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত" ছিলেন।

১২৫৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ-ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শিবরাত্রির দিন জন্ম বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্রকে সম্যক জানিতে হইলে যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয়ের আবশ্যক ; কারণ মানব-জীবনে বংশের প্রভাব (influence of heredity) বিজ্ঞান-স্বীকৃত অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত।

ভট্টপল্লীর যে বশিষ্ঠ-বংশে শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশ অন্যূন চারিশত বর্ষ ধরিয়া তাঁহাদের আচারনিষ্ঠাপূত ব্রাহ্মণ্যে, অত্যুজ্জ্বল পাণ্ডিত্য গৌরবে, অসাধারণ ত্যাগ, নির্লোভতা ও তেজস্বিতায় সমগ্র বঙ্গের হিন্দু-সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া আছেন। এই বংশের সর্ব্বতোমুখী অসামান্যতায় আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া প্রায় অর্দ্ধবঙ্গের ব্রাহ্মণপরিবার (১)

(১) ভট্টপল্লীর পাশ্চাত্য-বৈদিকশ্রেণীর এই বশিষ্ঠ-ব্রাহ্মণবংশ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী।

ভূস্বামী ও রাজকুল ইঁহাদিগকে আপন দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া আসিতেছেন। অদ্যাবধি এই বংশে কুশাগ্রবুদ্ধি নৈয়ায়িক, ব্যাকরণবিদ্, আলঙ্কারিক, কবি ও শাব্দিক, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, তন্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণ, জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদ বহু মণীষী এবং কাব্য, নাটক ও ধর্ম্মসংগ্রহাদি গ্রন্থের প্রণেতা সংস্কৃতভাষাবুৎপন্ন কেশরী বহুকোবিদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচীনতম কেন্দ্র নবদ্বীপকেও একদা এই ভট্টপল্লীর পাণ্ডিত্য-গৌরবদীপ্তির নিকট নিষ্প্রভ হইতে হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ বিদুষী রমাবাঈ সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া একদিন এই ভট্টপল্লীতেই শাস্ত্রপ্রসঙ্গের সদুত্তর পাইয়াছিলেন। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ৺দয়ানন্দ সরস্বতী যখন দিগ্বিজয়ী হইয়া পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রবিচারে সর্ব্বত্র অপ্রতিভ করিতেছিলেন, তখন একদিন বর্দ্ধমান-মহারাজাহূত বিচার-সভায় এই বংশের অন্যতম উজ্জ্বলরত্ন ৺তারাচরণ তর্করত্নই (২) বিজয় পতাকা লইয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শুধু বর্দ্ধমানে নহে, চুঁচুড়ায় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে ঐ দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত আবার একবার সাকার নিরাকার বিষয় লইয়া বিচার হয়, সেখানেও এই তারাচরণই জয়ী হয়েন; দয়ানন্দ নিরাকার সমর্থন করিতে পারেন নাই। ভট্টপল্লী হইতে এই বংশের প্রায় পঁচাত্তর জন সংস্কৃতবুৎপন্নকেশরী উক্ত বিচার-সভায় তারাচরণের সহিত গমন করেন।

শিবচন্দ্রের পিতা রঘুমণি বিদ্যাভূষণ একজন আজন্মশুদ্ধ পূতচরিত্র সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। জ্ঞানে কখন কোনও অন্যায় করেন নাই ও মিথ্যা বলেন নাই বলিয়া ইঁহার এমনই সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল যে, তাঁহার চান্দ্রায়ণ করাইবার সময় সংকল্পবাক্যে "জ্ঞানকৃত পাপক্ষয়কাম" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্রের খুল্লতাত জয়রাম ন্যায়ভূষণ একজন দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ভট্টপল্লীতে ব্যাকরণের চতুষ্পাঠি বিরল হওয়ায় স্বজনগণের অনুরোধে এই তীক্ষ্ণধী নৈয়ায়িক ব্যাকরণের অধ্যাপনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রেও ইঁহার বিশিষ্ট বুৎপত্তি ছিল। ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মণীষিগণ এই ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট আসিয়াই ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়ন করিতেন। শিবচন্দ্রেরও প্রথম পাঠারম্ভ হয় তাঁহার খুল্লতাত জয়রাম ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠিতে। উত্তরকালে শিবচন্দ্র যে একজন ভারত বিখ্যাত নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন তাহার পূর্ব্বাভাষ তাঁহার ছাত্রজীবনের সূচনাতেই সুপরিব্যক্ত হয়।

বাল্যকাল হইতেই ইঁহার অত্যদ্ভুত মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি অধ্যাপকবর্গকে বিস্মিত ও আকৃষ্ট করে। অতুলনীয় দার্শনিক প্রতিভার সহিত ইঁহার আজন্মসিদ্ধ কবি-প্রতিভা ছিল। মাত্র ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে "পাণ্ডবচরিত" নামক ইনি এক অপূর্ব্ব সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। পরবর্ত্তীকালে এই "পাণ্ডবচরিত" নাটক মুদ্রিত হয় ও তাহা বিদ্বৎ-সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

মাত্র আট-নয় বৎসর বয়স হইতেই মুখে মুখে সুললিত সংস্কৃত শ্লোক রচনায় ইঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা সুধিজনের বিস্ময় সঞ্চার করে। কথিত আছে শিবচন্দ্রের বয়স যখন দশ-এগার বৎসর তখন তিনি রথযাত্রা উপলক্ষে পিতা সহিত সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবনে উপস্থিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে প্রণামান্তর শিবচন্দ্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারেন যে, ছেলেটি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র এবং বিশেষ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আদেশে বালক শিবচন্দ্র সেইখানে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই মুখে মুখে কতিপয় সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনান। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব্ব বিস্ময় অনুভব করেন ও শিবচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, ছেলেটিকে তিনি কি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে মনস্থ করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় শিবচন্দ্রকে ন্যায়শাস্ত্র পড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রের নীরন্ধ্র যুক্তির মধ্যে ছেলেটির কবি-প্রতিভা স্বাভাবিক বিকাশলাভে বঞ্চিত হইবে। যাহা হউক, উত্তরকালে যদিও শিবচন্দ্র তাঁহার সমগ্র জীবন ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তথাপি অবসর সময়ে তিনি যে

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পিতা।

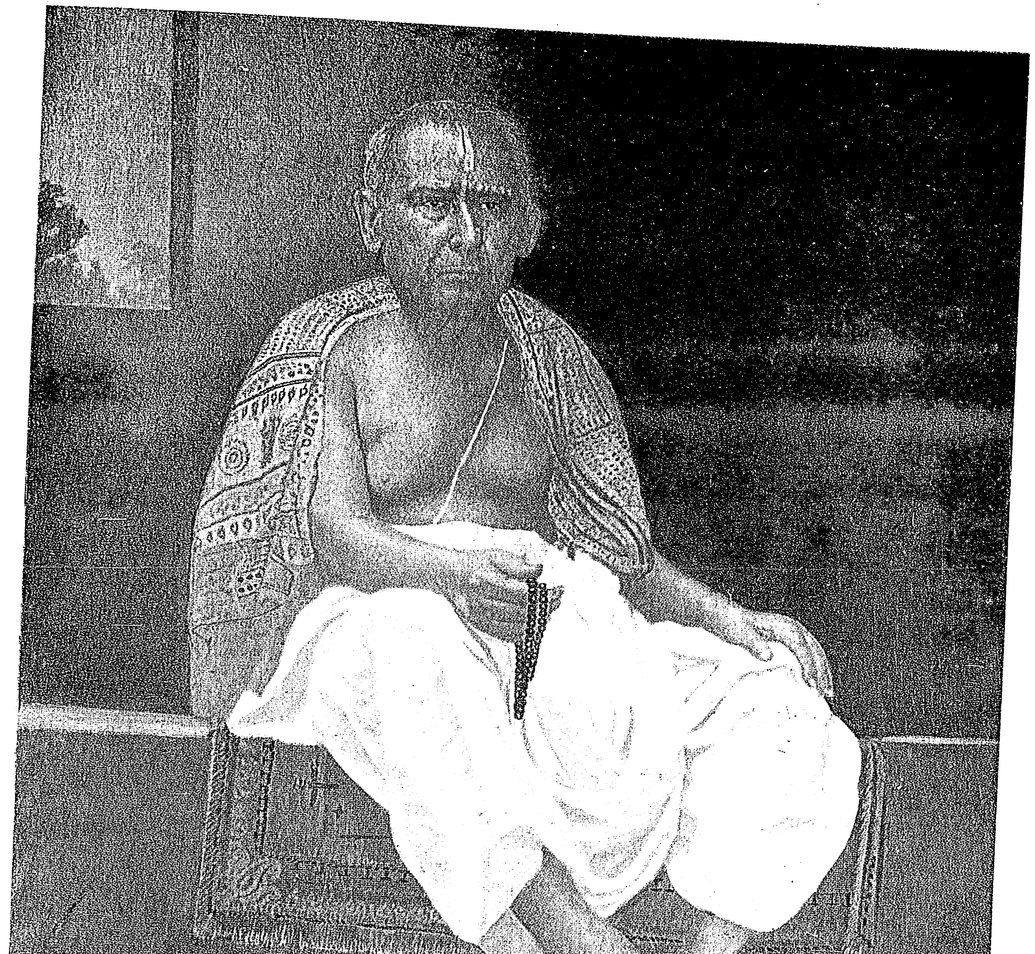

জন্ম—ফাল্গুন, ১২৫৪ সাল

মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম

মৃত্যু—২রা পৌষ, ১৩২৬ সাল

প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-জনিত অনবসর তাঁহার কাব্য-প্রণয়ন-পথের অন্তরায় হইলেও অন্তর্নিহিত তাঁহার কবি-প্রতিভাকে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই।

ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া শিবচন্দ্র তাঁহার পিতা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন এবং পরে এই বংশেরই উজ্জ্বলতম রত্ন ভারতজয়ী পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর আপন গৃহ-সংলগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী খুলিয়া শিবচন্দ্র অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া দেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় নানা দিগ্‌দেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠিতে সমবেত হইতে লাগিল। শিবচন্দ্রও বিপুল উদ্যমে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তিনি, ছাত্রগুলি ছাত্রের ভরণপোষণের চিন্তা তাঁহাকে একেবারে আকুল করিয়া তুলিল। এই সময় তাঁহার এমন অনেক দিন গিয়াছে যে গৃহে তণ্ডুলের কণামাত্র নাই, তখন নিরুপায় শিবচন্দ্র পণ্ডিত-বিদায়ের পিতল কাঁসার তৈজস বিক্রয় করিয়া ছাত্রগণের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে এমনও হইত যে, ছাত্রগণের আহারের পর কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না, তখন সস্ত্রীক শিবচন্দ্র ভাতের ফেন আহার করিয়াই দিন যাপন করিয়াছেন।

তাঁহার এইরূপ চরম দুরবস্থার দিনে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আসিয়া তাঁহাকে বলেন যে, মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের পদ খালি হইয়াছে—তিনি আবেদন করুন। শিবচন্দ্র চাকুরী গ্রহণে তাঁহার অসম্মতি জানান; কিন্তু ন্যায়রত্নের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধে তিনি দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিত কলেজের পত্রের নিম্নে আপন নাম স্বাক্ষর করেন। কয়েক দিন পরে আবেদন-পত্র যখন নামঞ্জুর হইয়া ফিরিয়া আসিল তখন শিবচন্দ্র অত্যন্ত উল্লসিত চিত্তে গ্রামের সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"বাক্‌ বাঁচিয়া গিয়াছি—আমাকে চাকুরী করিতে হইবে না।" চাকুরী গ্রহণ তাঁহার নিকট এতই ক্ষোভের কারণ ছিল।

অবশ্য কয়েক বৎসর পরে তাঁহার চরমতম দুর্দ্দিনে ঐ মূলাজোড় কলেজেরই কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ঐ অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন ও জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শিবচন্দ্র সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে তাঁহার মত ছাত্র-সম্পদ-সৌভাগ্য এই দেশের কোনও নৈয়ায়িক অধ্যাপকের ভাগ্যেই ঘটে নাই। এখনও বাঙ্গলা দেশে ন্যায়ের এমন চতুষ্পাঠী নাই বলিলেই চলে, যেখানে তাঁহার ছাত্র বা ছাত্রধারা ন্যায়ের অধ্যাপনায় ব্রতী নহেন। শুধু বঙ্গদেশেই নহে, সুদূর উড়িষ্যা, মিথিলা, বৃন্দাবন ও পাঞ্জাব হইতেও বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশ্বনাথ ঝা, উমেশ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যই যে তাঁহার ছাত্র-সম্পদ-সৌভাগ্যকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল তাহা নহে—অত কৃতী ছাত্রের অধ্যাপকতা-সৌভাগ্যও অপর কোন নৈয়ায়িকের জীবনে দেখা যায় নাই। তাঁহার কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে—পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ও বর্ত্তমানে এই বংশের সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় ৺গুরুচরণ তর্কদর্শন-তীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীবীরেশ্বর তর্কতীর্থ, ভট্টপল্লীর ৺রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ, শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমন্মথনাথ পঞ্চতীর্থ, কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য ও শ্রীতারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ, কাশী কুইন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীচন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ, নবদ্বীপ পাকাটোলের অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত তর্কতীর্থ, নোয়াখালীর রাজপণ্ডিত শ্রীনিশি-মোহন তর্কতীর্থ, দৌলতপুর কলেজের আচার্য্য শ্রীযামিনীকান্ত তর্কতীর্থ, রাজসাহী সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীরমেশ তর্কতীর্থ, ঝরিয়ার রাজপণ্ডিত শ্রীসূর্য্যনাথ তর্কতীর্থ, ত্রিপুরার শ্রীনবীন তর্কতীর্থ, কুমিল্লার শ্রীকৈলাসচন্দ্র তর্কতীর্থ, শ্রীহট্ট রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅখিল-চন্দ্র তর্কতীর্থ, শ্রীচারুকৃষ্ণ তর্কতীর্থ, কলিকাতার খ্যাতনামা কবিরাজগণ—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, শ্রীসতীশচন্দ্র তর্কতীর্থ ও শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থের নামোল্লেখই যথেষ্ট।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দিগ্বিজয়ী বহু পণ্ডিত শিবচন্দ্রের সহিত শাস্ত্রবিচার করিতে আসিতেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশকেই শিবচন্দ্রের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই বাঙ্গালী মণীষীর অতুলনীয় চরিত্র-মাধুর্য্য সর্ব্বপ্রদেশের পণ্ডিতগণের অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। শিবচন্দ্র "কুসুমাঞ্জলী"র এক নবীন টীকা রচনা করেন এবং তাহা এই বংশেরই অন্যতম উজ্জ্বলরত্ন ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রী সম্পাদিত "বিদ্যোদয়" নামক আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইনি বহু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাহা রক্ষার যত্ন থাকিলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক হইতে পারিত। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই পণ্ডিত কুলতিলককে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

বঙ্গগৌরব স্যার আশুতোষ, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শিবচন্দ্রকে দেবতুল্য সম্মান করিতেন।

এই অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতিও প্রবল অনুরাগ ছিল। আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ কাব্যরত্ন মহাশয় তাঁহার সমগ্র অবসর সময় শিবচন্দ্রের সহিত নানা শাস্ত্র-বিষয়ের আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি মাঝে মাঝে পিতৃদেবকে বলিতেন, "হরিচরণ, আজ বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি উপন্যাস তুমি পাঠ কর, আমি শুনি। আবার কখনও কখনও তিনি গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব গৌরব', 'বুদ্ধদেব-চরিত' প্রভৃতি নাটকও ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন।

পারিবারিক জীবনে শিবচন্দ্রকে বহু শোক সহ্য করিতে হইয়াছে। যখন তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইবে তখন তাঁহার চির-সুখ-দুঃখভাগিনী সাধ্বী পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন। সর্ব্বসমেত তাঁহার একুশটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি মাত্র দুই পুত্র ও একটি কন্যাকে জীবিত দেখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি শ্রীদুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-পণ্ডিত এবং দ্বিতীয়টি পণ্ডিত শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ বি-টি বর্ত্তমানে কলিকাতা হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন।

জীবনের অর্দ্ধেককাল চরমতম দারিদ্র্যের সহিত অবিরত সংগ্রাম এবং সমগ্র জীবন ধরিয়া অগণিত ও অসহনীয় বিয়োগ-ব্যথার মাঝেও শিবচন্দ্রকে কেহ কোন দিন ধৈর্য্যহীন অথবা কর্ত্তব্যচ্যুত হইতে দেখে নাই। মৃত্যুর কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে উন্মাদগ্রস্ত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যখন আত্মহত্যা করে, তখন সপ্ততিপর বৃদ্ধ এই শিবচন্দ্র যে অপূর্ব্ব ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তুলনাবিহীন। একদিন প্রত্যূষে উক্ত উন্মাদগ্রস্ত পুত্রটির কোনও সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহার কতিপয় ছাত্র ও আত্মীয় তাহার সন্ধান করিতে গিয়া নিকটবর্ত্তী রেল-লাইনের উপর তাহার বহু খণ্ডিত মৃতদেহ শোচনীয় অবস্থায় পতিত দেখিতে পায়। পুত্রের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত শিবচন্দ্র তখন উৎকণ্ঠার সহিত ছাত্র ও আত্মীয়গণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাহারা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু পিতার নিকট সন্তানের এই শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ তাহারা কেমন করিয়া জানায়! শিবচন্দ্র তাহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে সকলেই নীরব নতমস্তকে দণ্ডায়মান। তখন ন্যায়াধীশ এই মহাপ্রাজ্ঞ ছাত্র ও আত্মীয়গণের দিকে চাহিয়া ধীর অবিকম্পিত কণ্ঠস্বরে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি আবৃত্তি করেন—

"দ্রুমসানুমতাং কিমন্তরং
যদি বায়ৌ দ্বিতয়েঽপি তে চলাঃ।"

অর্থাৎ :—বৃক্ষ এবং পর্ব্বত উভয়েই যদি বায়ুপ্রবাহে আন্দোলিত হয়—তবে উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য রহিল!

ইহার পর উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন—"আমার ধৈর্য্য সম্বন্ধে তোমরা কেন আস্থাহীন হইতেছ? পর্ব্বত সদৃশই আমার সহনশীলতা। আঘাত যত গুরুই হউক না কেন, সাধারণ জনের মত আমি যদি তাহাতে বিচলিত হই, তবে এই যে আজীবন আমি শাস্ত্রচর্চ্চা করিলাম তাহার কি মূল্য রহিল? আমার নিমিত্ত তোমাদের কোনও চিন্তার কারণ নাই—যাও, তোমরা তাহার যথাবিহিত সৎকারের ব্যবস্থা কর।" অপূর্ব্ব বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় স্তব্ধ হইয়া সকলে এই লোকোত্তর-চরিত মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিল।

এক দিকে অতুল্য পাণ্ডিত্য যেমন ইঁহাকে বিবুধ-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি উদার ও মধুর প্রকৃতি গুণে ইনি আপামরসাধারণের হৃদয়ে পরমাত্মীয়ের

আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরের দুঃখকষ্টে ইনি একেবারে গলিয়া পড়িতেন। কত ঋণগ্রস্তের বাস্তুভিটা যে ইনি রক্ষা করিয়াছেন, কত কন্যাদায়, মাতৃদায় ও পিতৃদায়গ্রস্তকে যে ইনি দায়-মুক্ত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিজে ধনী ছিলেন না বটে, কিন্তু ধনি- ভূস্বামী ও রাজন্যবর্গ ইহাঁকে দেবতুল্য সম্মান করিতেন এবং ইঁহার অনুরোধ তাঁহাদিগের নিকট দেব-নির্দ্দেশের মতই ছিল। তাই যখনই শিবচন্দ্র দুর্গতদের সাহায্য করিবার অনুরোধ জানাইয়া তাঁহাদিগকে পত্র দিয়াছেন, তখনই তাঁহারা বিনা দ্বিধায় তাহা দেবাদেশের মতই সম্মান করিয়াছেন।

শিবচন্দ্র আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রতিদিন স্নান-আহ্নিক ও গৃহ-দেবতার পূজা সমাপনান্তে তিনি অধ্যাপনায় বসিতেন। সাংসারিক-জীবনে সামান্য আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুর্গোৎসব আরম্ভ করেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন প্রতি বৎসরই সমারোহের সহিত তিনি দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন। স্বজন প্রতিপালন ও অতিথিকে নিত্য অন্নদান তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। কোন দিন কোনও অতিথি তাঁহার গৃহ হইতে অভুক্ত ফিরিয়াছে, এরূপ শুনা যায় না।

১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২রা পৌষ এই নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ লোকান্তরিত হন। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে ন্যায়-প্রচারের যে অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে—তাহা অপূরণীয়।

চিরসুন্দর

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি এচ্-ডি

মনের পটে হৃদয়ের তটে
ফেলেছ ফেলেছ তোমার ছায়া,
প্রভাত কাননে বিহগ কূজনে
শ্রবণে ঢেলেছ সুরের মায়া।
সে মায়া উষার গগনে গগনে
জ্বেলেছে রূপের রঙিন শিখা,
কিশলয় দলে মালতীর ফুলে
রেখে যায় তার সবুজ লিখা;
ধানের শীষের সোনার বসনে
লীলায় দোলায় আঁচলখানি
মৃদু পবন ছন্দ চরণে
দূরের গন্ধ আনিছে টানি।
যে দিকে আমার নয়ন ফিরাই
সাগরে ভূধরে কানন মাঝে,
আমারে হেরিতে তোমারে নেহারি
মরি যে আপনি গভীর লাজে।
ভরিয়া রেখেছ হৃদয় আমার
মধুর তোমার মোহন রূপে,
তোমার পরশে হরষ ঢেলেছ
জেলেছ গন্ধ পুণ্য ধূপে।
মোর অজানায় হৃদয় রেখায়
যে রূপ এঁকেছে তোমার তুলি,
দিন যামিনীর পাত্র ভরিয়া
যে সুধা ঢেলেছ, কেমনে ভুলি।
তব আননের ছন্দ রচেছে
নিয়ত যে মধু মঞ্জু শ্লোক,
তাই ত গড়েছে হৃদি কন্দরে
সুন্দরে ভরা অরূপ লোক।
তাইত সে ছবি বাহিরে আসিয়া
ঝলকি তোমার আননে হাসে,
সুন্দর বলি যা হেরি বাহিরে
সে আছে ভিতরে তোমার পাশে।
আমার সকল অন্তর ভরি,
জড়ায়ে রয়েছ নিয়ত তুমি,
তারি এক কণা ছড়ায়ে রয়েছে
ভূধর সাগর কানন ভূমি।

খেতাব-বিভ্রাট

শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এম-বি-ই

কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে শহর হইতে বহু দূরে বাদবপুর গ্রামে তিনকড়িবাবু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় গণৎকার পঞ্চানন ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এ-ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে রাজা-উজির একটা কিছু না হইয়া যায় না। সে আজ প্রায় চার যুগ আগের কথা, তখন পিসিমা জীবিতা। ঠাকুর মহাশয়ের ভবিষ্যৎ বাণীর উপর তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল।

পিতৃমাতৃহীন এই ক্ষণজন্মা শিশুটিকে মানুষ করিবার ভার পড়িয়াছিল পিসিমার উপর। ভবিষ্যৎ বাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় বালক তিনকড়িকে পরিপক্ক বয়স পর্য্যন্ত যাবতীয় মাদুলি, গাছের শিকড় এবং ফুল ভূষিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইত। বিভিন্ন মাদুলির ক্ষমতা দৈবদুর্বিপাকের উপর বিভিন্নভাবে কার্য্য করে, সুতরাং কাহাকেও অবহেলা করিবার উপায় ছিল না। কোনটিকে প্রাতে ধৌত করিলেই যথেষ্ট হইত, কোনটি তুলসীতলায় তিনবার স্পর্শ করাইলেই চলিত, কোনটিকে সামনে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করার ব্যবস্থা ছিল।

কাপ্তেন সাহেব কুচকাওয়াজে যেভাবে প্যারেড দেখেন পিসিমা প্রত্যহ প্রাতে তিনকড়িকে সামনে দাঁড় করাইয়া উক্ত সাধনায় নিযুক্ত করিয়া ছাড়িতেন। ফলে শান্তিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের বয়স বাড়িতেছিল। বিঘ্ন আসিল প্রাপ্ত বয়সে —অকস্মাৎ রায় বাহাদুর খেতাব-প্রাপ্তির সম্ভাবনায়।

রাজসম্মান আগতপ্রায় হইবার পূর্ব্বে তিনকড়িবাবুর পুরাতন কথা কিছু জানা দরকার। তাঁহার পিতা সাতকড়ি বাঁড়ুজ্যেকে গ্রামের সকলেই বিশেষভাবে চিনিত। তাঁহার আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর কাহারও ক্রূর কটাক্ষ যে একেবারে ছিল না একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না—যদিও গ্রাম্য স্বচ্ছলতার অর্থে যাহাই হউক না কেন, চার-পাঁচটি গরু, মরাই ভরা ধান, একটি নিজস্ব স্ত্রী ও ঢেঁকি ছাড়া আর কিছু বুঝায় না; অধিকন্তু কিছু থাকিলে অবৈতনিক একটি বিকলাঙ্গ চাকর যোগ দেওয়া চলিতে পারে। পিতা গত হইবার পর উক্ত সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন পিসিমার ভ্রাতুষ্পুত্র। স্বচ্ছলতার প্রভাব ও পিসিমার নিত্য বাঁধা স্নানের প্রয়োজন উপযুক্ত সময় উভয়ের স্কন্ধ ভর করিল। স্থির হইল তিনকড়ির উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ—অন্তত একটা পাশ না করিলে ভবিষ্যৎ জীবন মাটি হইয়া যাইতে পারে। গ্রামে পাশ করা চলে এমন একটি পাঠশালা নাই, সুতরাং শহরে যাওয়া সাব্যস্ত হইল। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিবার নিমিত্ত তিনকড়ি কৈশোর অবস্থাতেই পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্বশুর মহাশয়ে জমিদার মিঃ রেই আজীবন কলিকাতাবাসী। অফুরন্ত সম্ভোগ করিবার জন্য নিত্য নব কৌশল আবিষ্কার করি আসিতেছেন। বয়স পিসিমার নাগাল ধরিলেও ঘসামাজ ফলে তাহা আড়াল পড়িয়া গিয়াছে। মিঃ রেই আস বাঙালী হইলেও ধর্ম্মত স্বভাবটি সাহেবী। ইহার তাঁহার বিরাট সম্পত্তি ও ভগ্নাংশভাবে ইংরেজী শিক্ষা দারি হস্তবুদ হইতে সরকারী পেশকস দিয়া তাঁহার যাহা মুনা থাকিত তাহাতে তিনটি বিরাটকায় নামজাদা মো গাড়ী ও তদুপযুক্ত পারিপার্শ্বিক সব কিছু সাজাইয়া রাখিলে তাঁহার ইজ্জৎ হানি হইবার সম্ভাবনা ছিল। বা বাহির মহলে পদার্পণ করিলে খাস বিলাতী কোন প্রাসাদ বলিয়া ভ্রম হইত। ডাইনিং রুম্, বিলিয়ার্ড রুম্, ড্রইং রুম্ ছাড়া সীমার মধ্যে অসীম ধরণের নাচঘর— যাহাতে ফরাসের চিহ্নমাত্র নাই। কাঠের ফ্লোর কাঁচের মত মসৃণ, অনভ্যস্তের পা পড়িলে শ্যাওলার মত পিছলাইয়া যায়। কারণ অকারণে তাঁহার বাড়ীতে পার্টি ও মজলিস হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিমন্ত্রিতেরা সাহেবী মহল হইতে আসিতেন। এহেন মহাপুরুষের বিরাট অট্টালিকায় পিসিমা ভ্রাতুষ্পুত্র সহ বসবাস আরম্ভ করিয়া দিলেন কোন এক দূর আত্মীয়তার দাবী সূত্রে।

স্নেহের আতিশয্যে পিসিমার দখল ছিল, যাহার

সময়োপযুক্ত প্রয়োগকে ফাইন আর্ট বলা চলে। এই আর্ট অতি অল্প সময়ের ভিতর মিঃ রেইকে এমন ভাবেই নিস্তেজ করিয়া আনিল যে, অন্দরমহলের সব কাজে পিসিমার তত্ত্বাবধান না থাকিলে সাহেবের মনস্তুষ্টি হইত না। কানা-ঘুসা শুনা যায়, তিনি নাকি যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও টেবিলের বিলাতী খানা ছাড়িয়া অন্দরমহলে খাঁটি পুঁইডাঁটা, শুক্তনির ঝোল ইত্যাদির আস্বাদ লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কথাটা বিশ্বাস করিবার দুঃসাহসিকতা সকলের না থাকিলেও নূতন বাহাল করা ভীয়ান ঠাকুর সত্য বলিয়া জানিত।

সময় কাহারও অপেক্ষা রাখে না, সে তার চিরন্তন গতির ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। রেই সাহেব রাজা মহারাজা ইত্যাদি বড় বড় খেতাবের ধাপ উত্তীর্ণ হইয়া বার্দ্ধক্যের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নাচঘরে ক্বচিৎ বাতি জ্বলে, পার্টি ও ভোজের ভিড় কমিয়া গিয়াছে, কারণ তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা ছিল তাহা যতটা সম্ভব মহারাজা আদায় করিয়া ছাড়িয়াছেন, তদুপরি খেতাবের উপর ঋণ ভর করিলে যাহা হইয়া থাকে মহারাজা তাহার পীড়নের বাহিরে থাকিবার অবসর পান নাই, ফলে ধর্ম্ম চিন্তায় তাঁহার আশক্তি দেখা দিয়াছে। লোকের মুখ বন্ধ করা যায় না। তাহারা বলাবলি করিতেছে মহারাজা নাকি পিসিমার সহিত কাশীবাসী হইবেন ঠিক করিয়াছেন।

অন্যদিকে তিনকড়ি আর তিনকোড়ে নাই। মহারাজার সুপারিসে কোন প্রকারে এণ্ট্রান্স পাশ করার পরই সবডেপুটির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন (উপরওয়ালাকে খুশী রাখিবার টেকনিক তিনি পরম নিষ্ঠার সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন সুতরাং ফাণ্ডামেণ্টাল রুলস্-এর অনেক আইনপাশ কাটাইয়া তাঁহার ডেপুটি হইতে সময় লাগে নাই)। ডেপুটি খাঁটি হাকিম—সাধারণে তাঁহাকে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসনে উঠাইয়া দিয়াছে।

ডেপুটির পদপ্রাপ্তির পর হইতে তাঁহার সহজ জীবন-যাত্রার পরিবর্ত্তন ঘটিল। একদিন প্রাতে অন্যথা সাহেবদের মত আঁট সাঁট পোষাক পরিয়া মরণিং ওয়াকের প্রবল ইচ্ছা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। হাঁটুর শর্ট তদুপরি বহু কষ্টে বেল্ট আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। হাঁটা অভ্যাস নাই অথচ হাঁটিতে পারিলে এবং দৈব সহায় থাকিলে উপর আলা

মিঃ বোনার্জ্জী মর্ণিং ওয়াক্ করিতেছেন

কলেক্টার সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিবার সুযোগ মিলিতে পারে। মনকে দৃঢ় করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন।

সুদর্শন না হইলেও মা-লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁহার ব্যক্তিত্বে আকর্ষণী শক্তি ও বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা নিঃসন্দেহে আরাম ভোগের পরিচয় দিত, অর্থাৎ—উদরের পরিধি এমন একটি আকার ধারণ করিয়াছিল যাহার সঠিক মাপের কোন কিছুই বাজারে পাওয়া যাইত না। জামা-কাপড় ত দূরের কথা, ঈশ্বরদত্ত শরীরে যেটুকু সামঞ্জস্য ছিল তাহাও ভুলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন তিনি ইচ্ছা করিলেই করজোড়ে নমস্কার করিতে পারেন না, রীতিমত চেষ্টা করিলে অঙ্গুলী প্রান্ত স্পর্শ করে মাত্র।

উক্ত দেহকে মরণিং ওয়াকে নিযুক্ত করা যে কি বিড়ম্বনা, ভুক্তভোগী মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তিনি চলিয়াছেন অথচ মনস্কামনা পূর্ণ হইবার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখিতেছেন না। অবশেষে তুত্তোর বলিয়া মাঠের উপরই বসিয়া পড়িলেন। ক্লান্তি দূর হইবার পূর্ব্বেই হৈ হৈ করিতে করিতে সওয়ার সহ বিরাটাকার এক ঘোটক—তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে আর কি।

যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে পাশ কাটাইয়া হাঁটু জানু ইত্যাদি অঙ্গে ভর করিয়া যখন প্রায় সোজা হইয়াছেন তখন সাহেবি সওয়ার ক্রুদ্ধ ভাষার অর্দ্ধ-উচ্চারিত বিশেষণগুলি সংযত করিয়া বলিলেন, তুমি! তোমার জানা উচিত ছিল এটা টার্ফ—যেখানে আমাদের ঘোড়া ছোটে, সেখানে আরাম করিতে যাও কোন্ সাহসে।

মস্তক উত্তোলন করিয়া যখন দেখিলেন, মিষ্টভাষী সাহেব স্বয়ং ভগবান কালেক্টার, তখন তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—'গুড মরণিং' বলিবেন কি ক্ষণিকের বিশ্রামের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিবেন, স্থির হইবার পূর্ব্বেই সাহেব ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে আর একটি গোল বাধিয়াছে। কালেকটারকে সম্মান দেখাইবার জন্য ব্যস্ততার প্রয়োজন ছিল। তাড়াতাড়ি শরীরের গুরুভার উত্তোলন কালীন সাহেবী স্মার্ট (smart) ফিটিং তাঁহার বিপুল দেহের চাপ সহ্য করিতে পারে নাই। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ স্মার্ট ফিটিং লইয়া দেশীভাবে বসিবার কথা ছিল না। কুকার্য্য করিলে দণ্ডভোগ করিতে হয়। দুর্ভোগ কপালে যাহা ছিল তাহা ঘটিল। এমৎ অবস্থায় রাস্তায় হাঁটা যায় কি ভাবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধ গাড়ী সামনে থাকিলেও তাহাতে ঢুকিবার সাহস নাই কারণ অল্পদিন আগের অভিজ্ঞতায় বাহির হইয়া আসিতে প্রাণান্ত হইয়াছিল; তাহার পর শপথ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী চড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। একমাত্র উপায় গাড়োলী মনকে যদি কোন প্রকারে উদার করা যায় তাহা হইলে তাহার সাহায্যে একটি ট্যাক্সি জুটিতে পারে। এ চেষ্টাও বিপদসঙ্কুল। বেলা তখন প্রায় আট ঘটিকা, রাস্তার লোকের ভিড়ের সহিত দুই-একটি জ্যাঠা ছেলে চলিতে সুরু করিয়াছে। দুইশত গজ হাঁটিবার সময় পিছনে যে কোন জ্যাঠা ছেলের আবির্ভাব কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আতঙ্কে তিনি আড়ষ্টভাবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভক্তের জন্য ভগবান ডারবি সুইপ পর্যন্ত জোগাইয়া থাকেন, এ বিপদ ত কিছুই নয়। হঠাৎ এক ছাতাওয়ালার দর্শন পাইলেন। বুদ্ধিও আসিল তৎক্ষণাৎ। সে যৎসামান্য দক্ষিণা লইয়া এমন একটি ব্যবস্থা করিয়া দিল যাহাতে পিছনে গোরা থাকিলেও দুর্গানাম করিয়া অগ্রসর হওয়া চলে। এ যাত্রা মিঃ বোনার্জ্জী সুস্থ দেহে বাড়ী ফিরিলেন।

শরতের হাওয়ায় পূজার আগমনী সুর বাঙলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বোনার্জ্জী সাহেব এবার উৎসবে যোগ দিবেন ঠিক করিয়াছেন। আর্থিক অবস্থার সহিত কিছুমাত্র মিল না থাকিলেও দীর্ঘকাল একত্র সহবাসের ফলে মহারাজার অভিজাতসুলভ আচরণ ও বাবুগিরি বোনার্জ্জী সাহেব সস্তায় ভোগ করিবার সুবিধা পাইলে ছাড়িতেন না। তিনকোড়ে নামে যাঁহারা তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন তাহাদের উপর এযাবৎ-কাল মস্ত ক্রোধ পুষিয়া রাখিয়া ছিলেন। তাহারাই সর্ব্বাগ্রে চায়ের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। চায়ের জন্য কখন কেহ নিমন্ত্রণ করে একথা অনেক প্রাচীনপন্থী জানেন না। তদুপরি এক পক্ষ আগে 'আর-এস-ভি-পি'-যুক্ত কার্ড আসিয়া উপস্থিত হইলে আদালতের সমনজারীর মত হইয়া দাঁড়ায়। এতদিন ধরিয়া সামান্য চা খাইবার কথা মনে রাখা সকলের পোষায় না।

দেশী আচরণ মানিতে হইলে ইহা দোষণীয় মনে করি না, কারণ চা ত অতিথি হইলেই পাওয়া যায়, তাহা আবার দিন-ক্ষণ দেখিয়া খাইতে হইবে না কি?

মোটের উপর চায়ের পার্টি জমিয়াছিল ভাল। পরিচিত সাহেবী দোকানদার কেহ বাদ পড়েন নাই। ছোটখাট মহল অন্তর্ভুক্ত রায়তদারও অনেক উপস্থিত ছিলেন।

আবহাওয়া (weather), ঘোড় দৌড় ও পাশের বাড়ীর কেলেঙ্কারীর কথা লইয়া চায়ের আসর জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ওহে তিনকোড়ে—

সম্বোধনটা বজ্রাঘাতের মত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কি সর্ব্বনাশ, এ যে যাদবপুরের হরে খুড়োর গলা। লোকটার আকাট বুদ্ধি ও স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

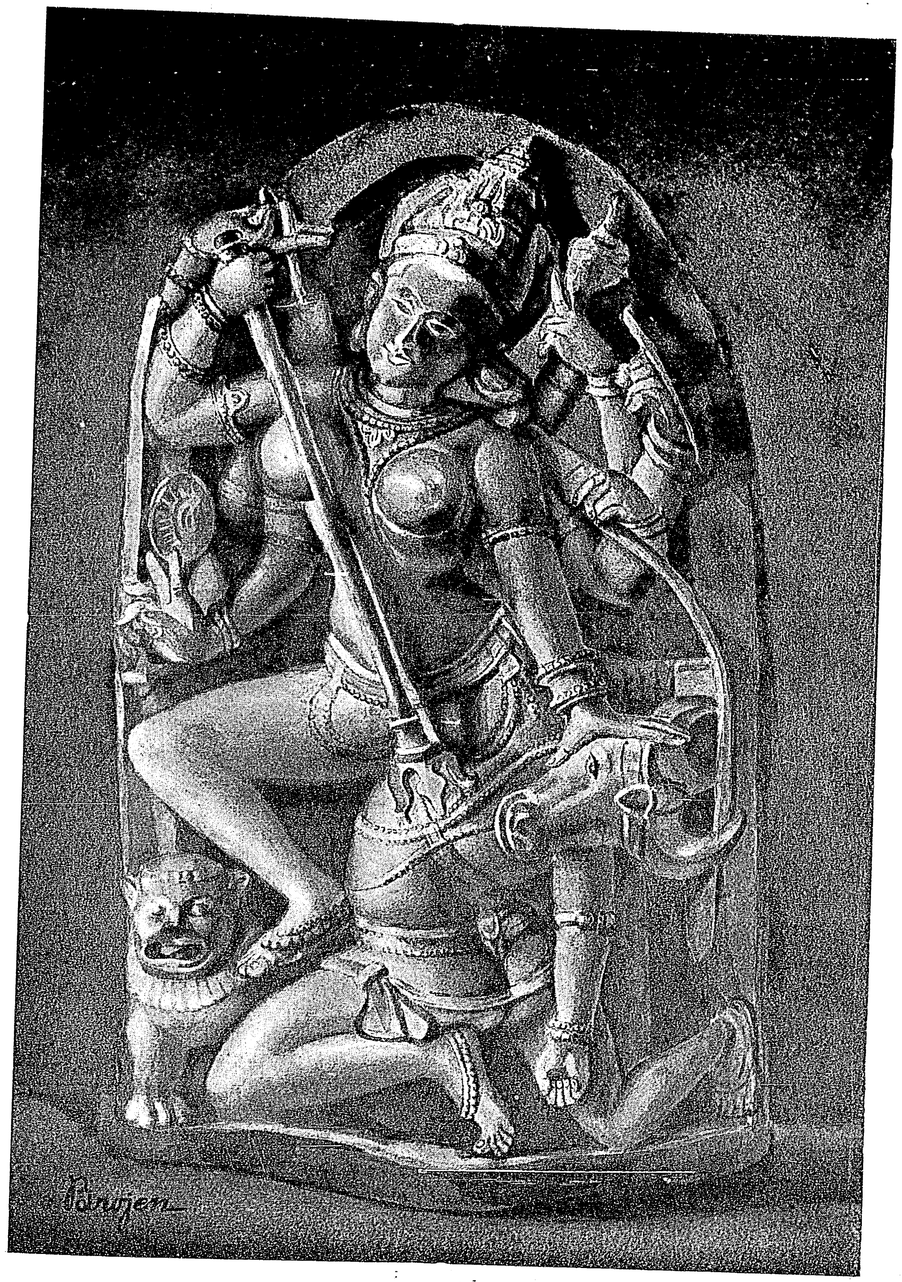

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈন মতাড়য়ৎ।

শিল্পী—ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী, কলিকাতা

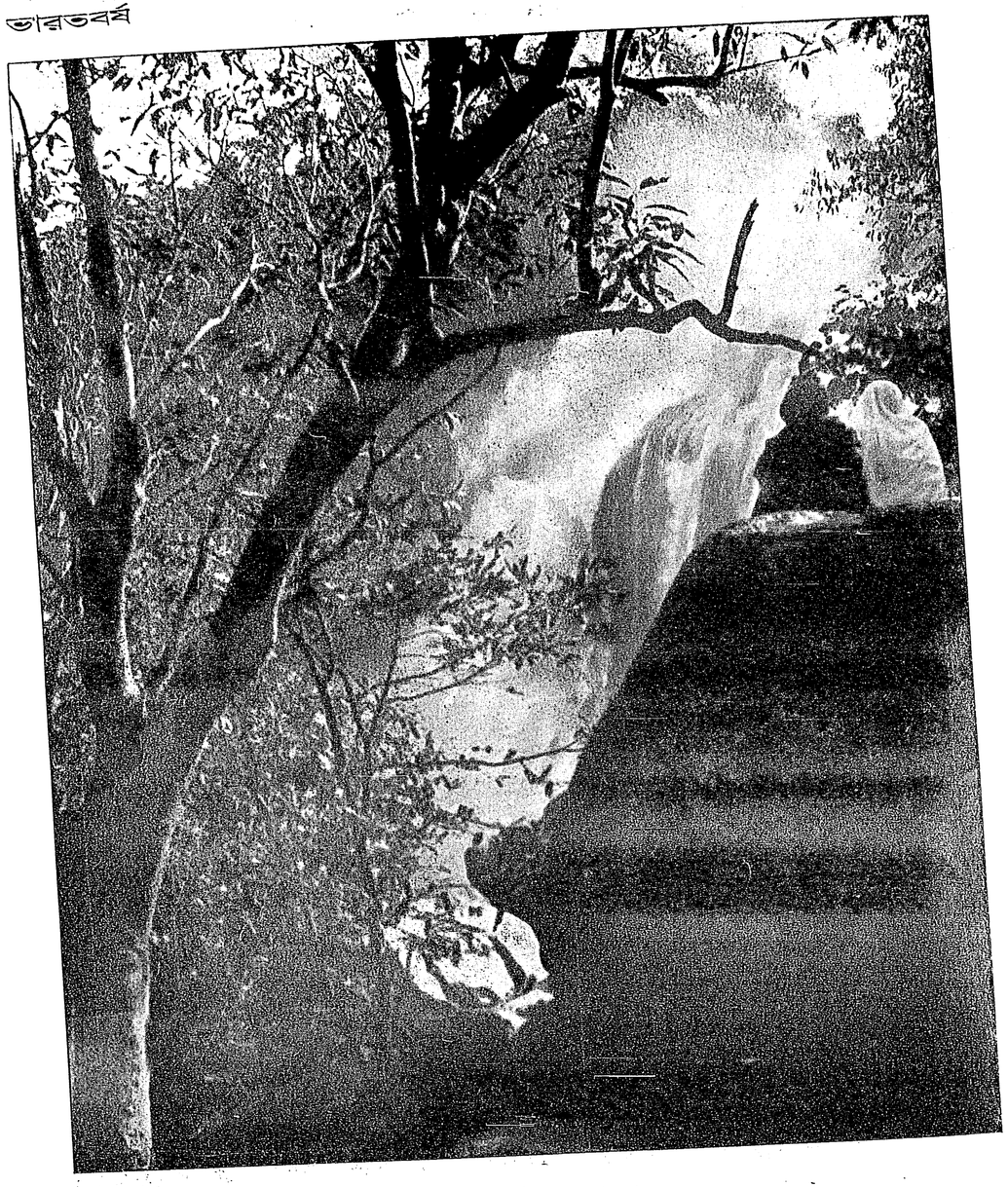

প্রকৃতির গান

শিল্পী—এস সি বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটনা

সেই সবল দীর্ঘকায় ও ভীতিপ্রদ দেহটি এখনও ঠিক রাখিয়াছেন, হস্তেও সেই পুরাতন বাঁশের সোঁটা—যাহার ইতিহাস গ্রামে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

ভদ্রাচারে দীক্ষিত মিঃ বোনার্জ্জী মুখে সাহেবী কায়দায় অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া অত্যন্ত বিনীত ভাবে ইঙ্গিত করিলেন—হুংকার করিও না। মার্জ্জিত ইঙ্গিত হরে খুড়ো বুঝিলেন না। সোঁটা সহ জজ সাহেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

খুড়া মহাশয় পার্টির খবর জানিতেন না, তিনি কালীঘাটে আসিয়াছিলেন, তথা হইতে ঐ বাড়ীতে কিছু পুরাতন গব্য ঘৃত ক্রয় করিয়া—জীবন্ত [illegible] দেখিয়া তিনকোড়ের বাড়ী উঠিয়াছেন—ইচ্ছাটা রাত্রেবাস এখানে সারিয়া লইবেন।

বাড়ীর প্রবেশ-পথে অর্দ্ধদগ্ধ সাদা চামড়া দেখিয়া একটু ইতস্তত করিয়াছিলেন কিন্তু সোঁটার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই আত্ম-সম্মান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বিনা আড়ম্বরে গামছা স্কন্ধে কপালে সিন্দূরের ফোঁটা সহ একেবারে চায়ের আসরে আসিয়া উপস্থিত। এক হস্তে মা-কালীর প্রসাদ, অন্য হস্তে সদ্যক্রীত সিগারেটের টিনে দোদুল্যমান পুরাতন গব্য ঘৃত। বারংবার ওষ্ঠে অঙ্গুলী স্পর্শিত হইতেছে দেখিয়া খুড়া মহাশয় ঠিক করিয়া লইলেন বেচারা তিনকোড়ের ঠোঁট ফাটিয়াছে। বাল্যকাল হইতে খুড়া মহাশয় তিনকোড়েকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। নিকটে আসিয়াই তিনি জাপটাইয়া ধরিলেন—কতকালের পর দেখা, চক্ষে তাঁহার জল আসিয়া পড়িল।

সামান্য দক্ষিণা লইয়া ছাতাওয়ালা এমন একটি ব্যবস্থা করিয়া দিল

জজ সাহেব লৌহভীম চূর্ণের অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছেন। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বাহু বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। খুড়া মহাশয়ের ঘর্ম্মে গলিত সিন্দূর বিন্দু ও তৎসহ চোখের জলে বোনার্জ্জী সাহেবের দুগ্ধফেননিভ সাদা কলার রঙীন হইয়া উঠিল। ফ্যাসান যাঁহারা মানেন তাঁহারা বুঝিবেন ইহা কি দারুণ সঙ্কট অবস্থা। বিশেষ করিয়া লেডিজ্‌দের সামনে।

এইখানে দৃশ্যের পট পড়িলে রক্ষা হইত, কিন্তু খুড়া কালীঘাটের সিন্দূর জোর করিয়া কপালে এবং গব্য ঘৃত ওষ্ঠে মাখাইয়া দিলেন। বয়স বাড়িলে কি হয়, খুড়ার কাছে তিনকোড়ে তিনকোড়েই আছেন—এই ত সেদিনকার কথা—তিনিই ত সাঁতলতলার মাদুলি দিয়ে সেবার তিনকোড়ের প্রাণ বাঁচান।

ঘৃত ও সিন্দূর ভূষিত হইয়া যখন বোনার্জ্জী সাহেব

দৃঢ় হস্তের বন্ধনমুক্ত হইলেন তখন তিনি জানিতে পারেন নাই—তাঁহার মুখশ্রীর কতখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

নব সাজে সজ্জিত হইয়া বোনার্জ্জী সাহেব সমবেতদের আপ্যায়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—হঠাৎ দেখা গেল, সময়ের আগে আধা-সাহেবদের দল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের সাহেব তাহাতে বিচলিত হইলেন না, কারণ কাঁচা হাতের অনেক এপয়েণ্টমেণ্ট থাকিতে পারে। উঠিয়া যাওয়া ত খুব স্বাভাবিক—কিন্তু সত্যের গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইল বিদায়কালীন মেম সাহেবের সহিত গুড্ বাই করিতে গিয়া। মহিলাটির কি উগ্র মূর্ত্তি—তিনি জোর দিয়া বলিলেন, তুমি খাঁটি হিন্দু আমি জানিতাম না, তোমাকে enlightened ভাবিয়াছিলাম—

সব কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই যেমন উঠিতে যাইবেন, অমনি চায়ের তেপায়া টেবিলে যাহা কিছু ভক্ষণীয় ও অভক্ষণীয় ছিল সব আসিয়া পড়িল মিঃ বোনার্জ্জীর পাৎলুনের উপর। নিম্ন অঙ্গে আইসক্রীমের শেষাংশ—চায়ের, জলের নির্ভুল চিহ্ন ও উর্দ্ধাঙ্গে সিন্দূর ও গব্যঘৃতের মিলনে তিনি অসুর সাজে সজ্জিত হইলেন।

তাহার পর যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা ভদ্র সমাজে বর্ণনা করিবার বাধা আছে।

উৎসব শেষ করিয়া জজ সাহেব এবার দেহ মন উৎসর্গ করিয়া পাবলিক্ ওয়ার্কসে লাগিয়া গিয়াছেন। কালেক্টর হুঙ্কার দিলেও প্রত্যহ প্রাতে তাঁহাকে 'গুডমর্‌ণিং' না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। অধ্যবসায়ে আন্তরিকতা থাকিলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। যথাসময়ে বোনার্জ্জী সাহেবের উপর বাজারের তত্ত্বাবধান হইতে মোটর গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আসিয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে পয়লা জানুয়ারি আগতপ্রায়। অথচ কালেক্টরের নিকট হইতে এখন পর্য্যন্ত খেতাবের কিছুমাত্র আভাষ পান নাই। খেতাবের হিসাব চিরকাল গোপনে হইলেও চালাক পিয়নদের ধরিতে পারিলে আসল খবর জানিয়া লওয়া যায়—কিন্তু বোনার্জ্জী সাহেব এমন একটি আসনে অধিষ্ঠিত যে পিয়নদের সহিত প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠতা করিবার সাহস নাই। মনের ভিতর তর্ক উঠিল—বড় বড় সাহেবরা যখন সামান্য সহিসদের নিকট ঘোড়দৌড়ের টিপ লইতে পারে তখন তাঁহার খবরটা জানিয়া লওয়ায় কি দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু সুবিধার অভাবে তিনি উৎকণ্ঠায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিলেন। রায় বাহাদুর খেতাব প্রাপ্তির কথা সকলেই বলাবলি করিতেছে, অথচ নির্দ্দয়েরা সূত্রটি ধরাইয়া দেয় না কেন। ইতিমধ্যে একদিন কালেক্টর সাহেব নিজের কামরায় ডাকাইয়া পৃষ্ঠে মৃদু আঘাত সংযোগে এমন একটি গোপন কথা জানাইয়া দিলেন, যাহার ফলে গৃহদাহের পুরাপুরি ব্যবস্থা হইয়া গেল।

পিতৃদত্ত নাম ভুলাইতে দেশী খেতাব অপেক্ষা সহজ উপায় আর কিছু আবিষ্কার হইয়াছে কি-না জানি না—মিঃ বোনার্জ্জী নাম উচ্ছেদ অথবা ডুবাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

আপিস হইতে ফিরিয়াই কালেক্টরের অনুকরণে রাশভারী গলায় ভৃত্য ভগাকে ডাকিলেন। ভগা গ্রাম হইতে আসিয়াছে এবং আজীবন কাল আমাদের সাহেবের সংসারেই ভৃত্যগিরি করিতেছে। কোন সময় হসন্ত যুক্ত নামে কেহ তাহাকে ডাকে নাই। এই পরিবর্ত্তনের গোড়ায় যাহাই থাকুক না, কোন অশুভ লক্ষণের সঙ্কেত নিশ্চিত জানিয়া প্রভুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রভু—এতক্ষণ ধরে ডাকছি—করছিলি কি?

ভৃত্য—বাবু—

প্রভু—তালব্য শ্—আমি বাবু!

কিছুদিন হইতে বাবু সম্বোধনে তাঁহার বিতরাগ আসিয়া পড়িয়াছিল। এত বড় অপমান সহ্য করিতে হইবে সাহেব ধারণা করিতে পারেন নাই। নিরীহ হসন্তযুক্ত ভগ্‌কে অনেক কটূক্তি সহ্য করিতে হইল, তথাপি সে বুঝিল না তাহার নাম ভগা হইতে ভগ্ হইল কেন।

অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিয়া ভগ্ সোজা গিন্নিমার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। নালিশ করিবার সাহস না থাকিলেও দুঃখ জানাইবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিল না।

এযাবৎকাল ভগার পৃষ্ঠপোষণ স্বয়ং সাহেব করিয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ সেই ভগা কর্ত্তার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চায় দেখিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী প্রসন্না হইয়া উঠিলেন।

এই ভগা সম্বন্ধে কত নালিস সাহেব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সাহেবের ভগা-প্রীতি এককালে এমনই ছিল যে তাঁহাকে স্বামীর ভালবাসা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে হইয়াছে। আজ সেই ভগাই কর্ত্তার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চায়—তিনি ভগবানের নিরপেক্ষ বিচারকে সশ্রদ্ধে নমস্কার করিলেন।

বিবাহের পর হইতে স্বামীর সহিত পাল্লা দিয়া তিনি শরীরটি ঠিক রাখিয়াছিলেন, সুতরাং উঠিতে বসিতে তাঁহার কাপড় গুছাইয়া না লইলে অসুবিধায় পড়িতে হইত। তিনি

আবার উভয়ে বলপ্রয়োগ করিলেন

কোমরে বল-গার্লের মত কাপড় আঁট করিয়া পরিয়া লইলেন সেকেণ্ড দোহ'র মত। সোজা সাহেব যে ঘরে কাপড় ছাড়িতেছিলেন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিছুমাত্র আড়ম্বর না করিয়াই বলিলেন—ওগো, এ কি কাণ্ড, ভগাকে যাচ্ছেতাই তুমি সব কি বলেছ? এতদিনকার পুরাণ চাকর যদি চলে যায় ত আমি তোমার সংসার চালাতে পারব না। আমায় বাপু ভায়ের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

চাকরের একটু রুচিসম্পন্ন নামকরণ করিয়াছেন—তাহার জন্য এতটা বাড়াবাড়ি তিনি সমর্থন করিতে পারিলেন না। হসন্তযুক্ত নাম সাহেবরা ত প্রায় ব্যবহার করিয়া থাকে। গড্—হগ্—বোস্—ইহারা কি মানুষ নয়! ভগাকে ভগ্ বলিয়া ডাকিলে দোষের কি থাকিতে পারে। আজ বাদে কাল তিনি রায় বাহাদুর হইতে চলিয়াছেন, আর তাঁহার বাড়ীর খানসামা কি না ভগা—ইহা হইতেই পারে না। মনে মনে যতই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করুন না কেন, গৃহিণীর দিকে নিশ্চিন্তভাবে তাকাইবার সাহস ছিল না। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে উত্তর করিলেন—অনেকক্ষণ ধরে ডাকছি, সাড়া দেয় নি—বোঝ না সমস্ত দিন কোর্টে কাজ করার পর জামাকাপড় না ছাড়তে পারলে কত কষ্ট হয়।

কর্ত্রীঠাকুরাণী ঝঙ্কার দিয়া উত্তর করিলেন—আহা কি জামাকাপড় ছাড়াই গো—এক বালিসের খোল ছেড়ে আর এক বালিসের খোলে ঢোকা। বাঙালীর ছেলে, বাড়ীর

ভিতর সাহেব সেজে থাকা কেন বাপু। কিছুদিন থেকে তোমার অনেক বিষয়ে মতিভ্রম দেখছি—এর আগে আমার কত কাছে এসে 'ওগো' বলতে, এখন···

আপিস-ফেরতা কেরাণীরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলে বাঁচে—আর তুমি সব সময় গলায় ফাঁস না লাগিয়ে থাকতে পার না। গলায় ফাঁসটা কি ?—কেন তোমরা টাই না কি বল—ও ত গলায় দড়ি দেবারই মত। এই ত সেদিন নারকেল নাড়ু ক'রে তোমাকে খাওয়াতে এলাম, কি-না তোমার হাঁটুর ভারে একটু ভর ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম—তুমি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা চেহারা ক'রে চেঁচিয়ে উঠলে—ক্রীজ্ ক্রীজ্—

ইংরেজীতে গালাগালি আমরা না হয় বুঝতে পারি না, তাই বলে ক্রীজ বলবে কেন ?

সাহেব কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন—ক্রীজ মানে কাপড়ের ভাঁজ, গালাগালি নয়।

কর্ত্রীঠাকুরাণী—হ্যাঁ ক্রীজ মানে কাপড়ের ভাঁজ—আমি কচি খুকি, কিছু বুঝি না—তোমাকে সোজা বলে দিচ্ছি—ক্রীজ আর ভগ্ চলবে না। তোমার কাজ ত কোর্টে যাওয়া এবং সেখান থেকে বাড়ী ফেরা—সংসার চালান কি জিনিস যদি বুঝতে তা হ'লে মেজাজ দেখাবার চেষ্টা করতে না।

সাহেব দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার ফাঁক খুঁজিতেছিলেন, অথচ দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন সশরীরে মহিয়সী মহাশক্তি, এমৎ অবস্থায় একমাত্র দীনত্রাতা ভগবান উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু সে দিক দিয়াও ইনার্ ম্যান্ কোন সাড়া দিতেছে না। কি করিবেন, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণীর দিকে একবার গদগদভাবে তাকাইলে কি হয় ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ভগা আসিয়া একটি ভিজিটিং কার্ড দিয়া গেল। গোদের উপর বিষ ফোড়া—বেচারা ভগা কয়লা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কার্ডটি তাহার কর-কমলের অভ্যন্তরস্থিত করিয়াছিল—ফলে কার্ডের মালিকের নাম নিরাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। জলে ভাসিয়া যাইবার সময় সামান্য তৃণও নাকি হতভাগ্যের আশ্রয় দেয়, তাই মনে করিয়া জজ সাহেবের কার্ড সহায় করিয়া ঘর হইতে বাহির হইবেন ঠিক করিয়াছেন, ইতিমধ্যে ভগা এক ফিরিঙ্গি মহিলাকে লইয়া তথায় উপস্থিত। দেখিতে মন্দ নয়—তাহার উপর বয়স উত্তেজক, বেশভূষা মাদকতায় পূর্ণ। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী এমন একটি মুখভঙ্গী করিলেন, যাহার অর্থ ভুল করা যায় না ; ভগা যে এতবড় বোকা ও পাষণ্ড হইবে জজ সাহেব অনুমান করিতে পারেন নাই। দুই-চার মিনিট পরে আসিলে মহাভারত কি অশুদ্ধ হইত। খেতাবপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একজন লেডি-স্টেনোগ্রাফার রাখিবেন ঠিক করিয়াছিলেন—আপিসের কাজ এত বেশী যে······

সাহেবের বুঝিতে বাকি রহিল না, মহিলাটি বন্ধু প্রেরিত স্টেনোগ্রাফার। আকর্ষণের দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন এমন সাহস নাই, অথচ মেম সাহেবের বয়স কম বলে সাহেবের মন বিগড়াইয়া গেল। সাহেব কপাল মুছিবার ছলে নিজের দৃষ্টি আড়াল করিয়া মহিলাটিকে ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কর্ত্রীঠাকুরাণী তখন সবে গা ধুইয়া আসিয়াছেন। মেম সাহেব নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ভিতরে ঢুকিবার পথ চাহিলেন। যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয় ; এতটা গড়াইবে কে ভাবিয়াছিল। ম্লেচ্ছগাত্র স্পর্শ করায় অসংখ্যবার দুর্গানাম করিতে করিতে কর্ত্রীঠাকুরাণী পুনরায় গামছা পরিয়া স্নানের ঘরে ঢুকিলেন। এই ঘটনায় ফলাফল কি হইল শুনিতে হইলে হৃদয়কে পাষাণের মত কঠিন করিয়া লইতে হয়। এইটুকু বলিতে পারি—দুর্ব্বল মেষ হিংস্র শার্দ্দূল দ্বারা আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে যে অবস্থায় থাকে—আমাদের জজ সাহেব তাহা অপেক্ষা কিছু মাত্র ভাল মনে ছিলেন না। নবাগতা মহিলাটির সহিত বিজনেসের কথা ছাড়া আর কিছু কথা হইয়াছিল কি-না জানিবার সুযোগ ছিল না। মহিলাটি জজের স্টেনোগ্রাফার হইবার পর এক সপ্তাহ কাটিতে চলিল—কর্ত্তা-গৃহিণীর বাক্যালাপ বন্ধ।

সাহেবেরও নানা রকম চাঞ্চল্য দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, অনেক বিষয়ে কেমন একটা কাঁচা কাঁচা ভাব দেখাইবার জন্য অত্যধিক ব্যস্ততা দেখা দিল। হঠাৎ অনেক বৎসর পরে ড্রেসিং টেবিলের উপর ফরাসী দেশীয় লেভেণ্ডার আসিয়া হাজির। যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারা এই সব লক্ষণ রহস্যময় মনে করিতে লাগিলেন। জজ সাহেবের সেদিকে দৃকপাত নাই, তিনি নির্ভীকভাবে আনন্দকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং প্রত্যহ বিজনেসের জন্য তাহাকে আদালতের ছুটির পরেও দীর্ঘকাল থাকিতে হইতেছে। আজকাল তিনি নিজে ফাইলের মর্ম্ম বুঝাইয়া না দিলে চলে না। ওদিকে পুঁটিকে (তৃতীয়া কন্যা) দেখিবার জন্য বরকর্ত্তারা নোটিশ পাঠাইয়াছেন—ওমুক দিন সন্ধ্যা অত ঘটিকার সময় তাঁহারা মেয়ে যাচাই করিতে আসিবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময় বরকর্ত্তারা জজ সাহেবের গৃহে উপস্থিত, অথচ অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার কিছু মাত্র ব্যবস্থা নাই। সাহেব তখন কোর্টে স্টেনোগ্রাফারের সহিত জরুরী কাজে ব্যস্ত। বাড়ী হইতে কর্ত্রীঠাকুরাণী তাগিদের পর তাগিদ পাঠাইতেছেন, কিন্তু খাস-আর্দ্দালী কড়া হুকুম অমান্য করিয়া সাহেবের কামরায় ঢুকিতে সাহস পাইতেছে না। হঠাৎ সশব্দে সাহেবের ঘরের কবাট খুলিয়া গেল। লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইত, মেম সাহেবের চির-নৃত্যপরায়ণা পা-যুগল ভীতির সঙ্কেত দিতেছে—চলার গতিও বেশ দ্রুত—সাহেব তাঁহার পিছনে সমান বেগে আসিতেছেন। আর্দ্দালীকে সামনে দেখিয়া নিজেকে সংযত করিলেন। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সাহেব জানিতেন সব কাজে সাক্ষী রাখা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। স্থির করিলেন পরে মিটমাট করিয়া লইবেন। জরুরী কাজ করিতে গিয়া উপরন্তু যে সব কাজ তিনি করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, অর্থাৎ আনুমানিক যৌবনের তাড়া তিনি সামলাইতে পারেন নাই—উপযুক্ত সময়ের আগেই মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

আর্দ্দালীর নিকট কর্ত্রীঠাকুরাণীর তাগাদার কথা শুনিয়া তিনি প্রথমটা রাগিয়া উঠিবার চেষ্টায় ছিলেন, তাহার পর যখন মনে পড়িল আজ পুঁটিকে বরকর্ত্তাদের দেখিতে আসার কথা তখন তাঁহার টনক নড়িল। এ বিস্মরণের ত ক্ষমা নাই—কি কুক্ষণেই তিনি বুড়া বয়সে স্টেনোগ্রাফার রাখিতে গিয়াছিলেন। স্টেনোগ্রাফারই বা রাখিতে যাইবেন কেন—যদি না তাঁহার অনতিবিলম্বে রায় বাহাদুর হইবার সম্ভাবনা থাকিত ? যত শীঘ্র পারিলেন বাড়ী ফিরিলেন। অভ্যাগতদের গম্ভীর মুখ দেখিয়া নানাভাবে তাঁহাদের খুসী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাবি জামাতা একটি সচল রত্ন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সদ্য ব্রিলিয়াণ্ট স্কলার ছাপ মারিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। অবশেষে এমন ছেলে ফসকাইয়া যাইবে না ত ? ভিতর-বাড়ীতে কি হইতেছে জানিবার উপায় নাই। বিপদে পড়িলে অনেকেই দার্শনিক হইয়া থাকেন—সাহেব বুঝিলেন, যথাস্থান হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, সুতরাং আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। অগ্নির শিখা কতখানি জানিতে পারিলে সাবধানে অগ্রসর হইতে পারেন, কিন্তু উপদেশ দিতে পারে এমন কাহাকেও সামনে দেখিতেছেন না। ভগার পুরাতন নাম ধরিয়া ডাকিলে হয়ত সে প্রথমবারেই সাড়া দিতে পারে, কিন্তু তাহার টিকি দৃষ্টিগোচরের বাহিরে। বিপুল অরণ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। একটু বসুন, আপনাদের বড় কষ্ট হয়েছে ইত্যাদি রসাল কথায় কতক্ষণ চিনি ভেজে! বরকর্ত্তারা অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমত মেয়ে দেখাইবার নাম নাই, দ্বিতীয়ত তামাক পান সিগারেট কেহ দেয় নাই, তৃতীয়ত এখানে জলযোগ করিতে বাধ্য হইবেন জানিয়া সমস্ত বিকালটা নিজেদের অভুক্ত রাখিয়াছেন। শেষের প্রয়োজনীয়তা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন, অথচ ও বিষয় কন্যাকর্ত্তার ঔদাসীন্যই বেশী প্রকাশ পাইতেছে। সংক্ষেপে—ত্রয়োস্পর্শ যোগ ঘটিল। একজন ভদ্রতার আইন অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন—কি মশাই, আর কত দেরী ?

জজ সাহেব নিজের প্রত্যুৎপন্নমতির উপর নির্ভর করিয়াও সঠিক উত্তর জোগাইতে পারিলেন না, বলিলেন—এ—এ—এই যে। বিদরীর কাজ করা রূপার ফরসি থাকা সত্ত্বেও ভগা দুই ছিলিম তামাক দুইটি নোংরা শ্রাদ্ধের বেঁটে হুঁকার উপর চড়াইয়া আনিল। স্বচক্ষে এই কাণ্ড দেখিয়াও কিছু বলিতে পারিলেন না।

দরজার আড়ালে ভগাকে ডাকিয়া প্রথমেই একটি মুদ্রা বকশিস দিলেন, তাহার পর অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—ওরে পুঁটির আসতে আর কত দেরী, বাবুদের জলখাবার দেওয়া হয়েছে ত ? এঁনারা অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি ইত্যাদি—মনের এই অপ্রত্যাশিত আবেগ দেখিয়া ভগা সাহেবের মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িল। কখনও ত সে এই রকম ব্যবহার বাবুর নিকট পায় নাই, তবে কি বাবুর কিছু হইল নাকি। বিমর্ষভাবে মা-ঠাকরুণকে জানাইল—বাবুর কি হয়েছে ?

দূর হইতে কর্ত্রীঠাকুরাণী দেখিলেন, সাহেব অস্থিরভাবে

পাইচারি করিতেছেন এবং শীতকালের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া সত্ত্বেও ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছিতেছেন। ব্যাপার কি অনুমান করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। চরিত্রদোষ ঘটিলে তাহার আনুসঙ্গিক সব কিছুই পিছু লইবে তাহা আর বিচিত্র কি। এই রকম ঘটনা আগেও একবার ঘটিয়াছিল, তখন মেমসাহেবের খবর জানিতেন না। বিলাতী খানার রাত্রের নিমন্ত্রণে কি সব ছাইভস্ম খাইয়া আসিয়াছিলেন। সে রাত্রে যমের সহিত টানাপোড়েন করিয়া বাঁচাইতে হইয়াছিল—চক্ষুর সে কি দৃষ্টি, রক্ত যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল—কথা বলার ভঙ্গিই বা কি চমৎকার। ঘটনার সূত্রগুলি যতই বাছিতে লাগিল, ততই পুরাতন বীভৎস দৃশ্যগুলি একের পর এক চাক্ষুষ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যতক্ষণ না বেহুঁস অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, আজও সেই দিনকার ব্যবস্থা করিতে হইবে নাকি—ছি ছি, কি কেলেঙ্কারীর কথা। পুঁটির বিবাহ কিছুতেই পণ্ড হইতে দিবেন না। পাশের বাড়ীর অরুণের আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া আবার তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কর্ত্তার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, অরুণকে দিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। অরুণ শহরের হাল-ফ্যাসানের ছেলে—বেশের পারিপাট্য তাহার কাছে একটা বড়দরের কৃষ্টি—গায়ে ইকনমিক দেশী কোর্ত্তা—গলার সামনে রুদ্রাক্ষের একটি বোতাম। দৃষ্টিভ্রমে কোর্ত্তাটি খাট শার্ট ও ফতুয়ার মাঝামাঝি লাগে। সযত্নে রাখা রুক্ষ কেশ, থান ধুতি কোঁচান, পায়ে রেশমি বোতামযুক্ত কাবুলী চটি। ভদ্রলোক হাসিতে হাসিতে আসিতেছিলেন, হঠাৎ পাতান-খুড়িমার মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। খুড়িমা অস্থির হইয়া বলিলেন—এখন কি আর মাথা চুলকাবার সময় আছে বাবা—আয় দুজনায় মিলে ভিতরে নিয়ে আসি ওখানে থাকতে দিলে শেষ পর্য্যন্ত একটা কেলেঙ্কারী না হয়ে যাবে না। অরুণ প্রস্তুত, আগে আগে চলিল এবং নিকটে আসিয়াই বিনা বাক্যব্যয়ে সাহেবের হাত ধরিয়া টান মারিল। ততক্ষণে খুড়িমা আর একহাত ধরিয়াছেন। সাহেব হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হয়েছে কি?

কর্ত্রীঠাকুরাণী ওষ্ঠ চাপিয়া উত্তর করিলেন—চেঁচামেচি করো না, দোহাই তোমার, ভিতর-বাড়ীতে এস, সব বলছি।

সাহেব টানা-হেঁচড়ায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—এখন আব্দার ভাল লাগে না।

—বাবা অরুণ, শুনলি ত বুড়া বয়সে কথার ভঙ্গী—এখন আর সন্দেহ আছে, ভিতরে নিয়ে চল্ বাবা, কেলেঙ্কারীর হাত থেকে বাঁচা।

দুই জনে আবার বলপ্রয়োগ করিলেন। প্রথমটা সাহেব বেঁকিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন কিন্তু হৃদরোগের কথা মনে পড়িতেই হাল ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর দম্পতির শুভমিলনে কি হইয়াছিল বর্ণনা করিব না, কারণ তাহা শুনিবার শক্তি আনিতে হইলে পাষাণের মত হৃদয় শক্ত করিতে হয়।

পয়লা জানুয়ারী। ভোর হইবার পূর্ব্বেই উপযুক্ত স্থান হইতে অভিনন্দনসহ তার আসিল—তাঁহার রায়বাহাদুর খেতাবপ্রাপ্তির বার্ত্তা লইয়া। একই ছত্র বহুবার পড়িলেন, তথাপি আশ মিটিতে চায় না। গৃহিণীকে খবরটা জানান দরকার, কিন্তু সংসার-ধর্ম্মের যে সব বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাহাতে খেতাব-সংবাদ ত তুচ্ছ, জড়োয়ার কাজসহ [illegible] নিরেট সোনার অনন্ত ঘুস দিলেও কোপের উপশম হইবার সম্ভাবনা নাই। রাগ আসিয়া পড়িল পুঁটির উপর, তাহাকে দেখিতে না আসিলে এ বিপদে পড়িতে হইত না। [illegible] স্তোক দিলেন, ছেলেটা এমন কি আহা মরি—ও রকম ছেলে অনেক জুটিবে। পুঁটি ওদিকে শত্রুর মুখে ছাই দিয়া বাড়ন্তের ডেঞ্জার জোন্-এ আসিয়া পড়িয়াছে; রং-এর জৌলস আব্‌লুস কাঠ পাশে না রাখিলে বুঝিবার উপায় নাই। এ ছাড়া আরও অনেক শুভলক্ষণ আছে—যাহা বিবাহের বাজারে মোটা টাকা নজর না দিলে মালিকানী স্বত্ব হস্তান্তর করা চলে না। রায় বাহাদুর সবই জানিতেন, তবু মনে বল পাইবার জন্য তর্ক উঠাইতেছিলেন। অবশেষে পুঁটুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আজ মহাআনন্দের দিনে তিনি সবার মাঝে একা। গৃহলক্ষ্মী আইন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। পুত্রকন্যারা এখনও বাবা বলিয়া ডাকে, স্ত্রী ওগো ছাড়া আর কিছু বলিতে প্রস্তুত নন। স্বগৃহে রাজসম্মানের যদি এতটা আদর পান, ত বাহিরের লোক রায় বাহাদুরের জন্য মাথা ঘামাইবে কেন। আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম—উপর-আলার নির্দ্দয় অত্যাচার সবই সহ্য করিয়াছেন খেতাবপ্রাপ্তির আশায়, সেই খেতাব যখন তিনি পাইলেন তখন কেহই তাঁহার ক্ষমতার উপযুক্ত মূল্য দিল না—রায় বাহাদুর টেলিগ্রামটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব

শ্রীভুবনমোহন দাশ

২৯০ সালে শ্রাবণমাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বরিশাল জিলায় নবগ্রামে ব্রহ্মর্ষির জন্ম হয়।

তাঁহার পিতামাতার প্রদত্ত নাম ছিল শরৎচন্দ্র। তিনি ল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় ও পরে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ্যয়ন শেষ করিয়া অবশেষে সংস্কৃত শিক্ষালাভ মানসে দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে কাব্য, ব্যাকরণ বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে উপাধি ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া ১৬ সালে কলসকাঠী গ্রামে তত্রত্য উচ্চ ইংরেজী [illegible]লয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। শৈশব তই তাঁহার মনপ্রাণ ভগবানে সমর্পিত ছিল। সুবিধা লেই নির্জ্জনে বসিয়া ভগবৎচিন্তায় বিভোর হইতেন এবং জলে বুক ভাসাইয়া দিতেন। হিন্দুর তথা ব্রাহ্মণদের [illegible]হীন ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পূজা দেখিয়া তাঁহার গভীর দুঃখ হয় [illegible] এই কারণেই তথাকার ব্রাহ্মণ ও জমিদারগণের [illegible] মতদ্বৈধ হওয়ায় কলসকাঠী গ্রাম ত্যাগ করেন। প্রাণের [illegible]র অধ্যাত্ম পিপাসা লইয়া তিনি সাধনায় নিমগ্ন হন, [illegible] অন্নবস্ত্রের সমস্যা তাঁহাকে বিচলিত করিল। তিনি [illegible]তে ঘুরিতে কলিকাতা মহানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন।

একদিন শোভাবাজারের ডাঃ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষের [illegible] তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি [illegible] শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে গৃহশিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়েও তাঁহার একটি শিক্ষকতার কর্ম্ম জোটে। এই প্রকারে সামান্য আয়ে তাঁহার পিতামাতার সংসার চলিয়া যাইতে লাগিল।

শরৎচন্দ্র প্রাণের তীব্র অধ্যাত্ম ক্ষুধা লইয়া হাওড়ায় আচার্য্য শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট আত্মবিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করিয়া দিব্যচক্ষু লাভ করেন।

এইরূপে শরচ্চন্দ্র তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের মধ্য দিয়া সাধনার সিদ্ধপীঠে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে আসিলে যোগযুক্ত ব্যক্তির বাহ্যকর্ম্ম করিবার আর শক্তি থাকে না; তিনিও বৈষয়িক কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার তপস্যা প্রভাবে তাঁহার নিজেরও কোন অভাব হইল না এবং তাঁহার আশ্রিতজনও কোন অভাব অনুভব করিলেন না। ভগবানই এই যোগযুক্ত তপস্বীর যোগক্ষেম বহন করিলেন। কাশীতে কঠোর তপস্যাবলে—যাঁহাকে জানিলে মানুষের জানিবার ও পাইবার কিছু বাকী থাকে না, সমাধিবলে সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, তিনি সিদ্ধ হন।

তিনি খুবই প্রচ্ছন্নভাবে জীবনযাপন করিতেন। এমন কি তাঁহার প্রণীত কোনও গ্রন্থেই তাঁহার নামের উল্লেখ থাকিত না। আত্মজ্ঞান লাভের পর ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব

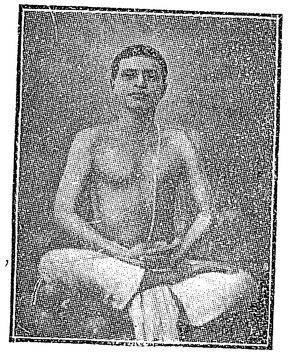

তাঁহাকে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হয় এবং ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন জীবের তথা জগতের কল্যাণের নিমিত্ত উপদেশ দান ও পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা অমূল্য ধর্ম্মতত্ত্ব পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন।

তিনি বলিতেন—অবস্থার পরিবর্ত্তন বা বেশভুষার পরিবর্ত্তনের মধ্যে বা কৃচ্ছ্রতার সঙ্গে আত্মজ্ঞান লাভের সম্বন্ধ খুবই কম। যে যে অবস্থায় অবস্থান করিতেছে সেই অবস্থা হইতেই সাধনা আরম্ভ কর, তোমার অনুকূল অবস্থা তোমার সাধনা বলেই আসিবে। তোমাকে কিছুই ছাড়িতে হইবে না—গৃহ, সংসার, আহার, বিহার, তোমার

দৈনন্দিন কর্ম্ম—কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না। যে যেমন অবস্থায় আছ এবং যে কোন বর্ণ, জাতি বা সমাজে থাক—সকলেরই মাকে ডাকিতে—ভগবানকে ডাকিতে সমান অধিকার আছে। সকলেই যে মায়ের সন্তান, সেখানে ছোট-বড় বিচার নাই, নীচ-উচ্চ প্রভেদ নাই।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, সব ছাড়, সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হও—তবে বেদান্ত পাঠের বা আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হইবে। ব্রহ্মর্ষি বলিতেন, কিছুই ছাড়িতে হইবে না—সে ত্যাগ বৈরাগ্য তোমাদের নাই; সাধনা কর—মাকে ডাক আন্তরিকভাবে কায়মনোবাক্যে। মা সন্তুষ্ট হইলে তোমায় তিনি আদর করিয়া বরণ করিবেন, গ্রহণ করিবেন—তাহা হইলেই মাকে পাওয়া হইবে—লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে—তোমার পথের কণ্টক আপনা হইতেই দূর হইবে।

বহুর মধ্যে একের কিরূপে উপাসনা করা যাইতে পারে এবং বাক্য ও মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দেবতা কিরূপে জাগ্রত হন তাহাই দেখাইবার জন্য ব্রহ্মর্ষি বিশেষ করিয়া দেবার্চ্চনা করিতেন। মুমুক্ষু সাধকের মুক্তির পথও এই দৈবপূজা হইতেই নিষ্কণ্টক হয়। গুরুশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া মন্ত্র-চৈতন্য পূর্ব্বক দেবতাকে আহ্বান করিলে দেবতা আসেন—দেবতা পূজা গ্রহণ করেন ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। যিনি যে জাতিভুক্ত হউন, যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুন—এইরূপ শক্তিমান হইলে তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। ব্রহ্মর্ষি একাকী শিষ্যদের লইয়া বিভিন্ন দেবতাদিগের যে অলৌকিক পূজা করিতেন তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। শুধু মুক্তির জন্য নয়, লাঞ্ছিত ভারতের জন্য, দেশের ক্লীবত্ব নাশের জন্য, দেশের তামসিক মনোবৃত্তি দূর করিবার নিমিত্ত মায়ের পূজা করিতেন। এখনও হাওড়ায়, বরাহনগরে ও কলিকাতায় সেইরূপ অলৌকিক পূজা দেখা যায়।

তুমি আর আমি

শ্রীঅনুরাধা দেবী

এসো আজ এইখানে পাশাপাশি বসি দুইজনে
আকাশে উঠেছে চাঁদ! কত কথা পড়ে আজ মনে।
মনে হয় তুমি আমি যুগে যুগে চলেছি এ-পথে;
মনে হয় কানাকানি কত খেলা ছেলেবেলা হ'তে—
করেছি পথের পাশে ওইখানে শিউলিতলায়,
তখন হয় নি রাঙা সরমের কোমল ছোঁয়ায়
আমার এ তনু-মন। তুমি ছিলে দুরন্ত চপল;
বারে বারে ছুটে এসে করি কোলাহল
ভেঙে দেছ খেলার ঘরখানি, মাননিকো মানা।
বই ফেলে চুপি চুপি চোরের মতন দিয়ে হানা
চমকে দিয়েছ এসে এমনি নিরালা রাতে একা;
আনমনে দুইজনে চকিতের চোখে চোখে দেখা
হয়েছে শতেক বার। তখন হয়নি মনে লাজ;
হয় ত ছিল না কথা, তবু কথা-বলা ছিল কাজ।
আজকে চাঁদের রাতে মুখপানে চেয়ে ভাবি তাই,
দুনিয়ার কোনখানে তুমি ছাড়া নেই বুঝি ঠাঁই।
তোমার চোখের পাতা যখন সজল হবে দুখে,
নিবিড় বাঁধনে আমি জড়ায়ে ধরিব মোর বুকে।
তোমার আমার মাঝে রবে না কো ব্যবধান কিছু,
তুমি যাবে আগে আগে, আমি ছায়া তব পিছু পিছু
চলিব অনন্তকাল সম্মুখের পথ বাহি ধীরে;
হয় ত কখনো ক্লান্তি নামিয়া আসিবে দুটি তীরে,
জীবনের পটভূমে সায়াহ্নের কালো ছায়া সম,
ঘনাবে বৈশাখী ঝড় নিস্পন্দ আকাশে গাঢ়তম;
তবুও দুজনে মোরা যাবো না কো দুই পথে চলি,
এমনি ছাতিম তলে আঁধার বা আলোকে উজলি
বিশ্রাম করিব পাশাপাশি। তুমি রবে তন্দ্রাতুর,
আমার বুকের তলে বাজিয়া উঠিবে ভীরু সুর;
হয় ত বাতাস লাগি তালের শাখায় তরুশিরে
কাঁপিবে আঁধার ছায়া; বনের গহন বীথি ঘিরে
নামিবে শ্রাবণ মেঘ ঝলকিয়া চকিতে বিজরি,
আমি বধূ ভীরুমনা ক্ষণে ক্ষণে উঠিব শিহরি'।
তোমার বুকের তলে আন্‌মনে ঢেকে মুখখানি
জপিব প্রেমের মন্ত্র, শুনিব গোপন মনোবাণী
অফুরন্ত উল্লাসের রোমাঞ্চিত আবেশে মধুর,
যা কিছু কামনা মোর অপুষ্পিত বেদনা-বিধুর—
মঞ্জুরিত হবে প্রিয় ফুলে ফলে আনন্দ উল্লাসে;
মাতাল এ তনু মন প্রতিক্ষণে তব অঙ্গবাসে
গাঁথিবে স্মৃতির ফুলে সৃজনের নব নব মালা;
আমি নারী, সে-সৃষ্টির শতদলে ভরে' নেবো ডালা।

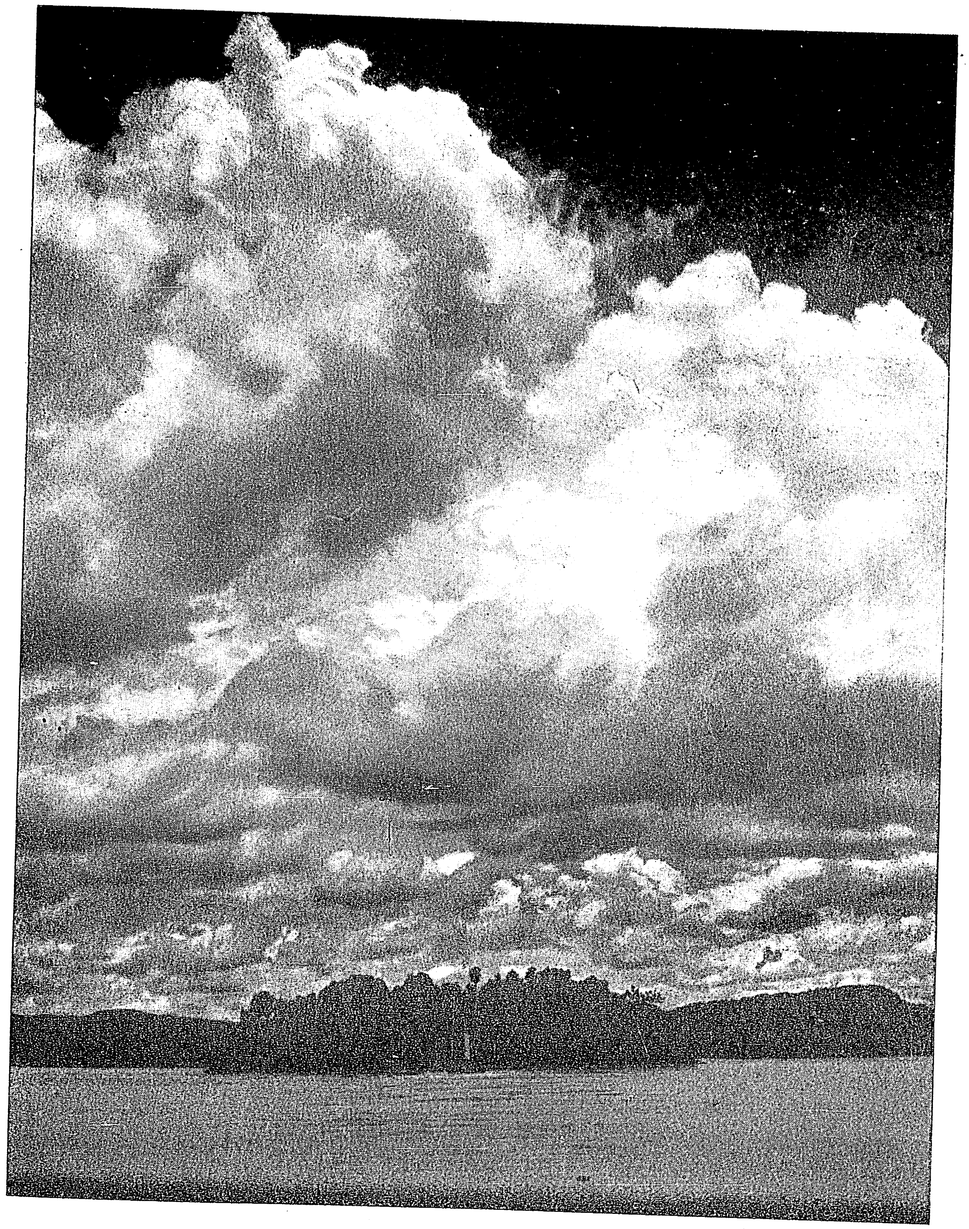

ব্রহ্মপুত্রে মৌসুমির বিক্রম

শিল্পী—নীরোদ রায়, গৌহাটী

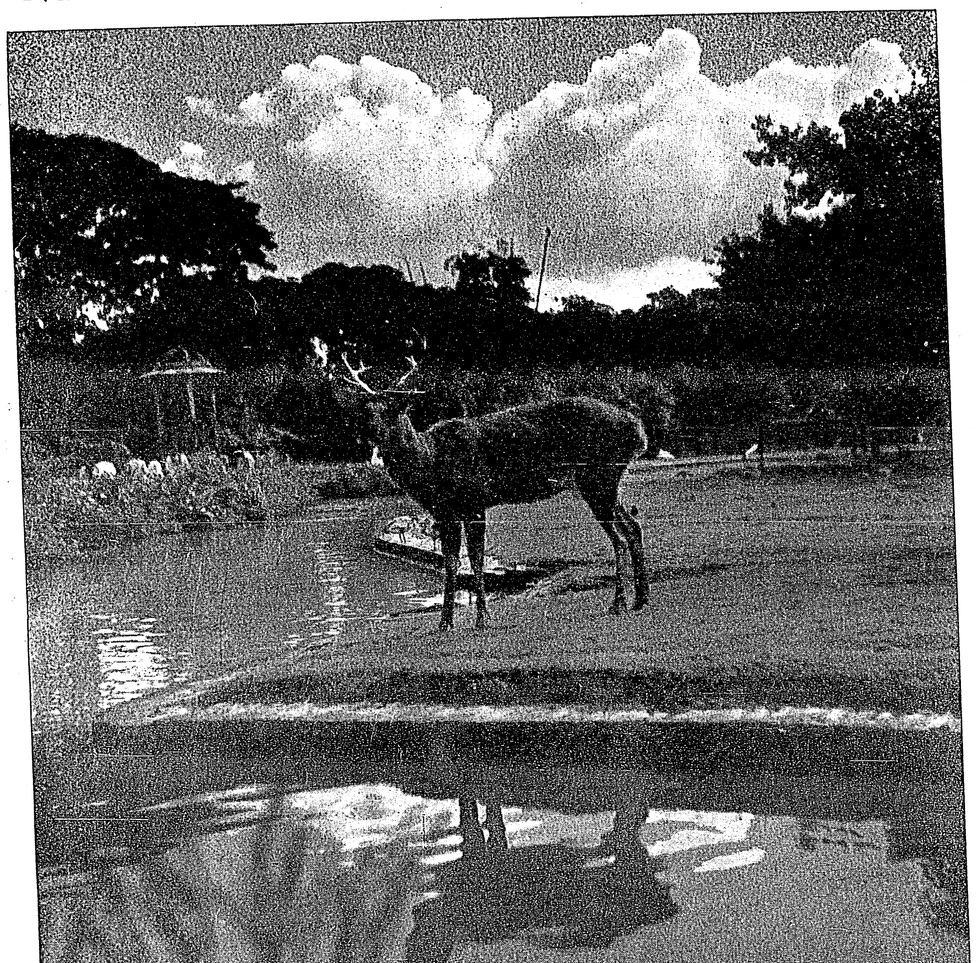

রূপান্তর

শিল্পী—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারভাঙ্গা

প্রলয়ের সূচনা

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু

মহাসমরের কালো ছায়া আজ বিদ্যুৎগতিতে সারা ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়্ছে। রণদেবতার দামামা-ধ্বনি এতদিন ছিল মৃদু এবং ক্ষীণ, এবার কিন্তু তা অস্পষ্টতার আবরণ অতিক্রম ক'রে গভীর নির্ঘোষে সারা জগৎকে উচ্চকিত ক'রে তুলেছে। হিংসার যে দুরন্ত ধারা এতদিন লোক-লোচনের আড়ালে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতো আত্মগোপন ক'রে ছিল তা অকস্মাৎ কূলহারা নদীর মতো বিপুলবেগে সমগ্র ইউরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম কর্ছে। 'যুদ্ধ বাধ্বে কি বাধ্বে না' এই ভেবে আমাদের মন এতদিন যে সন্দেহ-দোলায় দুল্ছিল এতদিনে তার অবসান ঘটেছে। এবার আর সুধু গর্জন নয়, রীতিমত বর্ষণ সুরু হয়েছে। অতর্কিত-বিক্রমে জার্মানী আক্রমণ করেছে পোল্যাণ্ডকে; জার্মান বিমান-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে আজ পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস বিধ্বস্ত। সেই শ্মশান-স্তূপের ওপর জার্মানী তার স্বস্তিক-লাঞ্ছিত বৈজয়ন্তী উড়িয়েছে। এই হচ্ছে ফ্যাসিস্ট শান্তির নমুনা। পোলিশ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত—সেখানে আজ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু তা হচ্ছে মহাশ্মশানের স্তব্ধতা—প্রেতপুরীর বিজন নীরবতা। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয় পোলেরা তবুও তাতে কিছুমাত্র দমেনি; পূর্ণ-উৎসাহে তারা স্বদেশ-উদ্ধারের চেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে। বৃটেন এবং ফ্রান্স এতদিন পরে তাদের ফ্যাসিস্ট তোষণ-নীতি পরিহার ক'রে পোল্যাণ্ডের সহায়তা কর্বার জন্য সম্মুখ-সমরে এ'গিয়ে এসেছে। ফলে, রণ-মহাদেবের চরণ-ক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী উঠেছে কেঁপে—ইউরোপ মেতে উঠেছে এক মর্মন্তুদ মরণ-মহোৎসবে।

পঁচিশ বছর আগে সারাজিভোতে (Sarajevo) এক আততায়ীর গুলি যে দাবানল জ্বালিয়েছিল তা ইউরোপের প্রাচীন-পন্থী সমাজ-ব্যবস্থার অন্তিমদশার নির্দেশ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল সেই তীব্র সংঘাতে। ভের্সাই সন্ধির ফলে সেই অগ্নিশিখা সাময়িক ভাবে নির্বাপিত হয়েছিল মাত্র—তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নি। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থ হচ্ছে পরস্পর-বিরোধী; এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এ সমস্যার সুমীমাংসা বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি; বরঞ্চ তাদের অসামঞ্জস্য ক্রমশ আরও সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। তার ওপর ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রগুলির মাঝখানে সাম্যবাদী রুশিয়ার আবির্ভাব সেই বিরোধকে আরও জটিলতর ক'রে তুলেছে।

বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার হয়েছে মুখ্যত অর্থ-নৈতিক কারণে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্র-গুলির ধনোৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় দ্রুতগতিতে। তারা যে পরিমাণে ধন উৎপাদন কর্তে থাকে তা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এই অতিরিক্ত পণ্যসম্ভার নির্বিবাদে বিক্রয় কর্বার জন্য তারা সাম্রাজ্য স্থাপন করে বিভিন্ন দেশে—যেখানে তাদের উৎপন্ন বস্তুর চাহিদা রয়েছে। এই পদানত দেশগুলি সুধু যে তাদের পণ্যদ্রব্যই কিন্বে তাই নয়—এরা যোগাবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং খাদ্য দ্রব্য। আবশ্যক হলে এরা হবে প্রভু, রাষ্ট্রগুলির বাসিন্দাদের উপনিবেশ—তাদের বাড়্তি অধিবাসীদের স্থায়ী আস্তানা।

সাম্রাজ্যবাদের প্রথম দিকে এ ব্যবস্থা সুচারুভাবেই চল্ছিল। তখন মাত্র স্বল্প কয়েকটি রাষ্ট্র ছিল এই পথের পথিক। বৃটেনে শিল্প-বিপ্লবের উৎপত্তি; কাজেই নবযুগের সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূত হচ্ছে গ্রেট-বৃটেন। ফলে গ্রেট-বৃটেন এমন এক বিস্তার্ণ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে যার তুলনা ইতিহাসে নেই। ফরাসী ওলন্দাজ দিনেমার পর্তুগীজ প্রভৃতি জাতিরও ইউরোপের বাইরে অধিকার কিছু কম নয়। পরস্পরের সঙ্গে একটা আপোষ ক'রে এরা সবাই যে যার অধিকার নির্ঝঞ্ঝাটে ভোগ কর্ছিল;—এসিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার বহু অঞ্চলেই এই সাম্রাজ্যবাদী বণিক সভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রোথিত হয়েছিল এবং এর অগ্রগতি ছিল অপ্রতিহত।

কিন্তু গোল বাধ্ল জার্মানীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে। বর্তমান জার্মানীর জন্মদাতা হচ্ছেন—অটো ফন বিসমার্ক।

তাঁরই প্রতিভা প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীতে এনে দেয় জাতীয় ঐক্য ; একটি অখণ্ড জার্মান রাষ্ট্র স্থাপনের কামনা রূপায়িত হয় তাঁরই কল্পনালোকে। এই কূট-কৌশলী রাষ্ট্রনায়কের চেষ্টায় আফ্রিকায় জার্মান অধিকার স্থাপিত হোলো বহু অঞ্চলে। জার্মানী হোয়ে দাঁড়াল অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে জেগে উঠ্‌ল এক তীব্র জাতীয়তা এবং তা চাইল জার্মানীকে পৃথিবীর প্রবলতম রাষ্ট্রে পরিণত করতে। যে কুহকে প্রলুব্ধ হয়ে মাসিডন-পতি আলেকজাণ্ডার ছুটে এসেছিলেন সুদূর পঞ্চনদের তীরে—যে মরীচিকা সীজারকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নীলনদের উপত্যকায়—যে আলেয়ার পিছনে ছুটে নেপোলিয়ন রাজ্যের পর রাজ্যে তাঁর জয়-পতাকা উড়িয়েছেন —সেই পৃথিবী-ব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখ্‌ল জার্মানী - কাইজার উইলহেল্‌মের অধিনায়কত্বে। ফলে রণদুন্দুভি বেজে উঠ্‌ল ইউরোপে এবং তার প্রাণকেন্দ্র হোলো জার্মানী। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চার বৎসর ধ'রে ইউরোপে যে নৃশংস নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হোলো তার গোড়ার কথা হচ্ছে এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে জার্মানীর উৎকট জাতীয়তাবোধ।

জার্মানীর উচ্চাভিলাষের সমাধি হোলো ভের্সাইতে। মিত্রশক্তিপুঞ্জের হাতে পরাজয় বরণ ক'রে জার্মানী বাধ্য হোলো ভের্সাই-সন্ধির শৃঙ্খল পরতে। জার্মানীকে নখদন্তহীন নিরীহ জীবে পরিণত করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন-নি ভের্সাই-সন্ধির রচয়িতারা—বিশেষ ক'রে ফরাসী রাজনীতি-ধুরন্ধরেরা; চিরকালের মতোই জার্মানীর বিষদাঁত ভেঙে দেওয়াই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। জার্মানীর উপনিবেশ হলো হস্তচ্যুত, সৈন্য-সংখ্যা হোলো নিয়ন্ত্রিত; তার বুকের ওপর চেপে বস্‌লো এক অসহ ঋণের বোঝা এবং ক্ষতিপূরণের দাবী। এ ছাড়া জার্মান, অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান এবং রাশিয়ান সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ওপর জেগে উঠ্‌ল কয়েকটি নাতি-বৃহৎ স্বাধীন রাষ্ট্র। এদের অস্তিত্ব সম্ভবপর হোলো মিত্রশক্তিপুঞ্জের প্রচেষ্টায় এবং সহায়তায়। যদিও মিত্র-শক্তিবর্গ সোৎসাহে প্রচার কর্‌লেন যে, এতগুলি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হোলো সর্বজাতির আত্মকর্তৃত্ব-স্থাপন নীতির অনুসরণ করে (right of self-determination) ;—কিন্তু বস্তুত এ পরাজিত জার্মানীর (এবং তার সুহৃদ্‌বর্গের) ক্ষমতা হরণের প্রয়াস ব্যতীত কিছুই নয়। মহাসমরের অবসানে বৃটেনের গৌরব হোলো ঘরে-বাইরে সুপ্রতিষ্ঠিত; কন্টিনেণ্টে ফরাসী প্রভাব হোলো অবিচলিত এবং সর্বজাতি-স্বীকৃত এবং জার্মান-মহিমা হোলো রাহুগ্রস্ত। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতাপ রইল অক্ষুণ্ণ।

সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে আবার পট পরিবর্তিত হয়েছে। জার্মানী আবার নববিক্রমে রাজ্য-বিস্তারে অগ্রসর হয়েছে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভের্সাই সন্ধির সর্তাবলীর পিছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব এবং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি। জার্মানী তাকে কোনও দিনই সদ্ভাবে গ্রহণ নিতে পারে-নি; কিন্তু তখন সে নিরুপায়। অক্ষম রোষে গজ্‌রান ছাড়া প্রতিকারের কোনো পন্থা তার চোখে পড়ে-নি। কিন্তু এই পরাজয়ে কাইজারের প্রাধান্যের অবসান ঘট্‌লেও জার্মানীর মনোবৃত্তির পরিবর্তন কিছুই হয়-নি। তার জাতীয় ঐক্য বরঞ্চ আরও দৃঢ় এবং গভীর হয়ে দাঁড়ায়। রাজকীয় শাসনতন্ত্রের (monarchy) অন্তিমদশা ঘনিয়ে এলেও সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের বিলোপ ঘটে-নি; যবনিকার অন্তরালে তার কামনার গগনস্পর্শী শিখা রইল সংগুপ্ত। সাম্রাজ্যবাদী মতবাদের কিছু প্রসার ঘট্‌ল, কিন্তু তা ক্ষণিক দীপ্তি বিকীরণ ক'রে অচিরেই আত্মগোপন কর্‌লে। জার্মানীর উগ্র দেশাত্মবোধ, রণক্ষেত্রে ভাগ্য-বিপর্যয়-হেতু ক্ষুব্ধ জাতীয় অহমিকা এবং সাম্যবাদী-পরিপন্থী-মনোভাব এই— ত্রিবিধ শক্তির সমন্বয়ে জার্মানীতে এক নতুন আন্দোলন বিস্তার লাভ কর্‌লে যা মহাযুদ্ধের পূর্বযুগের সাম্রাজ্যবাদের সংরোহণ কালের রূপান্তর। নাৎসীবাদ বা National Socialism নামে এই মতবাদ সাম্প্রতিক কালে শান্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিট্‌লারের পরিচালনায় নাৎসী জার্মানী আজ গণতন্ত্রী বৃটেন এবং ফ্রান্সকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছে পোল্যাণ্ডকে উপলক্ষ ক'রে।

নাৎসী জার্মানীর অভিযান ভের্সাই সন্ধির অবিচার দূর করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে এমন একটা ধারণা বর্তমান কালে বিস্তার লাভ কর্‌ছে। এ হচ্ছে নাৎসী প্রচারকার্যের সাফল্যের পরিচায়ক। নাৎসী-আন্দোলন সাফল্যলাভ কর্‌বার পরেই বৃটেনের মনোভাব পরিবর্তিত

হয়েছিল জার্মানীর সম্বন্ধে। হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের আগেই জার্মানীর ন্যায়-সঙ্গত দাবী অনেক কিছুই মেটানো হয়েছে বিনা যুদ্ধে এবং বিনা হুমকিতে। জার্মানীকে জাতি-সঙ্ঘের সদস্য নির্বাচন (১৯২৬ সালে) মিত্রশক্তিপুঞ্জের জার্মানীর প্রতি পরিবর্তিত মনোভাবের ইঙ্গিত। এর আগে লোকার্নো চুক্তি (১৯২৫) এই মৈত্রীভাব প্রসারের সহায়তা করেছে। স্ট্রেস্‌মানের আমলে (Stresemann) ১৯৩০-এ ইয়ংল্যাণ্ড থেকে বৈদেশিক বাহিনী অপসারিত হয়। ব্রুনিং (Bruning) এবং ফন পাপন (Von Papen)-এর আমলে ক্ষতিপূরণের ভার তিরোহিত হ'ল। পাপন-শ্লাইশেরের (Papen-Schleicher) কালে মিত্রশক্তিবৃন্দ স্বীকার কর্‌ল অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে জার্মানীর সামরিক সাম্যের অধিকার।

হিট্‌লার এলেন জার্মানীর নতুন দুটি দাবী নিয়ে—মধ্য-ইউরোপে জার্মানীর অক্ষুণ্ণ অধিকার-বিস্তার এবং উপনিবেশের আলোচনা। জার্মানীর এই অভিলাষ নিয়ে পূর্বেই 'ভারতবর্ষে' আলোচনা করেছি। (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫—বর্তমান লেখকের 'জোর কার পালা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) নাৎসী জার্মানী ধুয়া ধরেছে—তাদের চাই 'বাঁচবার জায়গা' (living space)। 'Lebensraum' (লেবেন স্রাউম) বা living space হচ্ছে সাম্প্রতিক ইউরোপ সুধু নয়—সমগ্র সভ্য জগতের সমস্যা। ১৯৩৮ সালে অগ্‌সবার্গে হিট্‌লার ঘোষণা করেছিলেন—"We must raise the demand for colonial living space. What people do not care to hear today they will be unable to ignore in a few years' time, and in four or five years they will have to take it into proper account." [উপনিবেশে বাঁচবার জায়গা আমরা চাইব-ই। আজ যা লোকে শুন্‌তে চাচ্ছে না কয়েক বৎসরের মধ্যে তা উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না এবং চার-পাঁচ বছরের মধ্যে এ দাবী তাদের সম্‌মে চল্‌তে হবে।] জার্মানীর এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হয়েছে ডক্টর লে'র রচনায় যখন তিনি বল্‌ছেন—As long as Germany is a nation without sufficient space, we are not free. While a small number of British and a small number of French rule over more people than their population numbers, we Germans, who with 80 million people are the largest racial unit in Europe, have no colonial territory whatsoever ; without colonies we are not free. The French and British have small population but large possessions. We have large populations and no possessions [জার্মানীর মুক্তি সম্পূর্ণ হবে না যতদিন পর্যন্ত না তার যথেষ্ট পরিসর জোটে। মুষ্টিমেয় বৃটিশ, এবং মুষ্টিমেয় ফরাসী, তাদের জাতির লোক-সংখ্যার চেয়েও অধিকসংখ্যক লোকের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার কর্‌ছে, অথচ ৮ কোটি জার্মান—আমরা হলাম ইউরোপের গরিষ্ঠতম জাতি—আমাদের কোনই উপনিবেশ নেই। উপনিবেশ না হলে আমরা স্বাধীন নই। ফরাসী এবং বৃটেনের লোকসংখ্যা অল্প, অথচ তাদের আছে বিস্তীর্ণ উপনিবেশ। আমাদের লোকসংখ্যা প্রচুর—অথচ আমাদের রয়েছে উপনিবেশের অভাব।] 'আরও স্থান চাই'—এই বলে জার্মানী তার প্রাক্‌সামরিক কালের সীমান্ত রেখা ফিরিয়ে আন্‌তে তো চায়ই—আরও চায়, জার্মান ভাষা-ভাষী সমস্ত ব্যক্তিকে একই রাষ্ট্রের অধীনতায় একসূত্রে গ্রথিত করতে। এ দাবী প্রায়ই ন্যায়সঙ্গত নয়; এবং ইতিহাস বহুক্ষেত্রেই জার্মানীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

এ যাবৎ হিট্‌লার তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধি করেছেন বিনা রক্তপাতে। রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র তাঁর কুক্ষিগত হয়েছে অথচ যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে নি—এর প্রধান কারণ হচ্ছে বৃটেনের উদাসীনতা। বৃটেন নিষ্ক্রিয় থাক্‌বে এই ভরসাতেই তিনি তাঁর নীতি নির্ধারিত ক'রে এসেছেন। জার্মানীর ভাগ্য-বিপর্যয়ের পর কন্টিনেণ্টে ফ্রান্সের প্রভাব বিস্তার পায় অত্যন্ত বেশী; এটি বৃটেনের বৈদেশিক-নীতি-বিরোধী ব্যবস্থা। কেন না, কোনও একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের বিপুল শক্তি সঞ্চয় বৃটেন চায় না। বৃটেন চায় ব্যালান্স অফ্ পাওয়ার বজায় রাখ্‌তে—বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধন করতে। তাই হিট্‌লার লিখ্‌ছেন তাঁর আত্মজীবনীতে—"However terrible have been and are the consequences for Germany of England's policy during the War, this must not blind us to the fact that *today it is no longer in the interest of England to see that Germany is crushed.* On the contrary, from year to year, English policy must be more and more directed to restricting the immo-

derate attempts of France to establish French hegemony over the Continent." [যুদ্ধের সময় অনুসৃত বৃটিশ নীতির ফল জার্মানীর পক্ষে যতই বিষময় হয়ে থাকুক না কেন, বর্তমানে জার্মানীর ধ্বংস বৃটেনের স্বার্থ-সম্মত নয়। বরঞ্চ, অদূর ভবিষ্যতে কন্টিনেন্টে ফরাসী প্রভুত্ব খর্ব করাতেই বৃটিশ প্রভাব নিয়োজিত হবে।] ১৯২৩-এ এরকম ধারণা পোষণ করতেন হিট্‌লার এবং অনেকেই মনে করেন তা একেবারে ভ্রান্ত নয়। ফ্রান্সের অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্তি ছিল বৃটেনের অনভিপ্রেত; সুতরাং নাৎসীবাদের অভ্যুদয়ের প্রাথমিক কালে তাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন বৃটেন অনুভব করে নি। অথচ ১৯৩৬ সনের ৭ই মার্চ হিট্‌লারের ঝটিকা-বাহিনী যখন রাইনল্যাণ্ডে প্রবেশ ক'রে তা বিবিধ সমরোপকরণে সুসজ্জিত করল তখন যদি বৃটেন বাধা দিত, তা হলে নাৎসী প্রভাব হয়ত অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত।

ফরাসী প্রভাব প্রশমিত করা ছাড়া আরও একটি কারণে বৃটেনের জার্মানীকে বাধা দেওয়া ঘটে ওঠে নি; এবং তা হচ্ছে সাম্যবাদ-ভীতি। এক্ষেত্রে বৃটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে নীতির মিলন ঘটেছে। ফরাসী-বৃটিশ শাসক সম্প্রদায় নাৎসী জার্মানীর থেকে অনেক বেশী ভয় করে সাম্যবাদী রুশিয়াকে। এই ফ্যাসিস্ট্ মনোভাবাপন্ন শাসকবৃন্দ হিটলারকে [এবং কতকটা মুসোলিনীকেও] সাম্যবাদী ভাবধারা প্রসারের বিপক্ষে রক্ষাকবচ স্বরূপ গণ্য ক'রে এসেছেন। কোমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তিতে এদের ছিল অটল বিশ্বাস। সোভিয়েট-জার্মান চুক্তি হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত বৃটেনের দৃঢ়ধারণা ছিল যে,সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না ক'রে জার্মানী কোনও দিন বৃটেন কি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না। কাজেই, হিটলার যে ইউরোপে সমরানল প্রজ্বালিত করবেন সোভিয়েটের সঙ্গে আপোষ ক'রে তা এদের পক্ষে ছিল কল্পনাতীত; এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়েই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী তাঁর ফ্যাসিস্ট্-তোষণ নীতি অনুসরণ ক'রে এসেছেন। শান্তি-সংহতি গঠন করবার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে সুধু এই রুশিয়ার আতঙ্কে।

ফ্যাসিজ্‌মের ঔদ্ধত্যকে দমন করবার একমাত্র বাস্তব উপায় ছিল শান্তিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একতা ও মিতালী-স্থাপন—প্রয়োজন ছিল গণতন্ত্রী ও সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির একটি সুচিন্তিত কর্মপন্থা অবলম্বন। কয়েক মাস আগে (১৫ই এপ্রিল) যখন বৃটিশ এবং রুশ সরকারের মধ্যে আপোষের আলোচনা সুরু হয় তখন যুদ্ধভীত জনমণ্ডলী উল্লসিত এবং আশান্বিত হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তার অকারণ দীর্ঘসূত্রতা এ আলোচনার ব্যর্থতার দিকেই ইঙ্গিত করছিল। যখন আবার সামরিক কর্মচারিবৃন্দ এ আলাপনীতে যোগদান করতে আহূত হল তখন অস্তমান আশা-সূর্য আবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল; কিন্তু অচিরেই প্রতিপন্ন হ'ল, এ নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ রশ্মি মাত্র। নাটকীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি হলো নিষ্পন্ন—বৃটিশ-রুশ আলোচনা হ'ল ব্যর্থ (অগস্ট্, ১৯৩৯)।

রুশ-বৃটেন-ফরাসী-মিতালীর উপক্রমণিকা নিষ্ফল হবার কারণ হচ্ছে বৃটেন এবং ফরাসীর সোভিয়েটকে অবিশ্বাস এবং এ সম্বন্ধে আন্তরিকতার অভাব। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে আতঙ্কিত করা। দুদিক থেকে আক্রান্ত হলে জার্মানীর অবস্থা যে বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হবে তা জার্মানী নিজেই সবচেয়ে ভাল জানে। কাজেই শান্তি-সংহতি-গঠনের প্রয়াসকে, জার্মানীকে ঘিরে ফেলবার (policy of encirclement) দুশ্চেষ্টা বলে জার্মান সংবাদপত্রগুলি অভিহিত করেছে। মনে করা গিয়েছিল যে, সামনে আসন্ন রুশ-বৃটেন-চুক্তিরূপ খড়্গ দোদুল্যমান থাকলে জার্মানী তার দুর্মদ অভিযান সংযত করবে। কিন্তু অকস্মাৎ রুশিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জার্মানী বুর্জোয়া রাষ্ট্রদের করল হতভম্ব; পরিণামে জ্বলে উঠ্‌ল প্রলয়ের আগুন।

রুশ-জার্মান-চুক্তিকে ব্যঙ্গ ক'রে কেউ কেউ বলছেন—সোভিয়েট এবার কোমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তিতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এর জন্য কতকটা দায়ী ইঙ্গ-রুশ আলাপনীর বিফলতা। মলোটফ বলেছেন যে, এ আলোচনা যে ফলপ্রসূ হয়-নি তার কারণ এ চুক্তি সম্পাদনের অভিপ্রায় কোনও দিনই বৃটেনের ছিল না। ফলে অযোগ্য ব্যক্তির হাতে আলোচনার ভার দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যস্থতায় এমন একটি গুরুতর কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব ছিল। তা ছাড়া সোভিয়েট চেয়েছিল বৈদেশিক অত্যাচার নিবারণে চুক্তিবদ্ধ জাতিদের দায়িত্ব হবে পারস্পরিক। বৃটেন এবং ফ্রান্স বা তাদের আশ্রিত কোনও রাষ্ট্র (যেমন পোল্যাণ্ড, গ্রীস কিংবা রুমানিয়া) যদি

আক্রান্ত হয় তা হলে যেমন সোভিয়েট তাদের সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে, তেমনি সোভিয়েট বা তার সীমান্তবর্তী কোনও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হ'লে ফ্রান্স এবং বৃটেনকে এদের আনুকূল্যে যুদ্ধে ব্রতী হতে হবে। কিন্তু এই পারস্পরিক সহায়তা করতে বৃটিশ বা ফরাসী প্রতিনিধিরা ছিলেন নারাজ। তাঁরা চেয়েছিলেন জার্মানীর পক্ষে সোভিয়েটের সাহায্য; কিন্তু সোভিয়েটের সহায়তার সঙ্কল্প তাঁদের ছিল না। ফলে এই একদেশদর্শী চুক্তির প্রস্তাব গেল ভেঙে।

অপর পক্ষে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি আকস্মিক হলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব লিটভিনফের পদত্যাগ রুশিয়ার বৈদেশিক-নীতির পরিবর্তন সূচিত করেছিল। সোভিয়েট একথা বার বার বলে এসেছে যে, কোমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তি বাস্তবিক পক্ষে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে উদ্যত নয়, তা হচ্ছে বৃটেন-ফ্রান্স-বিরোধী রাষ্ট্রগুলির সম্মিলন। এরা চায় বস্তুত বৃটেন ও ফ্রান্সের আধিপত্য বিলোপ এবং তার জায়গায় আপনাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। স্ট্যালিন তাঁর ১১ই মার্চের বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, মঙ্গোলিয়ার মরুভূমিতে, কি মাঞ্চুরিয়ার অরণ্যে বা মরক্কোর বনভূমিতে কিংবা ইথিওপিয়ার প্রান্তরে কোমিণ্টার্নের সন্ধানে অভিযান নিঃসন্দেহ হাস্যকর। বাস্তবিক, এই তথাকথিত সাম্যবাদী-বিরোধী রাষ্ট্রগুলির অভিযান হচ্ছে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বিপক্ষে। হিট্‌লারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জার্মানীর একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার। এ অভিলাষ পূর্ণ করতে গেলে সর্ব বিষয়ে এক বিশেষ নীতি অনুসরণ করা সব সময় সম্ভব না হতেও পারে। বরঞ্চ যেখানে স্বার্থের সঙ্গে আদর্শের, অভীষ্টের সঙ্গে নীতির বিরোধ ঘটে সেখানে কূটকৌশলী রাজনীতিবিদেরা আদর্শ এবং নীতিকে পরিহারই ক'রে থাকেন। হিট্‌লারও এই পন্থাই অবলম্বন করতে দ্বিধা বোধ করেন-নি। যে রুশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর অহি-নকুল সম্বন্ধ, তারই সঙ্গে আজ হিট্‌লার মিতালী করেছেন তাঁর স্বার্থসিদ্ধির আশায়।

এই রুশ-জার্মান চুক্তি এবার ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবেশকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। হিট্‌লারের এবার লক্ষ্য ডানজিগের দিকে। এবং তা স্বল্প আয়াসেই তাঁর কবলে এসে পড়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার পর তাঁর শ্যেনদৃষ্টি যে এদিকেই পড়্‌ছে তা বহুদিন আগেই জানা গিয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত, ডান্‌জিগের অভ্যন্তরেও নাৎসী অনুচরবৃন্দ উদগ্র আগ্রহে রাইখের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে চাইছে; অথচ এতদিন পর্যন্ত হিট্‌লার অপেক্ষা করছিলেন কেন? এর প্রধান কারণ ছিল বৃটেনের মতি-গতি সম্বন্ধে হিট্‌লার এবার স্থির-সিদ্ধান্তে আস্‌তে পারেন-নি। আশা ছিল, এবারও হয়তো বা বিনা যুদ্ধে কাজ উদ্ধার হবে; হয়তো বা মিউনিক চুক্তির দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এতদিনে বৃটেন এবং ফ্রান্স তাদের ফ্যাসিস্ট-তোষণ-নীতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রনায়কেরা এবার বেশ বুঝেছেন যে, পোল্যাণ্ডকে সহায়তা করবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—যদি তার মর্যাদা না রাখা হয় তবে নাৎসীবাদের বেড়াজালে ধরা পড়্‌বে সারা মধ্য-ইউরোপ; ফ্রান্স হবে শক্তিহীন এবং নির্বান্ধব বৃটেনের বিশাল সাম্রাজ্য অচিরেই কাহিনীতে পরিণত হবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনেকেরই আশা ছিল, হয় তো বা বৃটেন এবং ফ্রান্সের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে হিট্‌লার পিছিয়ে পড়্‌বেন এবং অশান্তির অনল নির্বাপিত হবে।

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় হিট্‌লারের পক্ষে পিছিয়ে আসা অসম্ভব। ফ্যাসিস্ট্ শাসনযন্ত্র সামরিক মনোভাব নিয়ে রচিত। নাৎসী আমলে সারা জার্মানী একটা বিরাট সেনা-নিবাসে পরিণত হয়েছে। সমগ্র জাতি সৈনিক-সুলভ কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সুচারু প্রচারকার্যের ফলে তাদের মনে জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তীব্র প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি—তাদের শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হচ্ছে অদম্য রণোন্মাদনা। তারপর, গত চার বছরের ইতিহাস—জার্মানীর বিজয় অভিযান—তাদের সঙ্কল্পকে করেছে দৃঢ়তর। বিজয়ের নেশায় অভিভূত হয়ে তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে চাইছে নব নব অভিযানের সূচনা করতে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ অনিবার্য। নাৎসী-নায়ক বা তাঁর তন্ত্রধারক কোনও জার্মান-নেতার আর ক্ষমতা ছিল না যে, এই রণ-পিপাসু নাৎসী-জার্মানীকে সংযত করতে পারেন—তাদের মহাসমরের পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করাতে সমর্থ হন। তাঁরা যদি সে প্রচেষ্টা করতেন তবে তাঁদের আসন উঠ্‌ত টলে এবং তাঁদের ক্ষমতা হত অচিরে বিলুপ্ত। অতএব বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ অনিশ্চিত জেনেও হিট্‌লারকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে হয়েছে সমর-সমুদ্রে।

এবার যে ঝড় উঠ্‌বে পোল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করে তা বোঝা গেল যখন হিট্‌লার জার্মান-পোলিশ-চুক্তির অবসান ঘোষণা করলেন (মার্চ, ১৯৩৯)। পোল্যাণ্ডের একদিকে জার্মানী, আর একদিকে সোভিয়েট রুশিয়া। পোল-শাসক সম্প্রদায়ের কাছে এই দুইয়ের প্রভাবই অবাঞ্ছনীয়। তাঁরা না-ফ্যাসিস্ট্—না-সাম্যবাদী। কাজেই যখন ১৯৩৪ সালে জার্মানী প্রস্তাব করলে দশ বছরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি করতে তখন সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পোল্যাণ্ড বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে-নি। একে একে যখন পোল্যাণ্ডের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ওপর জার্মানীর খড়্গ পড়তে লাগ্‌ল তখনও পোল্যাণ্ড এই চুক্তির সর্ত স্মরণ ক'রে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়-নি। বরঞ্চ, দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পোল্যাণ্ড আপনার অবস্থার উন্নতির চেষ্টা দেখল। বিগত মহাসমরের অবসানে লিথুয়ানিয়ার ভিল্‌না শহরটি কেড়ে নেয় পোল্যাণ্ড (১৯২০)—ফলে বিশ বছর এই দুই রাষ্ট্রের সীমান্ত ছিল রুদ্ধ। কিন্তু এই দুর্যোগে চরমপত্র দিয়ে পোল্যাণ্ড সেই পথ খুল্‌তে বাধ্য করেছে লিথুয়ানিয়াকে (১৯৩৮)। তারপর চেক্-বিভ্রাটের সময় জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে পোল্যাণ্ড গ্রাস কর্‌ল তেসেন (Teschen) প্রদেশ। কিন্তু এতে পোল্যাণ্ড হোলো জার্মানীর বিরাগ-ভাজন। কেন না, ঐ ভূতপূর্ব চেক প্রদেশের মধ্যে রয়েছে বোহুমিন রেলওয়ে জংশন। বলকানে আক্রমণ চালাতে গেলে এটি জার্মানীর প্রয়োজন।

পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যখন জার্মানী মিতালী করে তখনও নাৎসী-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়-নি ; চতুর্দিকে তখন জার্মান-বিরোধী সম্মিলন গড়ে উঠ্‌ছে। বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী জার্মানীর বিপক্ষে মিলিত হয়েছে এবং ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি তখন আসন্ন। আত্মরক্ষার প্রয়াসে নির্বান্ধব জার্মানী বন্ধুতা স্থাপন করতে চাইল প্রতিবেশী পোল্যাণ্ডের সঙ্গে। মার্শাল পিলসুদস্কি তখন পোল্যাণ্ডের ভাগ্যবিধাতা। তিনি তৎক্ষণাৎ ইতস্তত না ক'রে এ চুক্তি সম্পন্ন করলেন।

আজ আর পোল্যাণ্ডের সম্প্রীতি জার্মানীর কাম্য নয়—কেন না, সে চায় তাকে পদানত করতে। পাঁচ বছর আগের দুর্বল জার্মানী আজ অমিত বলশালী—তুচ্ছ পোল্যাণ্ডের বন্ধুত্বের আর কি মূল্য ? চারটি পোলিশ অঞ্চলে জার্মানী তার দাবী উত্থাপন করলে—স্বাধীন নগরী ডান্‌জিগ, পোলিশ অলিন্দ (Polish Corridor), পোজেন প্রদেশ এবং আপার সাইলেশিয়া। এ চারটি অঞ্চলেই জার্মান ভাষা-ভাষী বাসিন্দার অভাব নেই এবং এককালে এরা জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এটাও ঐতিহাসিক সত্য। তবুও সর্বক্ষেত্রে এদের ওপর জার্মানীর দাবী ন্যায়সঙ্গত তা বলা চলে না।

ডান্‌জিগ বন্দরটির অবস্থান ভিশ্‌চুলা নদীর মোহানায়। এর ওপরে জার্মান প্রভাব সুস্পষ্ট। বহুবার ডান্‌জিগ হাত বদ্‌লেছে ; কিন্তু মধ্যযুগের টিউটনিক সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ছাপ আজও তার ওপর থেকে মিলিয়ে যায়-নি। অথচ ঐ হোলো পোল্যাণ্ডের সমুদ্রের দ্বারপথ। এ দ্বার রুদ্ধ হওয়া মানে পোল্যাণ্ডের আত্মহত্যা বরণ করে নেওয়া। তাই গত যুদ্ধের অবশেষে এটিকে জাতি-সঙ্ঘের অভিভাবকত্বে দেওয়া হয়েছিল স্বাধীনা নগরীর মর্যাদা। কিন্তু নাৎসীদের কল্যাণে ডান্‌জিগ হয়ে উঠ্‌ল মনে-প্রাণে জার্মান। কয়েকটি বিশেষ অধিকার ছাড়া এখানে পোল্যাণ্ডের কোনই প্রাধান্য ছিল না ; তবু ডান্‌জিগ চাইল তৃতীয় রাষ্ট্রথের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে। পোল্যাণ্ডকে দাবান ছাড়া ডান্‌জিগ নিয়ে জার্মানীর বিশেষ কোন লাভ হবে না—কিন্তু তবুও একেই কেন্দ্র ক'রে জার্মানী বিশ্বব্যাপী মহাসমরের অবতারণা করেছে।

ডান্‌জিগের সমস্যা পোল্যাণ্ড বহুদিন আগেই উপলব্ধি করেছিল। তাই এ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিশ কোটি পাউণ্ড খরচ ক'রে পোল্যাণ্ড এক নতুন বন্দর গড়ে তুলেছিল পোলিশ অলিন্দে। 'ডিঙ্গেন' (Gdingen) বা গ্‌ডিনিয়া (Gdynia) এককালে ছিল একটি ছোট জেলেদের গ্রাম। আজ এটি একটি সমৃদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়েছে পোল-সরকারের চেষ্টায়। 'পোলিশ অলিন্দ' ব'লে যে ভূভাগটির ওপর জার্মানী দাবী জানিয়েছিল তা একটী সঙ্কীর্ণ অপ্রশস্ত জন-বিরল বালুকাময় অঞ্চল। অর্থনৈতিক দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তা সামান্য—কিন্তু তা পূর্ব-প্রুশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করেছে জার্মানী থেকে। একটি অখণ্ড জার্মান রাষ্ট্র গঠনের সে অন্তরায়। হতে পারে সে বাল্টিকের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের যোগ-সূত্র—অতএব, তার প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু বলদৃপ্ত জার্মানীর কামনা—আত্মপ্রসার। কাজেই 'ডান্‌জিগ' এবং 'পোলিশ করিডর' এ দুটিকে উদ্ধার করবার জন্য জার্মান বাহিনী দুর্বার বেগে আক্রমণ কর্‌লে পোল্যাণ্ড এবং পৃথিবীতে সূচনা করেছে এক মহাপ্রলয়ের।

জার্মানীর বিশাল-বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারে এমন ক্ষমতা ক্ষীণ-প্রাণ পোল্যাণ্ডের কোনও দিনই ছিল না। কিন্তু এবার তার সহায় বৃটেন এবং ফ্রান্স। তাদের ভরসায় সোভিয়েটের সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে পোল্যাণ্ড তার সমস্ত শক্তি সংহত কর্‌ল জার্মানীর অভিযান প্রতিহত করতে। পোল্যাণ্ডে সুরু হ'ল মৃত্যুর তাণ্ডবনৃত্য। জার্মানী এ কথা ঠিকই জান্‌ত যে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে পোল্যাণ্ডকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা হয়ে উঠ্‌বে না। এই ভরসায় রুশের আক্রমণ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েই ফ্যাসিস্ট্ জার্মানী অগ্রসর হলো পোল্যাণ্ড গ্রাস করতে। বৃটেন এবং ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন ক'রে সমরে প্রবৃত্ত হলেও জার্মানীর অভিযানের তীব্রতা কিছুমাত্র শিথিল হলো না। ক্ষিপ্রগতিতে জার্মান বিমান-বহর এগিয়ে এলো পোল-রাজধানী ওয়ারসর মাথার ওপর—তাদের অবিরাম গোলা-বর্ষণে শহরটি অচিরেই পরিণত হলো এক বিরাট ধ্বংস-স্তূপে। প্রায় তিন সপ্তাহ কাল আত্মরক্ষার তীব্র প্রয়াস ক'রে ওয়ারস আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হলো (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। বিভিন্ন অঞ্চলে অপূর্ব শৌর্য দেখিয়ে জার্মান-বাহিনীকে বাধা দিলেও পোল্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত শত্রুর গতি-রোধ করতে অক্ষম হলো। ফ্যাসিজ্‌মের যে দানবীয় রূপ দেখা গিয়েছিল স্পেনে—তারই পুনরাবির্ভাব ঘট্‌লো পোল্যাণ্ডে। পোল সরকার দেশ ছেড়ে আশ্রয় নিলেন রুমানিয়ার সীমান্তে। পঁচিশ বছর পরে পোল্যাণ্ডের অস্তিত্বের আবার অবসান হলো।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এবার জার্মানীর অগ্রগতি পেলো বাধা। পোল্যাণ্ডের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলো সোভিয়েট রুশিয়া। মহাসমরের অবসানে নব-গঠিত পোলিশ-রাষ্ট্রের যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছিল রুশ-পোল্যাণ্ড্ বিরোধের (১৯২০) ফলে তা আরও বেড়ে যায়। পোল্যাণ্ড্ পূর্বাঞ্চলে তার অধিকার-সীমা বিস্তৃত করে নেয় এবং হোয়াইট রুশিয়া এবং ইউক্রেনের কিছু অংশ এসেছিল তার কবলে। এই সংখ্যা-লঘু হোয়াইট-রাশিয়ান এবং ইউক্রেনিয়ানদের সাহায্য-কল্পে লাল-ফৌজ এলো পোল্যাণ্ডের সমর-ক্ষেত্রে। হিটলারের ঘট্‌লো উভয় সঙ্কট। সোভিয়েটের মৈত্রীই এখন তাঁর কাম্য। কেন না, সোভিয়েট যদি তার নিরপেক্ষতা বর্জন ক'রে গণতন্ত্রী রাষ্ট্র দুটির সঙ্গে সম্মিলিত হয় তা হলে তার ফল জার্মানীর পক্ষে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতে পারে ;—হয় ত ফ্যাসিজ্‌মের পতন হবে অনিবার্য। সুতরাং বার্ণার্ড শ'র ভাষায়, হিটলার পড়লেন স্ট্যালিনের মুঠোর মধ্যে। পোল্যাণ্ডের কয়েকটি প্রদেশ রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো। তার বিপক্ষাচরণ করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভব হলো না—তাকে মেনে নিতে হলো তার চির-বৈরী সোভিয়েটের দাবী। হিট্‌লার এবং স্ট্যালিন এবার একযোগে এক নতুন পোল-রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেছেন—তা হবে জার্মানী এবং সোভিয়েটের মধ্যবর্তী প্রহরী-স্বরূপ।

রুশিয়ার এই পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন বস্তুত নাৎসী-স্বৈরাচারের তীব্রতা প্রশমিত করেছে। মধ্য-ইউরোপে জার্মানীর একচ্ছত্র আধিপত্য-বিস্তারের কল্পনা আপাতত আকাশ-কুসুমই রইল। রুমানিয়ার তৈলক্ষেত্রের দিকে নাৎসী-নায়কের যে লোলুপ-দৃষ্টি ছিল তা তাঁকে ফেরাতে হয়েছে এবং পোল্যাণ্ডে রুশিয়া এসে পড়ায় সেখানকার তৈলখনির শতকরা ৮০ ভাগ গেল হাতছাড়া হয়ে। রুশিয়া যদি এ ভাবে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ না হতো তা হলে সমগ্র পোল্যাণ্ড হতো জার্মানীর করতলগত—হয়তো বা রুমানিয়া এসে পড়ত তার কবলে। জার্মানীর সীমারেখা এসে মিল্‌ত সোভিয়েটের সীমান্তে ; তাতে সোভিয়েটের নিরাপত্তা হতো বিপন্ন এবং নাৎসী প্রতাপ হতো সুদৃঢ়। এস্‌থোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও অন্যান্য বাল্টিক রাষ্ট্রে সোভিয়েটের প্রভাব-বিস্তারে আশঙ্কার কারণ জার্মানীরই সবচেয়ে বেশী—যে কোনও মুহূর্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে দাবানল জ্বালাতে পারে নাৎসী জার্মানীতে। তাতে অন্তর্বিপ্লব জেগে উঠ্‌বে সেখানে এবং নাৎসীর স্বেচ্ছাতন্ত্রের হবে অবসান।

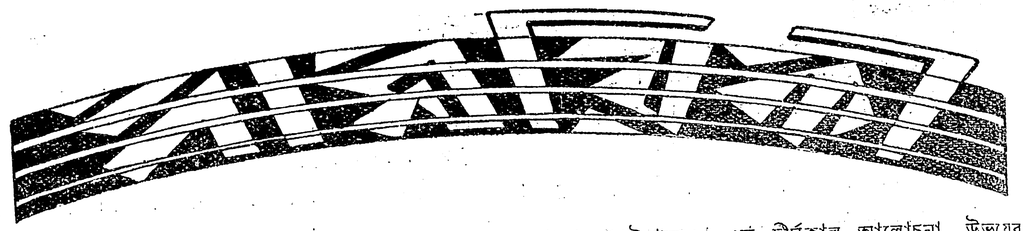

যুদ্ধ ও কংগ্রেস—

ইউরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই ওয়ার্দ্ধায় ভারতের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে। তৎপূর্ব্বে বড়লাটের সহিত মহাত্মার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাক্ষাৎ শেষে মহাত্মা যে বিবৃতি দেন, তাহাতে তাঁহার মনোভাব স্পষ্টই প্রকাশ পায়। তিনি নাৎসী ও ফাসিস্ত নীতির বিরোধী। গণতন্ত্রের পূজারী বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধে ধ্বংস হইয়া যাইবে, বিশ্ব-সভ্যতার প্রতীক লণ্ডন ও প্যারিসের সৌধচূড়া শত্রু-পক্ষের বোমার আঘাতে ধূলায় লুটাইবে, ইহা কল্পনা করিতেও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহার একান্ত অনুগত নেতৃবৃন্দকে লইয়া গঠিত হইলেও কমিটি এক্ষেত্রে তাঁহার মনোভাবের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ছাড়াও অন্যান্য প্রভাবশালী নেতৃবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। সম্ভবত তাঁহাদের মতামতও ওয়ার্কিং কমিটির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণের এবং বৃহত্তর জনসমাজের কথাও কমিটিকে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পোল্যাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং যে নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বৃটেন এবং ফ্রান্স অস্ত্রধারণ করিয়াছে তাহারও প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু এই যুদ্ধে ভারতের কর্ত্তব্য কি সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। বিপন্ন স্বাধীনতা ও বিপন্ন গণতন্ত্রের জন্য যে বৃটেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সেই বৃটেনের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণার উপর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে।

সম্প্রতি বড়লাট পুনরায় মহাত্মা গান্ধীকে সিমলায় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল আলোচনা হইয়াছে। এত দীর্ঘকাল আলোচনা উভয়ের মধ্যে আর কখনও হয় নাই। আলোচনার ফলাফল জানিবার উপায় নাই। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং যুদ্ধ সাব-কমিটির সভাপতি পণ্ডিত জওহরলালকে তরা অক্টোবর তারিখে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বড়লাট আমন্ত্রণ করিয়াছেন। মনে হইতেছে, এই সাক্ষাৎকারের পরই কংগ্রেস বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিবেন।

লীগ ও বর্ত্তমান যুদ্ধ—

কংগ্রেসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুসলীম লীগও বারো শত শব্দ যুক্ত এক বিরাট প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। জিন্না সাহেবের দুই হস্ত—স্যার সেকান্দার হায়াৎ খাঁ এবং মৌলবী ফজলুল হক, ইতিপূর্ব্বেই বিনাসর্ত্তে বৃটেনকে ধন ও জন দ্বারা সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার বিভিন্ন প্রকার অর্থ করা হইতেছে। মৌলবী ফজলুল হক ইহাকে বিনাসর্ত্তে সাহায্যের আশ্বাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা বলিতেছেন, বিবিধ প্রকার কাল্পনিক দুঃখের তালিকা ছাড়া ইহাতে আর কিছুই নাই। অথচ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে উহাতে দর-কষাকষি যে করা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকে না। ইহার সত্যকার অর্থ যে কি, তাহা একমাত্র জিন্না সাহেবই বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি নীরব আছেন। এমন কি, বড়লাটের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াও সিমলা যাইতে পারেন নাই।

স্যার সেকেন্দার ও মিঃ জিন্না—

"সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটে" এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ মহাত্মাজি ও জিন্না সাহেবকে পরস্পর মিলিত হইয়া ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে

ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্দ্ধা বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে জিন্না সাহেবকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। জিন্না সাহেব সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে অবশ্য অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। শুধু জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রতিষ্ঠানই নয়, চিন্তাশীল মুসলমান সমাজেই লীগ ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী বৈঠকের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। ভারতের জাতীয়তার দিক দিয়া ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

লর্ড জেটল্যাণ্ডের বক্তৃতা—

লর্ড-সভায় ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লর্ড জেটল্যাণ্ড বলিয়াছেন, কংগ্রেসের নেতারা পূর্ণতর স্বায়ত্ত শাসনের লক্ষ্য ঘোষণার জন্য বর্ত্তমান অবস্থার যে সুযোগ লইয়াছেন তাহা স্বাভাবিক হইলেও সময়োচিত হয় নাই। "আমাদের জীবন-মরণ সংগ্রামের সময় আমাদিগকে বিব্রত করিবার উদ্দেশ্যে কিছু করিবার জন্য যদি বর্ত্তমান সুযোগ বাছিয়া লওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা ওই দাবীতে যতটা কর্ণপাত করিতে রাজি হইব, তাহার চেয়ে অনেক বেশী রাজি হইব যখন উপযুক্ত সময় আসিবে।" উপযুক্ত সময় বলিতে তিনি সম্ভবত যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "কোন বিশেষ সময়ে উচিত ও সম্মানজনক ব্যবহার বৃটিশ জাতি স্মরণ করিয়া রাখে।"

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা স্মরণ হইতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ বৃটেনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। এই উচিত ও সম্মানজনক ব্যবহারের বিনিময়ে তদানীন্তন ভারত সচিব মণ্টেগু সাহেব যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী যে মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা সন্তোষজনক হয় নাই। গোল টেবিল বৈঠকের প্রাক্কালে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন (বর্ত্তমানে লর্ড হ্যালিফাক্স) "ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের" যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন-আইনে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড একটা ভুল করিয়াছেন। যুদ্ধে বৃটেনকে বিপন্ন দেখিয়াই কংগ্রেস স্বায়ত্ত শাসনের দাবী জানায় নাই। লর্ড মেলও স্বীকার করিয়াছেন, "এই সব দাবী কিছু নূতন নয়। ইহা তাঁহাদের পুরাতন কর্ম্মসূচীর একটা অংশবিশেষ। দাবীগুলি শুধু নূতন করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে।" সুতরাং যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণের কথা উঠিতেই পারে না। পণ্ডিত জওহরলাল স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, "দর-কষাকষির কোনো অভিপ্রায় আমাদের নাই। স্বাধীনতার দাবীর সহিত দর-কষাকষির সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না।"

আমরা জানি না, ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে ভারত সচিব যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই বৃটিশ জনসাধারণের অভিমত কি-না। বিলাতী সংবাদপত্রগুলিকে যতদূর সম্ভব ভারতের দাবীর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর লিণ্ডসেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 'নিগেটিভ্ য়্যাটিচিউড্'-এর বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করিয়া বিশ্বের নূতন রূপের অনুবর্ত্তী ধারায় চিন্তা করিতে সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন।

মহাত্মার উত্তর—

লর্ড জেটল্যাণ্ডের বিবৃতির উত্তরে মহাত্মাজি এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ স্পষ্টতার সহিত বলিয়াছেন, "বৃটেন সকলের স্বাধীনতার জন্যই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, এ কথা সত্য হইলে তাহার প্রতিনিধিদের অতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা আবশ্যক যে, ভারতের স্বাধীনতাও তাহার অন্তর্ভুক্ত। এই স্বাধীনতার স্বরূপনির্ণয়ও একমাত্র ভারতীয়েরাই করিতে পারে।" কংগ্রেসের দাবীর বিরুদ্ধে লর্ড জেটল্যাণ্ড যে অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজি বলিয়াছেন, "আমার বক্তব্য এই যে, এইরূপ ঘোষণার দাবী করিয়া কংগ্রেস কোন অদ্ভুত বা অসম্মানজনক কাজ করে নাই। স্বাধীন ভারতের সহায়তারই মূল্য আছে। সুতরাং কংগ্রেস যাহাতে লোকের নিকট গিয়া বলিতে পারে যে, যুদ্ধের শেষে বৃটেনের স্বাধীনতার যতটা নিশ্চয়তা থাকিবে, ভারতের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা তদপেক্ষা কম থাকিবে না। বৃটিশ জাতির বন্ধু হিসাবে আমি বৃটিশ রাজনীতিকগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বের ভাষা ভুলিয়া গিয়া নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবেন।"

মহাত্মার এই উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। লর্ড জেটল্যাণ্ডের উক্তিতে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীর সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। যে সময় বড়লাট ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনায় লিপ্ত, যে সময় সকলেরই চিত্ত বৃটেনের প্রতি ধীরে ধীরে অনুকূল হইয়া আসিতেছে, সেই সময় লর্ড জেটল্যাণ্ডের এই বক্তৃতা সময়োচিত হয় নাই।

পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ—

সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স বাঙলা গভর্ণমেণ্টকে পাটের নিম্নতম মূল্য আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য পাটের রপ্তানি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় মিল-ওয়ালারাই কাঁচা পাটের একমাত্র খরিদ্দারে দাঁড়াইয়াছেন। নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া তাঁহারা পাটের উচ্চতম মূল্য ৭৷৷০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ফলে ফাটকা বাজারে পাটের দর চার-পাঁচ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। কাঁচা পাটের খরিদ্দার না থাকিলেও চটের বস্তার চাহিদা ক্রমেই বাড়িতেছে। সুতরাং পাটের দর নামিয়া যাওয়া অন্যায়! আমরা আশা করি,

বাঙলা সরকার এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অচিরেই অবলম্বন করিবেন।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ—

যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই চাল-ডাল-নুন-তেল হইতে আরম্ভ করিয়া ঔষধপত্র পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্যের মূল্য কোথাও দ্বিগুণ, কোথাও বা তিন গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ অধিকতর লাভের আশায় মাল বিক্রয় বন্ধ করিয়া মজুত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সকল প্রদেশেই এই একই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। সকল প্রদেশের গবর্নমেণ্টই অসাধারণ তৎপরতায় ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যবসায়ীদের অন্যায় লোভ সংযত করিয়া দিয়াছেন। বাঙলা সরকার লোকের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়াইতে পারা যাইবে না বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ফলে জিনিস-পত্রের দাম অসম্ভব রকম চড়িতে পায় নাই। নানা ভাবে সরকারের উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি গবর্নমেণ্ট একজন আই-সি-এসের সভাপতিত্বে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও বাহির হইতে বারোজন সদস্য লইয়া একটি মূল্য-নিয়ন্ত্রণ পরামর্শ কমিটি গঠন করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা ক্যাশমেমো দিতে চাহিতেছে না। নুন, চাল প্রভৃতির ক্যাশমেমো পাওয়া যায় না। খরিদ্দারের পক্ষে সর্ব্বক্ষেত্রে অভিযোগ করাও সম্ভব নহে। সরকারের লোক নিযুক্ত করিয়া বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্রমশই মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। কাগজ প্রভৃতির মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান আর যেন মূল্য বৃদ্ধি করিতে ভীত নহে। বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে গবর্নমেণ্টের ইহা রোধ করার চেষ্টা করা উচিত।

হিন্দু নেতৃবর্গের প্রতি অশিষ্টতা—

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবর্গ কুমিল্লায় শফরে গেলে একশ্রেণীর মুসলমান জনতা ছাত্রদের সহযোগে তাঁহাদের গাড়ী আক্রমণ করিয়া যে গুণ্ডামি করিয়াছিল, আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, যে সম্বন্ধে তদন্তের জন্য মৌলবী ফজলুল হক সাহেব স্বয়ং কুমিল্লা গিয়াছেন। মৌলবী ফজলুল হক সাহেব নিজেকে বাঙ্গলার মুসলমান সমাজের একচ্ছত্র নেতা বলিয়া মনে করেন। যাহারা কুমিল্লায় এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে তাহারা যে রাজনৈতিক মতবাদের জন্যই করিয়াছে এরূপ সন্দেহ করা স্বাভাবিক। সুতরাং এই শোচনীয় ঘটনার অত্যল্প পরেই স্বয়ং কুমিল্লা যাত্রা করিয়া হক সাহেব যে তাঁহার নেতৃত্বের মর্য্যাদা রক্ষায় যত্নবান হইয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা আশা করি, তাঁহার চেষ্টায় এই ঘটনার যথোপযুক্ত তদন্ত ও প্রতিকার হইবে।

ভারতবর্ষ ও বৃটেন—

ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার ফলে ভারতের সর্ব্বস্তরে একটা বিশেষ চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ইহা বৃটেনের ভারত সম্বন্ধে সত্যকার অভিমত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বৃটিশ জনসাধারণের সত্যকার অভিমত কি আমরা জানি না। এ সম্বন্ধে বিলাতের দুইখানি পত্রিকায় যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"নিউ স্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশন" বলিতেছেন :

"কংগ্রেস এখন আর দায়িত্বহীন বিরুদ্ধবাদী একটা দলমাত্র নয়। আজ জগৎসমক্ষে ভারতবর্ষের নিকটে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে,—এই যুদ্ধ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য, না বর্ত্তমান ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্য কায়েম রাখিবার জন্য? ভারতবর্ষকে আপন ভাগ্যনিয়ন্তা জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রতিশ্রুতি আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিতেই হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে নামে না হোক, কার্য্যত ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতি করিলে আমরা ভারতবর্ষকে স্বপক্ষে পাইব, এবং সভ্য জগৎ আমাদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিবে। ওয়াশিংটন হইতে মস্কো পর্য্যন্ত সকলে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আমরা কি জন্য যুদ্ধ করিতেছি? আমরা যদি ভারতকে স্বাধীনতা দান করি, তাহা হইলে একটা স্বাধীন জাতির নেতৃত্ব আমরা লাভ করিব। আর যদি আমরা ভারতকে দমিত রাখি, তাহা হইলে ইউরোপ বা আমেরিকায় কেহ কি ভুল করিয়াও ভাবিবে আমার গণতন্ত্রের সমর্থক?"

"ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান" একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"ভারতের কংগ্রেস এই দাবী করিয়াছে যে, বৃটেন যদি এই যুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অধিকারসমূহ রক্ষা করিবার জন্যই ব্রতী হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের ব্যাপারেও বৃটেনকে ওই নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে। বৃটিশ সরকার যদি মনে করেন যে, মহাত্মা গান্ধী এই দাবী উত্থাপনকারী কংগ্রেসের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবেন না, তাহা হইলে তাঁহারা গুরুতর ভ্রমে পতিত হইবেন। আমাদের সম্মুখে এক বিরাট সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সরকারকে এই সপ্তাহেই একথা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, যদি পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতের পূর্ণ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতাই অর্জ্জন করিতে চাহেন।"

বিলাতের প্রগতিপন্থী সংবাদপত্রের সুর এই প্রকার হইলেও বিরুদ্ধ সুর গাহিবার পত্রিকারও অভাব নাই।

সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ঃ

মুসলিম—৩৭৯

হিন্দু—৯০ ও ২০৪

হিন্দুদল ১ ইনিংস ও ৮৪ রানে পরাজিত হ'য়েচে।

নাওমল

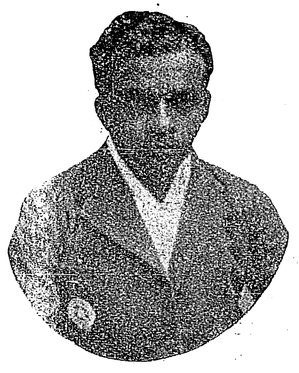

হিন্দুদল টসে জিতে ব্যাট ক'রতে নামে কিন্তু লাঞ্চের আগেই মাত্র ৯০ রানে সকলে আউট হ'য়ে যায়। এত তাড়াতাড়ি ও এত কম রানে তাদের ইনিংস শেষ হবে তা কেউ ভাবতেই পারে নি। সর্ব্বোচ্চ রান ক'রেচেন আম্বেশ ৩৬। মুসলিম বোলারদের কৃতিত্ব অদ্ভুত; লাকড়া মাত্র ১২ রানে ৪টে ও লানেওয়ালা ২৮ রানে ৩টে উইকেট পেয়েচে।

প্যালেষ্টাইন ফুটবল দল। ইঁহারা অষ্ট্রেলিয়া অভিযানের ফেরত পথে বোম্বাইয়ে কয়েকটি প্রদর্শনী খেলা খেলেছেন

মুসলিমরা ইনিংস শেষ ক'রলো ৩৭৯ রানে। লাকড়া ৮১ রান ক'রে শেষ পর্য্যন্ত নট্ আউট র'ইলো; ব্যাট ও বলে সে সমান কৃতিত্ব দেখিয়েচে। আব্বাস খাঁ ৫৮ এবং দাউদ খাঁর ৪৬ রানও উল্লেখযোগ্য।

২৮৯ রান পিছিয়ে হিন্দুরা দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ ক'রলো। আরম্ভ এবারও ভাল হ'ল না। ৩৫ রানে ৩টে উইকেট পড়ে গেল। দীপচাঁদ ও গোপাল দাস এসে খেলা একটু ঘোরালে। তাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। দীপচাঁদ ৫৯ ও গোপালদাস ৪১ রানে আউট হ'ল। হিন্দুদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল ২০৪ রানে। হায়দার ৫২ রানে ৩টে উইকেট পেয়েচে।

গোপাল দাস

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্য বাঙ্গলা থেকে আগামী বারের রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখবার জন্য যে প্রস্তাব করা হয় তাতে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ষ্টেট্, বরোদা, দিল্লী, মহারাষ্ট্র, বিহার ইউনাইটেড প্রভিন্স, নওনগর ও হায়দ্রাবাদ প্রতিযোগিতা বন্ধ না করার পক্ষপাতী। মহীশূর ও এন, ডবলউ, এফ সি বাঙ্গলাকে সমর্থন ক'রেচে।

জো'লুইয়ের সাফল্য ঃ

পৃথিবীর হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানসিপের আর এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী বব্ পাষ্টোরকে পরাজিত ক'রে জো'লুই স্বীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। দর্শক সংখ্যা হ'য়েছিল চল্লিশহাজার।

জো'লুই

জেমস ব্রাড্ডকের কাছ থেকে চ্যাম্পিয়ানসিপ কেড়ে নেবার পর থেকে দু'বছরে জো'কে এবার নিয়ে আট বার নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য লড়তে হ'য়েচে। তার ফলে নাথান ম্যান, হ্যারি টমাস, টমি ফার, ম্যাক্স স্মেলিং হেনরী-লুই, জ্যাকরপার ও টনি গ্যালেণ্টোকে ইতিপূর্ব্বেই পরাজিত হ'তে হ'য়েচে। মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে এটি একটি নূতন রেকর্ড।

অনেকের মতে বব্ পাষ্টোরই নাকি জো'র সব থেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। এগার রাউণ্ড লড়ে জো' তাঁকে হারাতে সক্ষম হ'ন।

জো' প্রথম থেকেই ভীষণভাবে লড়তে আরম্ভ করেন, ফলে বব্কে অল্পক্ষণের জন্য চারবার ভূতলশায়ী হ'তে হয়।

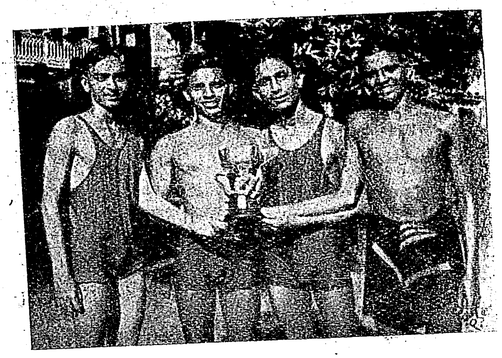

ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের সাধারণ বয়েজ স্কাউটসের ২০০ মিটার রীলে রেস বিজয়ী প্রথম-একাদশ ক্যালকাটা ট্রুপ

ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সপ্তম রাউণ্ডের পর থেকে জো'কে একটু ক্লান্ত মনে হ'তে লাগলো। এই সময় বব্ প্রাণপণে লড়তে আরম্ভ করেন, এবং ৮ম, ৯ম ও ১০ম রাউণ্ডে চ্যাম্পিয়ান জো'কে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করেন। ১০ম রাউণ্ডে দর্শকরা দেখে বিস্মিত হ'লো যে বব্ লুইকে মারতে মারতে দড়ির ধারে নিয়ে গেছেন।

প্রতিশোধ তুলতে জো' পরের রাউণ্ডে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করলেন যে, ফলে বব্কে ভূতলশায়ী হ'তে হ'লো।

লাহোরের ইণ্টার-ন্যাসানাল মল্লযুদ্ধে রত মিচেল গিল (ইংলণ্ড) ও নাজিম (ভারতবর্ষ); তৃতীয় রাউণ্ডে মিচেল গিল পরাজয় স্বীকার করেছে

লক্ষ্মীবিলাস শীল্ড ঃ

বি জি প্রেস ৩-১ গোলে বার্ম্মাসেলকে হারিয়ে লক্ষ্মী-বিলাস শীল্ড বিজয়ী হ'য়েচে। বি জি প্রেসের পক্ষে কে চ্যাটার্জ্জি ২ ও ডি ব্যানার্জি

১, এবং বার্ম্মাসেলের পক্ষে কামিং ১ গোল করেন। বার্ম্মাসেল পেনাল্টি পেয়েও গোল দিতে পারেনি।

ভার্সিটি বাচ প্রতিযোগিতা ঃ

বাচ প্রতিযোগিতার লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ ও নক্ আউট টুর্ণামেণ্টে বিজয়ী হ'য়ে বিদ্যাসাগর কলেজ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েচে। লীগে তারা প্রত্যেকটি খেলায় জয় লাভ করে। টুর্ণামেণ্ট ফাইনালে তারা সেণ্ট জেভিয়ার্সের কাছে অতি সহজে দেড় লেংথে বিজয়ী হয়।

বিদ্যাসাগর		সেণ্ট জেভিয়ার্স
এ ব্যানার্জ্জি	'বো'	কৃষনান্
এন চ্যাটার্জ্জি		সি এস পাই
পি সেন		এস দে
এস মুখার্জ্জি		এস চক্রবর্ত্তী
এস মুখার্জ্জি	'কক্স'	জে এম কাউল

ইউনিভার্সিটি বাচ-প্রতিযোগিতার লীগ ও নক্-আউট বিজয়ী বিদ্যাসাগর কলেজ দল, উভয় ট্রফী সঙ্গে

গভর্ণরস্ শীল্ড ঃ

হাজারীবাগের প্রদর্শনী খেলায় মোহনবাগান ১৯৩৭ ও ৩৮ সালের রোভার্স বিজয়ী বাঙ্গালোর মুসলিমকে ৪-০ গোলে পরাজিত ক'রে গভর্ণরস্ শীল্ড বিজয়ী হ'য়েচে। বাঙ্গালোর মুসলিম মোহনবাগানের কাছে দাঁড়াতেই পারে নি। মোহনবাগানের পক্ষে গোল ক'রেচেন এ রায় চৌধুরী ২, জে ঘোষ ও এ দে। বিমল, প্রেমলাল ও এস মিত্র খেলায় যোগদান ক'রতে পারেন নি। বাঙ্গালোর মুসলিমের পক্ষেও তাদের দু'জন নিয়মিত খেলোয়াড় খেলেনি।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ ঃ

মোহনবাগান ১-০ গোলে ডালহৌসীকে পরাজিত ক'রে লক্ষ্মীবিলাস কাপ বিজয়ী হ'য়েচে। এস মুখার্জ্জি গোল দেয়।

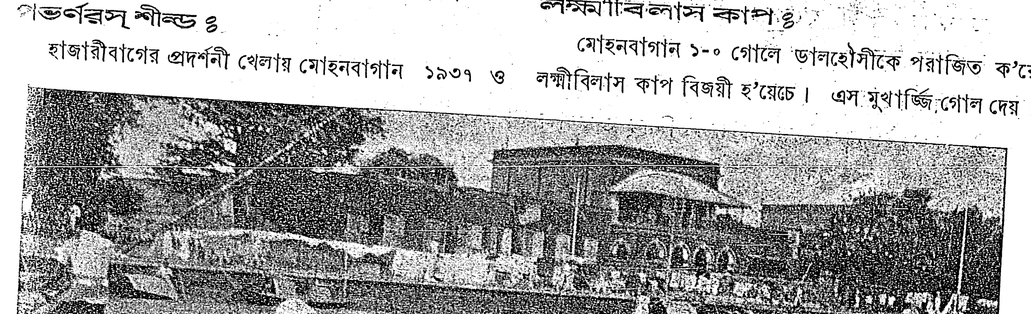

ঢাকার বাচ-প্রতিযোগিতা বিজয়ী জগন্নাথ ইণ্টার কলেজ

ইউনিভার্সিটি নক্ আউট টুর্ণামেণ্ট ঃ

ইউনিভারসিটি নক্ আউট টুর্ণামেণ্টে রিপণ কলেজ ৩-২ গোলে সিটি কলেজকে পরাজিত ক'রে ডাক্তার হেরম্ব মৈত্র শীল্ড বিজয়ী হ'য়েচে। সিটি কলেজ ডাক্তার ইওয়ান কাপ পেয়েচে।

মহেন্দ্র কাপ ঃ

দিল্লীর বিখ্যাত মহেন্দ্র কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ঢাকা ফার্ম্ম ২-১ গোলে দিল্লী চ্যাম্পিয়ানকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হ'য়েচে। ঢাকার পক্ষে জলিল দুটি গোল দেয়।

সরযূ কাপ ঃ

কাষ্টমস রিক্রিয়েশন বেঙ্গল কেমিক্যালকে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হ'য়েচে। বিজয়ী দলের পক্ষে সীম্যান গোল করেন।

ইউ এস এ টেনিস ঃ

ইউ এস এ টেনিস প্রতিযোগিতায় ববি রিগস্ ও কুমারী এলিস মার্ব্বেল যথাক্রমে পুরুষ

মার্ব্বেল

রিগস

হেরম্বচন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড বিজয়ী রিপণ কলেজ ফুটবল দল

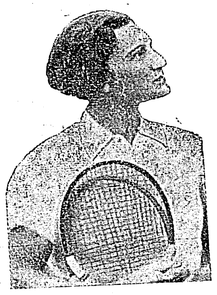

হেলন জ্যাকব

ও মহিলাদের সিঙ্গল বিজয়ী হ'য়ে উইম্বলডনের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেচেন। ববি রিগস্ ৬-৩, ৬-২, ৬-৪ গেমে ভন্ হর্ণকে পরাজিত ক'রেচেন।

কুমারী এলিস মার্ব্বেল ৬-০, ৮-১০ ও ৬-৪ গেমে কুমারী হেলেন জেকবকে পরাজিত ক'রে বিজয়িনী হ'য়েচেন।

ইণ্টার কলেজিয়েট সুইমিং ঃ

এবার ইণ্টার কলেজিয়েট সুইমিং প্রতিযোগিতায় তিনটি বিষয়ে নূতন রেকর্ড স্থাপিত হ'য়েচে।

বিদ্যাসাগর কলেজের সন্তোষ চ্যাটার্জ্জি ½ মাইল ফ্রি ষ্টাইলে ৬ মিঃ ১৯⅖ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নূতন রেকর্ড ক'রেচেন। ১০০ মিটার ব্রেক ষ্ট্রোকে এইচ ব্যানার্জ্জি ১ মিনিট ২৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে নূতন রেকর্ড করেচেন। ইনি এবার নিয়ে পর পর তিনবার উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হ'লেন।

রিপন কলেজ ৩×১০০ মিটার রীলে রেস ৪ মিঃ ২৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে নূতন রেকর্ড ক'রেচে।

টীম চ্যাম্পিয়ানসিপ পেয়েচে রিপন কলেজ।

তালতলা ইনষ্টিটিউট স্পোর্টসের এক লেংথ পিট সাঁতার (জুনিয়ার) বিজয়ী প্রতীপ মিত্র (ন্যাসনাল); সময়—১ মিনিট ৭৯ সেকেণ্ড রেকর্ড) ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

মেয়েদের বাস্কেট বল ঃ

মেয়েদের ইণ্টার কলেজিয়েট বাস্কেট বল লীগ প্রতিযোগিতায় ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন বিজয়িনী হয়েছে। গতবারেও তারা বিজয়িনী ছিল। লীগের সব খেলাতেই তারা জয়লাভ ক'রেছে। বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে জিততে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হ'য়েছিলো, ১৯-১৬ পয়েণ্টে জিতে। মেডিক্যাল কলেজ একটিও পয়েণ্ট না পেয়ে শেষ স্থান অধিকার ক'রেছে।

ইণ্টার-কলেজিয়েট বাস্কেট বল লীগ চ্যাম্পিয়ন ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন ছবি—ডি রতন এণ্ড কোং

স্কটিসচার্চ কলেজ দল। মেয়েদের বাস্কেট বল লীগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে

ব্রাব্রোর্ণ কাপ ঃ

ব্রাব্রোর্ণ কাপ প্রতিযোগিতা চলছে। কিন্তু বিশেষ লোক সমাগম হচ্ছে না। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলাতেও লোক নেই। প্রথম খেলা অপেক্ষা তাদের দ্বিতীয় খেলাতে কিছু ভিড় হ'য়েছিল, সভ্যদের গ্যালারীরও বহু অংশ খালি ছিল। সে উত্তেজনা, উল্লাস, চীৎকার কিছুই নেই। ডুটো করে খেলা এক দিনে এক মাঠে হয়েছে। কোন কোন দলকে পর-পর দু' দিনও খেলতে হয়েছে। আই এফ এর অধীনে খেলতে হলে ঐ নিয়েই কত গোলযোগের সৃষ্টি হতো। এতগুলি দল কোথায় লুকিয়ে ছিল। উদ্যোক্তাদের বাহাদুরী আছে স্বীকার করতেই হবে, দেশ-বিদেশ থেকে এতগুলি (খ্যাত নাই হোক) দলকে সংগ্রহ করা সহজ কথা নহে।

রেফারিং কি নিখুঁত হচ্ছে—উদ্যোক্তরা কি বলেন? আই এফ এর মতনই রেফারিংয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে। হওয়াই সম্ভব, নিখুঁত রেফারিং বিলাতেও হয় না। খেলোয়াড় দণ্ডিত ও সতর্কীত হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মাসুদ অন্যদলের হয়ে খেলে রেফারি সিরাজীর সঙ্গে বাগবিতণ্ডা করায় মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হয়। সিংহল দল ব্যতীত নামজাদা একটি দলও আসেনি, বা এপর্য্যন্ত একটিও উৎকৃষ্ট বিশেষ প্রতিযোগিতা-মূলক খেলা হয় নাই। কেবল ভিজাগাপট্টম আগত মর্ণিং ষ্টার দলের খেলাটি দর্শনীয় হয়েছিল। তারা প্রথমার্দ্ধে একগোলে অগ্রগামী থেকেও ৩-১ গোলে মহামেডানদের কাছে হেরে গেছে। রেফারির অবিবেচনায় তাদের বিপক্ষে পেনালটি দেওয়া হ'লে মহামেডানরা গোল শোধ করতে পারে। শেষার্দ্ধে আত্মরক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা তাদের ভুল হয়, তাতেই খেলার গতি ঘুরে যায়।

ইষ্টবেঙ্গল ৪-১ গোলে জয়ী হয়েও রেফারির অযোগ্য পরিচালনার জন্য সিংহল একাদশের সঙ্গে পুনরায় খেলতে বাধ্য হয়েছে। পরিচালক প্রথমার্দ্ধে ৫ মিনিট কম খেলিয়েছিল। ইষ্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় গোলটি আউট থেকে বল মাঠে টেনে নিয়ে করা হয়। রেফারিং যথা পূর্ব্বং তথা পরং—বিদ্রোহী দলরা কি আবার বিদ্রোহ করবেন? এ খেলাতেও লোক সমাগম আশানুরূপ হয় নি।

এই প্রতিযোগিতায় দেখা যায়, মুসলমান দলের ও মুসলমান খেলোয়াড়দের প্রাধান্যই বেশী।

ইষ্টবেঙ্গল দলে এরিয়ান্সের প্রসাদ ও ডি ব্যানার্জ্জিকে খেলতে দেখা গেছে। জোসেফ কালীঘাটের হয়ে খেলে আবার ইষ্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছে। বি এফ এর কি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-কানুন নেই? এস দেবরায় মোহনবাগান থেকে ন্যাসনাল স্পোর্টসে খেলেছে। প্রথমে বি এফ এতে যোগদান সম্বন্ধে সে প্রতিবাদ করে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাকে খেলতে দেখা গেল! এ পর্য্যন্ত তিনটি বিদ্রোহীদলের খেলোয়াড় ব্যতীত ২৩জন বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড় ব্রাবোর্ণ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। খেলোয়াড়রা যে কিসের লোভে অন্য দলে সুবিধা পেলেই ভিড়ে পড়ে তা' বুঝতে কারো বাকী নেই। অথচ সবাই অবৈতনিক খেলোয়াড় শ্রেণীভুক্ত হয়ে আছে। এখনও পেশাদারী ও অবৈতনিকের পৃথক শ্রেণী ভাগ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বি এফ এর প্রদর্শনী খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং অবশি দলের কাছে এক গোলে পরাজিত হয়েছে। এ'টি বিশে উত্তেজনাপূর্ণ ও উচ্চদরের খেলা হয়েছিল। দর্শক সমাগম বেশী হয় নি। সিংহলের আরিফ ঐ একমাত্র গোলটি দে মহমেডানরা অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে। অবশিষ্টের বির পি দাশগুপ্তের হাণ্ডবল দেওয়া অনুচিত হয়েছিল।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ প্রণীত "কার্টুন"—১।০
রেজাউল করীম প্রণীত "জাতীয়তার পথে"—২৲
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "চৌ চৌ"—২৲
শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী প্রণীত "আমার ধর্ম্ম"—১০ ও "ছেলেদের গীতা"—৷৵০
মিঃ সি রবার্টস্ সম্পাদিত "What India Thinks"—৭৲
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত উপন্যাস "পরকীয়া"—১।০
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তুহু মম জীবন"—২৲
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গীতাভিনয় "পুষ্প-সমাধি"—১৷৷০
শ্রীসঞ্চিতকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অহি-নকুল কথা"—১৲
শ্রীবিশ্বনাথ সান্যাল প্রণীত "রক্ত-গত শনি"—২৲
শ্রীরবীন্দ্রলাল রায় প্রণীত ছোটদের গল্প "বলি ত হাসব না"—৷৵০
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রতন দীঘির জমিদার বধূ"—২৲
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত "প্লাবন"—২৷৷০ ও "আবহাওয়া"—২৲
আবদুল কাদের প্রণীত "তুরস্কের ইতিহাস, ২য় খণ্ড"—২৲
শ্রীমতী দীপিকা দে প্রণীত উপন্যাস "কামরূপের মেয়ে"—২৷৷০
শ্রীসুকুমার দে সরকার প্রণীত ছেলেদের "অরণ্য রহস্য"—৷৵০
শ্রীগোপাল ভৌমিক প্রণীত ছেলেদের গল্প "দেশী ও বিলাতী"—১।০
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত প্রণীত ছেলেদের গল্প "ময়দানবের বাতি"—৷৵০
শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত সংস্কৃত মূলসহ "পদ্যগীতা"—১।০
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "আগে ও পরে"—১৷৷০
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "একান্ত গোপনীয়"—১৲
শ্রীমহেন্দ্র দত্ত প্রণীত নাটক "অভিযান"—১৲
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত ছেলেদের "দুর্য্যোগের মাঝে"—
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ছোটদের "ওল্ড কিউরিসিটি শপ"—
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত "বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্বপ্রাপ্তি"—৷৷
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত উপন্যাস-সংগ্রহ "উপচয়নী"—
প্রসাদচন্দ্র দে প্রণীত উপন্যাস "মলিনা"—১৲
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত সচিত্র ভ্রমণকাহিনী "মলয় যাত্রী"—১।০
শ্রীপ্রকাশকুসুম বড়ুয়া প্রণীত "নারী—বিভিন্ন রূপে"—১৲
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত প্রণীত "রত্নমন্দির"—৷৷০
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "কোণার্ক মন্দির"—৷৷০
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "জয়ন্তী"—২৷৷০
শ্রীসরোজকুমার নন্দী প্রণীত উপন্যাস "প্রকৃতির পুতুল"—১।০
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত "পৃথিবী ছাড়িয়ে"—১৲
শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ দেবশর্ম্মা প্রণীত "ছেলেদের বারভুঁইয়া"—৷৵০
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "শনি-রবি-সোম"—১৲

সম্পাদক
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ‖ শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

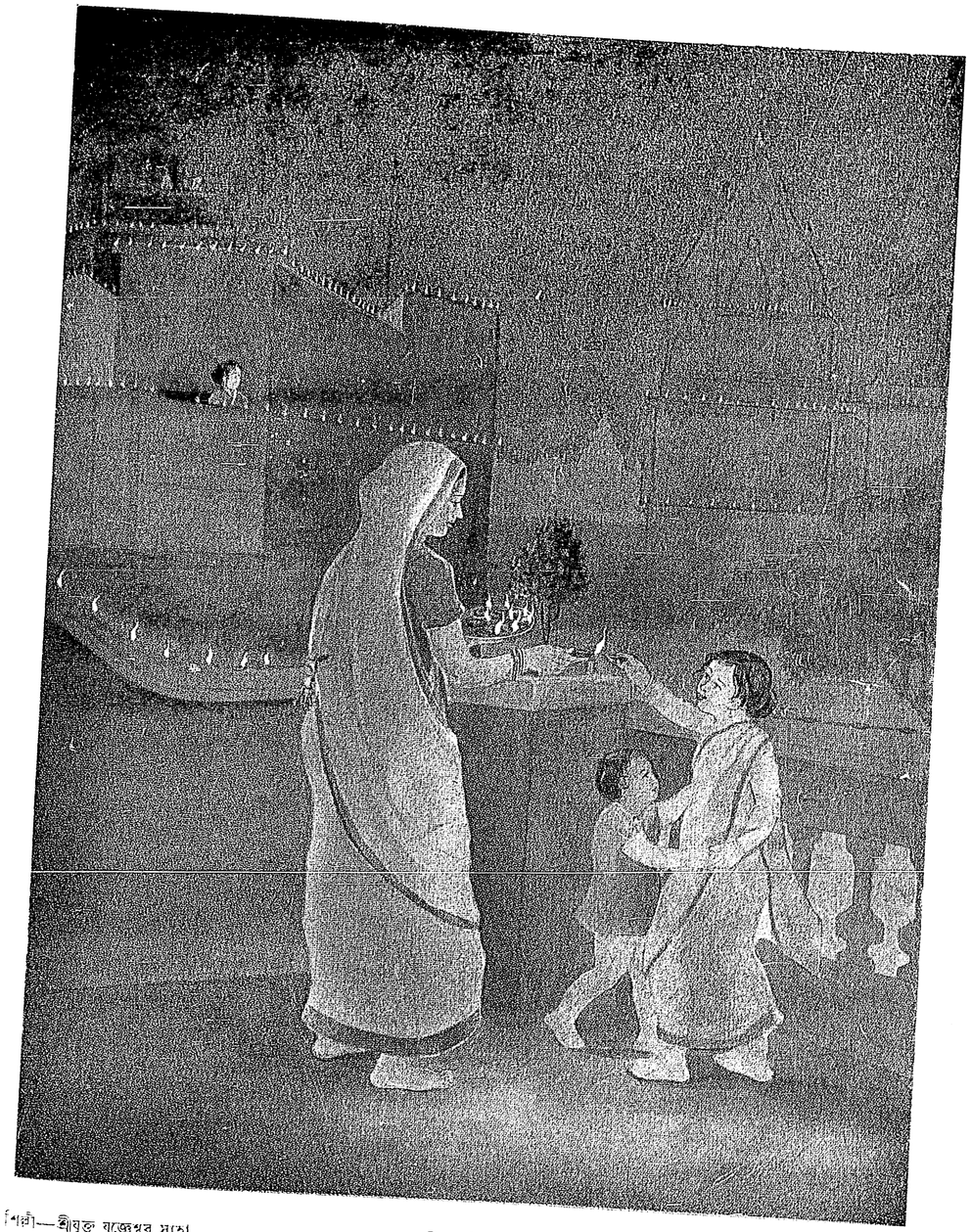

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা　　দীপান্বিতা　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস